বাঙলা ও বাঙালী

অজয় রায়

বাঙলা ও বাঙালী

অজয় রায়

ডক্টর আহমদ শরীফের ভূমিকা সম্বলিত

বাংলা একাডেমী ঢাকা

www.pathagar.com

দ্বিতীয় সংস্করণ
অগ্রহায়ণ ১৩৯৫
ডিসেম্বর ১৯৮৮

প্রথম সংস্করণ, ১৩৭৬

বাংলা একাডেমী সংস্করণ
চৈত্র, ১৩৮৩ ; মার্চ, ১৯৭৭

বাএ ২১৫২

পাণ্ডুলিপি
গবেষণা উপবিভাগ

প্রকাশক
শামসুজ্জামান খান
পরিচালক
গবেষণা-সংকলন-ফোকলোর বিভাগ
বাংলা একাডেমী, ঢাকা

মুদ্রক
ওবায়দুল ইসলাম
ব্যবস্থাপক
বাংলা একাডেমী প্রেস
ঢাকা—১০০০

প্রচ্ছদ : আবদুল ওদুদ

মূল্য : ষাট টাকা মাত্র

BANGLA-O-BANGALI (2nd Edition). by Ajoy Roy, Published by

www.pathagar.com

www.pathagar.com

আমার বাবা ও মা'র

স্মৃতির উদ্দেশে

www.pathagar.com

www.pathagar.com

www.pathagar.com

ভূমিকা

মা জন্ম দেয়, মাটি লালন করে।

তাই দেশের মাটিকে মায়ের মতোই ভালবাসতে হয়। এক সময় মায়ের প্রয়োজন ফুরায়। কিন্তু মাটির প্রয়োজন মৃত্যুর পরেও থেকে যায়। মানুষের জীবন একাকিত্বে সম্ভব নয়, তাই পরিজন-প্রতিবেশী নিয়েই যাপন করতে হয় তার জীবন। এদের সঙ্গে দ্বন্দ্বে ও মিলনে, সহযোগিতায় ও বিরোধেই তার জীবনে বিকাশ ও বিস্তার সম্ভব। অতএব, চেতনার গভীরে দেশের মাটি ও মানুষের গুরুত্ব উপলব্ধি করাই স্বাজাত্য ও স্বাদেশিকতা।

দেশের মাটি ও মানুষের অন্তরঙ্গ পরিচয় জানা থাকলেই স্বদেশ ও স্বজাতির প্রতি দায়িত্ব ও কর্তব্য পালন করা সম্ভব এবং স্বাধিকার প্রতিষ্ঠাও হয় সহজ। কেননা জিজ্ঞাসার মাধ্যমেই কেবল স্বদেশের মাটির জল ও বায়ু, দোষ ও গুণ এবং স্বদেশী মানুষের মন ও মেজাজ, যন্ত্রণা ও আনন্দ, সমস্যা ও সম্পদ, ভয় ও ভরসার কথা জানা যায়।

আলোচ্য গ্রন্থে লেখক বাঙালীর কাছে বাঙলা ও বাঙালীর অতীত পরিচয় তুলে ধরবার মহৎ প্রয়াসে নিরত। এ গ্রন্থ পণ্ডিতদের জন্যে নয়, লেখাপড়া জানা আত্মজিজ্ঞাসু বাঙালীর জন্যে। এই দেশের ও মানুষের উদ্ভব ও বিকাশ, ঐশ্বর্য ও দারিদ্র্য, গৌরব ও লজ্জা, শক্তি ও দুর্বলতা, সম্পদ ও সমস্যা, আনন্দ ও যন্ত্রণা, দোষ ও গুণ, ভয় ও ভরসা, প্রীতি ও ঘৃণা, দ্বেষ ও দ্বন্দ্ব, আশা ও নৈরাশ্য, আত্মপ্রত্যয় ও আত্মগ্লানি, আত্মসম্মানবোধ ও আত্মরতি, আদর্শবাদ ও নীতিহীনতা, সুকৃতি ও দুষ্কৃতি, সংগ্রাম ও পরবশ্যতা প্রভৃতির ইতিকথাই স্বদেশ ও স্বজাতির অন্তরঙ্গ পরিচয়ের তথা স্বরূপের অভিজ্ঞান।

বাংলার রাঢ়-বরেন্দ্রই প্রাচীন। পূর্ব ও দক্ষিণ-বঙ্গ অর্বাচীন। রাঢ় ছিল অনুন্নত ও অজ্ঞাত। তাই বরেন্দ্র নিয়েই বাংলার ইতিহাসের শুরু। মানুষের আদি নিবাস ছিল সাইবেরিয়া ও ভূমধ্যসাগরীয় অঞ্চল। সেখান থেকেই নানা পথ ঘুরে আসে ভূমধ্যসাগরীয় দ্রাবিড়-নিগ্রো, সাইবেরীয় নর্ডিক-মোঙ্গল। এরাই অস্ট্রীক, দ্রাবিড়, শামীয়, নিগ্রো, আর্য, তাতার,

www.pathagar.com

শক, হূন, কুশান, গ্রীক, মোঙ্গল, ভোটচীনা প্রভৃতি নামে পরিচিত। আমাদের গায়ে আর্য রক্ত সামান্য, নিগ্রো রক্ত কম নয়, তবে বেশী আছে দ্রাবিড় ও মোঙ্গল রক্ত, অর্থাৎ আমাদেরই নিকট জ্ঞাতি হচ্ছে কোল, মুণ্ডা, সাঁওতাল, নাগা, কুকী, তিব্বতী, কাছাড়ী, অহোম প্রভৃতি।

এদেশে যারা বাস করত তারা ছিল আধা বর্বর। এদের নিকট-জ্ঞাতি নেপালী-বিহারীরা বৈদিক আর্যদের সংস্পর্শে এসে তাদের ভাষা-ধর্ম-সংস্কৃতি ও সমাজ বরণ করে। কিন্তু পীড়ন-শোষণ অসহ্য হওয়ায় যাদের দোহাই কেড়ে নির্যাতন চালানো হত, সেই দেব-দ্বিজ-বেদদ্রোহী হয়ে উঠে তারা। যুগে যুগে নেতৃত্ব দেন আজীবক, তীর্থঙ্কর ও বোধিসত্ত্ব নামে আখ্যাত বহু নেতা। অবশেষে দেব-দ্বিজ ও দেবদ্রোহী গৌতম বুদ্ধ ও বর্ধমান মহাবীরের নেতৃত্বে পীড়নমুক্ত হল তারা।

এই জৈন-বৌদ্ধ ধর্ম গ্রহণের মাধ্যমেই বাঙালীরা উত্তর ভারতীয় আর্য-ভাষা, লিপি, সংস্কৃতি, সমাজ ও ধর্মনীতি বরণ করে সভ্য হয়ে উঠে। তাই কিছু প্রাচীন শব্দ, কিছু বাক্-রীতি, কিছু আচার-সংস্কার ছাড়া বাঙালীর বহিরাঙ্গিক অন্য স্বাতন্ত্র্য দুর্লক্ষ্য।

এভাবে যুগে যুগে বাঙালীর ধর্ম, সমাজনীতি, পোশাক, প্রশাসনিক বিধি প্রভৃতি আচরিক ও আদর্শিক জীবনের প্রায় সব কিছুই এসেছে বিদেশী, বিজাতি ও বিভাষী থেকে।

তবু বাঙালীর চিন্তার স্বকীয়তা মানস-স্বাতন্ত্র্য ও চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য কখনো অবলুপ্ত হয় নি এবং তা একাধারে লজ্জার ও গৌরবের।

বাঙালী চিরকাল বিদেশী ও বিজাতি শাসিত। সাত শতকের শশাঙ্ক নরেন্দ্রগুপ্ত এবং পনেরো শতকের যদু-জালালুদ্দীন ছাড়া বাঙলার কোন শাসকই বাঙালী ছিলেন না। এটি নিশ্চিতই লজ্জার এবং বাঙালী চরিত্রে নিহিত রয়েছে এর গূঢ় কারণ।

যে ভোগেচ্ছু অথচ কর্মকুণ্ঠ, তার জীবিকার্জনের দুটো পথ—ভিক্ষা ও চৌর্য। বাঙালীর এই কাঙালপনার পরিচয় রয়েছে তার স্বসৃষ্ট উপ-দেবতা, অপ-দেবতা কল্পনায় ও তুকতাক, যাদু-টোনা, মন্ত্র-তন্ত্র, কবচ-মাদুলী প্রীতিতে। আপাতসুখ ও আত্মরতি তাকে করেছে স্বার্থপর, ধূর্ত ও লোভী। তাই সে যৌথকর্মে অসমর্থ। তার বুদ্ধি ধূর্ততায়, তার সংকল্প

www.pathagar.com

উচ্ছ্বাসে, তার প্রয়াস স্বার্থে অবসিত। কালো পিঁপড়ের মতো সে নিঃসঙ্গ সুযোগসন্ধানী। এসব নিশ্চিতই বাঙালীর স্থায়ী কলঙ্কের কথা।

কিন্তু তার গৌরব-গর্বের বিষয়ও কম নেই। সে তর্ক করে, যুক্তি মানে কিন্তু হৃদয়-বেদ্য না হলে জীবনে আচরণ করে না। তাই সে বৌদ্ধ, ব্রাহ্মণ্য ও ইসলাম ধর্ম মুখে গ্রহণ করেছে, কিন্তু মানেনি। সে তার জীবন ও জীবিকার অনুকূল করে রূপান্তরিত করেছে ধর্মকে। সে পুজো করেছে তার স্বসৃষ্ট উপ ও অপ-দেবতার। সৃষ্টি করেছে স্বকীয় মতবাদ ও আচার-আচরণ বিধি। বৌদ্ধযুগে বাঙালীর কালচক্রযান, বজ্রযান, যন্ত্রযান, সহজ-যান, ব্রাহ্মণ্য সমাজে বাঙালীর লৌকিক দেবতা-নিষ্ঠা, নব্যন্যায়, নব্যস্মৃতি, চৈতন্যের প্রেমবাদ, মুসলিম সমাজে সত্যপীরবাদ, যৌগিক-সুফীতত্ত্ব, ওহাবী-ফরাইজী মতবাদ এবং রামমোহনের ব্রাহ্মমত তার সাক্ষ্য।

এভাবে দেশজ লৌকিক ধর্মই কালে কালে বাঙালীর জীবন নিয়ন্ত্রণ করেছে। বাঙালীর স্বাধীনতাপ্রীতি, স্বাজাত্যবোধ ও সঙ্ঘ-শক্তির সাক্ষ্য নগণ্য বটে, কিন্তু তার মাটি ও মর্ত্যপ্রীতি সর্বত্র সুপ্রকট। আদিতে তারও ছিল কৌম জীবন। বাহ্যত কর্মবিভাগ সে স্বীকার করেছে, সমাজে কর্মগত সহযোগিতা ও সংহতির গুরুত্বও কখনো অস্বীকৃত হয়নি। কিন্তু তার ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্য প্রবণতা ও আত্মরতি ছাপিয়ে উঠেছিল তার সহমর্মিতা ও সমধর্মিতার বন্ধনকে।

যখন জৈন-বৌদ্ধ ধর্ম গ্রহণ করে তখনো কৌমচেতনা ছিল প্রবল এবং সম্ভবত বৌদ্ধ-মৌর্য শাসনেও তার বিচলন ঘটেনি। ব্রাহ্মণ্য গুপ্ত শাসনেই বৃত্তিগত বিভাগ বর্ণবিভাগে বিকৃত হয়। কেননা সে-সময়ে ব্রাহ্মণ্যবাদীর সংখ্যা বাড়ে এবং বৌদ্ধ পাল আমলের প্রথম যুগে এ চেতনা ম্লান হলেও শেষের দিকে শঙ্করাচার্যের নব ব্রাহ্মণ্যবাদের প্রভাবে এবং উত্তর ভারতীয় ব্রাহ্মণাদি কর্মচারীর বাহুল্যে ক্ষয়িষ্ণু বৌদ্ধ সমাজ দ্রুত অপসৃত হয়ে বর্ণবিন্যস্ত ব্রাহ্মণ্য সমাজ গড়ে উঠতে থাকে আর ব্রাহ্মণ্যবাদী সেন আমলে তা পূর্ণলাভ করে। এজন্যেই বাঙালীর বর্ণবিন্যাস নিতান্ত কৃত্রিম। মোটামুটিভাবে দশ থেকে ষোল শতক অবধি মেল ও পটি বন্ধনের কাজ চলে। বল্লাল চরিত, দৈবকী-ধ্রুবানন্দ-পঞ্চানন ঘটক ও জাতিমালা কাছারী তার সাক্ষ্য। এমনি করে নির্বর্ণ বৌদ্ধ সমাজ থেকে বর্ণাশ্রিত হিন্দু সমাজ

www.pathagar.com

গড়ে উঠে। ফলে, এখানকার হিন্দু-মুসলমান—কারো জাত-বর্ণ পরিচয় সন্দেহাতীতরূপে যথার্থ নয়। বিশেষ করে দ্রাবিড়-নিগ্রো-মোঙ্গল কারো মধ্যেই যখন বর্ণবিভাগ ছিল না, তখন এ যে আরোপিত ও অর্বাচীন তা' বলার অপেক্ষা রাখে না।

প্রাচীনকালে এখানে লোকসংখ্যা ছিল কম, গোত্রে বিভক্ত কৌমের নিবাস ছিল অঞ্চলে সীমিত। কাজেই জৈন-বৌদ্ধ-ব্রাহ্মণ্য ধর্মে দীক্ষার পরেই তারা গৌত্রিক গ্রাম থেকে ধর্মীয় সম্প্রদায়ে পরিণত হয়। কিন্তু স্বাদেশিকতা নিতান্ত আধুনিক চেতনা। জনসংখ্যা বৃদ্ধি ও ভাষিক ঐক্যের ফলে তারা স্থানিক ঐক্যলাভ করেছিল বটে ; কিন্তু দেশগত জীবন-চেতনা ছিল অনুপস্থিত। তাই বাঙালী হিন্দু ছিল উত্তর ভারতীয় আর্য গৌরবে এবং রাজপুত-মারাঠার ঐতিহ্যগর্বে স্ফীত। আর মুসলমান ছিল আরব-ইরানীর জ্ঞাতত্ব মোহে ও গৌরবে অভিভূত। ইদানীং পূর্বযুগে কেউ সুস্থ ও স্বস্থ ছিল না। স্বদেশে প্রবাসী এই বাঙালীর রাজনৈতিক দুর্ভাগ্য এবং সাংস্কৃতিক স্বাতন্ত্র্য চেতনার ও স্বাদেশিক কর্তব্যবুদ্ধির বিরলতার কারণ এ-ই।

আজ ভেবে দেখবার সময় এসেছে : মৌর্য-গুপ্ত-পাল-সেন-তুর্কী-মুঘল আমলে বাঙালী কি স্বাধীন ছিল—সুখী ছিল? স্বাধীন পাল কিংবা সুলতানী আমল কি বাঙালীরও স্বাধীনতার যুগ? বারভূঁইয়ার বিদ্রোহ ও বীরত্ব কি স্বাধীনতাকামী বাঙালীরও সংগ্রাম ও ত্যাগের ঐতিহ্য? জাতীয়তার ভিত্তি হবে কি গোত্র, ধর্ম, বর্ণ, দেশ কিংবা রাষ্ট্র?

বাংলাদেশ ক্বচিৎ একচ্ছত্র শাসনে ছিল। তাই বাংলাদেশান্তর্গত সব ঐতিহ্যে সর্ব বাঙালীর অধিকার ছিল না। আঞ্চলিক মন, মনন ও সংস্কৃতির স্পষ্ট ছাপ আজো জীবনের সবক্ষেত্রে বিদ্যমান। সাহিত্য ক্ষেত্রে এ আঞ্চলিকতা বিস্ময়করভাবে সুপ্রকট। যেমন ধর্মমঙ্গল ও চণ্ডীমঙ্গল হয়েছে রাঢ় অঞ্চলে, মনসামঙ্গল হয়েছে পূর্ববঙ্গে, বৈষ্ণব সাহিত্য হয়েছে পশ্চিমবঙ্গে ; বাউল প্রভাব পড়েছে উত্তর ও পশ্চিমবঙ্গে। সত্যপীর বা সত্যনারায়ণ-কেন্দ্রী উপদেবতার প্রভাব-প্রসার ক্ষেত্র হচ্ছে দক্ষিণ-পশ্চিম বঙ্গ। গীতিকা হয়েছে ময়মনসিংহে-চট্টগ্রামে, মুসলিম রচিত সাহিত্যের বিশেষ বিকাশ ঘটেছে চট্টগ্রামে। গাজন, গম্ভীরা, বৈষ্ণবগীতি, বাউলগান, ভাওয়াইয়া, ভাটিয়ালী প্রভৃতিরও স্থানিক বিকাশ লক্ষণীয়।

www.pathagar.com

দারু কারু ও চারু শিল্পের ক্ষেত্রেও আঞ্চলিকতা গুরুত্বপূর্ণ। ঢাকাই মসলিন ও শঙ্খশিল্প, সিলেটী গজদন্ত ও বেতশিল্প, নদীয়ার পট শিল্প, রাজশাহী-মালদহ-মুর্শিদাবাদের রেশমশিল্প, পাবনা-টাঙ্গাইলের বস্ত্রশিল্প, চট্টগ্রামের নৌ ও দারুশিল্প প্রভৃতি স্মর্তব্য।

বাঙালীর লজ্জা ও গৌরবের কিছু ইঙ্গিত দিলাম। কিন্তু বাঙালী যেখানে স্বকীয় মহিমায় সমুন্নত, যেখানে সে অতুল্য এবং প্রাচ্যদেশে প্রায় অজেয়, তা বিদ্যা ও বুদ্ধির ক্ষেত্রে বাঙালীর অবদান। তার সাহিত্য ও তার দর্শন তার গৌরবের ও গর্বের এবং অপরের ঈর্ষার বস্তু।

আলোচ্য গ্রন্থে লেখক বাঙালীর সুচির কালের সামগ্রিক পরিচয় তুলে ধরতে চেয়েছেন এবং তাঁর প্রয়াস অনেকাংশে সফল ও সার্থক হয়েছে বলেই মনে করি। আমাদের দেশের প্রাচীন ইতিবৃত্ত আজো প্রায় অনুদ্ঘাটিতই রয়ে গেছে। কাজেই প্রমাণে-অনুমানে রচিত হয়েছে আমাদের ইতিহাসের ভিত। এই গ্রন্থের লেখক অদ্যাবধি আবিষ্কৃত ও অনুমিত-তথ্য ও তত্ত্বের স্বাধীন প্রয়োগে রচনা করেছেন এ গ্রন্থ। এ গ্রন্থের মাধ্যমে উৎসুক ও জিজ্ঞাসু বাঙালীর আত্মদর্শন হবে। এটি গ্রন্থকারেরও সম্ভবত লক্ষ্য। এ গ্রন্থের অনেক গুণ—ভাষা স্বচ্ছ ও সচল, ভঙ্গি প্রাঞ্জল, বক্তব্য সুস্পষ্ট। কিন্তু স্থানে স্থানে অসতর্কতার ছাপ রয়েছে, তথ্যের ভুলও কিছু আছে। সমান্যীকৃত (generalised) সিদ্ধান্ত-প্রবণতা কম হলেই ভালো হত।

ডক্টর দীনেশচন্দ্র সেন, ডক্টর তমোনাশ দাশগুপ্ত, ডক্টর নীহাররঞ্জন রায়, ডক্টর সুকুমার সেন, ডক্টর আবদুর রহিম, ডক্টর মোমতাজুর রহমান তরফদার প্রমুখ রচিত সমাজ-সংস্কৃতি বিষয়ক গ্রন্থগুলো বাঙলা ও বাঙালীর কালিক ইতিহাস। আর শ্রীঅজয় রায়ের বইটি সাধারণের জন্যে স্বয়ংসম্পূর্ণ। উপরোক্ত গ্রন্থগুলো পাঠে এই গ্রন্থে লব্ধ জ্ঞান পূর্ণতা পাবে। সুচির বাঙালীর জগৎ ও জীবনের বিভিন্ন দিক সম্পর্কিত এমনি আলোচনা গ্রন্থ আরো আরো কামনা করি। এমনি আত্মপরিচিতিমূলক গ্রন্থ বাঙালীর আজ বড়ো প্রয়োজন।

এ ক্ষেত্রে পথিকৃৎ শ্রীঅজয় রায়কে কৃতজ্ঞতা ও শ্রদ্ধা জানিয়ে এখানেই বক্তব্যের শেষ করছি।

ডক্টর আহমদ শরীফ

১৬.৫.৬৯

www.pathagar.com

www.pathagar.com

তৃতীয় সংস্করণে লেখকের ভূমিকা

ইতিহাস চলিষ্ণু। প্রশ্ন উঠতে পারে যা অতীত হয়ে গেছে তা চলিষ্ণু হবে কি করে। তা এক অর্থে ঠিক। আবার আমাদের মত দেশ, যে দেশের সমাজ-বিকাশের ধারাটি এখনো সুস্পষ্টভাবে জ্ঞাত নয়, সে দেশের ইতিহাস সম্পর্কে জ্ঞান যে চলিষ্ণু সে কথাটি নিঃসংশয়ে বলা যায়। নতুন নতুন গবেষণা নতুন দিগন্ত উন্মোচিত করে। আর তার ফলে অনেক পুরানো ধারণা সম্পর্কে সংশয় দেখা দেয়। নতুন ইঙ্গিত নতুন ধ্যান ধারণার জন্ম দেয়।

তবে নিঃসংশয়ে কোন কিছু বলা শুধু যে কঠিন তাই নয়, বাংলার ইতিহাস সম্পর্কে যা জানা আছে তাতে করে তার সময় এসেছে বলেও আমি মনে করি না। এ বিষয়ে এখন পর্যন্ত যা জানা গেছে তাতে করে এর চেয়ে বেশী কিছু বলা সম্ভব নয়। সমাজ-বিকাশের ইতিহাসই প্রকৃত ইতিহাস, সেই প্রেক্ষিতেই এই কথাগুলি বলছি। বাংলার সমাজ বিকাশের ইতিহাস রচনার সে রকম কোন প্রয়াস এখনো হয়নি। ড: নীহার রঞ্জন রায়ের 'বাঙালীর ইতিহাস' আদি পর্বের কথা মনে রেখেই একথা বলছি। আর এটা হয়নি কারণ এখনো তা পুরোপুরি সম্ভব নয় বলেই। সামন্ত যুগের ইতিহাস বিবৃত করা অপেক্ষাকৃত সহজ। কিন্তু কৌম সমাজের বিলোপ আর সামন্ত যুগের অভ্যুদয়ের মাঝখানের সময়কাল—যা কয়েক শতাব্দী বিস্তৃত—সে সম্পর্কে, তার বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে সুনির্দিষ্টভাবে কিছু বলা কঠিন। এখন পর্যন্ত এব্যাপারে তেমনভাবে কেউ কিছু বলতে চেষ্টা করেননি। সোভিয়েত ভারতত্ত্ববিদদের রচনাতেও তার কোন সুস্পষ্ট রূপরেখা পাওয়া যায় না। তাছাড়া তাঁদের গবেষণা গোটা উপমহাদেশ সম্পর্কে। নির্দিষ্টভাবে বাংলা সম্পর্কে নয়।

তৃতীয় সংস্করণ বের করার আগে তখনি কেউ কেউ আমায় পরামর্শ দিয়েছিলেন দ্বিতীয় সংস্করণটি যে ভাবে বেরিয়েছে তা পুরোপুরি পরিমার্জন করতে। তাঁদের সাথে আমি দাস ব্যবস্থা নিয়ে কিছু আলাপ করছিলাম।

www.pathagar.com

সে ভিত্তিতেই তাঁদের পরামর্শ। এই পরামর্শের যৌক্তিকতা অস্বীকার না করলেও আমি তা গ্রহণ করতে পারিনি। তার কারণগুলি পূর্বোক্ত দুটি অনুচ্ছেদে বিবৃত করতে চেষ্টা করেছি। দ্বিতীয় সংস্করণের পর বাংলার ইতিহাস সম্পর্কে তাৎপর্যপূর্ণ যে দুটি বিষয় আমার নজরে পড়েছে তা হলো দাস-ব্যবস্থা ও ভূমিতে ব্যক্তিমালিকানা সংক্রান্ত। তবে সেই আলোকে বাংলার ইতিহাস পুনর্গঠনের মত মালমশলা আমার হাতে নেই। আবিষ্কৃত তথ্যাদির ভিত্তিতে তা সম্ভব বলেও আমি মনে করিনা। সেজন্য দ্বিতীয় সংস্করণে যা ছিল তা অবিকৃত রেখে (সামান্য কিছু সংশোধন ছাড়া) তৃতীয় সংস্করণের ভূমিকাতেই এই বিষয়ে আমার কাছে যা নতুন মনে হয়েছে তা সংশোধন করেছি। এটা সচরাচর করা হয় না। তবু এটাই আমার কাছে শ্রেয় বলে মনে হয়েছে। উদ্দেশ্য, বাংলার ইতিহাস সম্পর্কে আরও গভীর গবেষণার সূচনা।

কেউ কেউ আরও বলেছেন এগুলি অর্থাৎ পূর্বোল্লিখিত বক্তব্যসমূহ যদি সত্যও হয় তবু বাংলার ইতিহাসের ক্ষেত্রে তা খুব গুরুত্বপূর্ণ নয়। আমার কিন্তু তা মনে হয় না। সমাজ বিকাশের ধারা সম্পর্কে জ্ঞান, এখানে সামন্তবাদের প্রকৃতি প্রভৃতি বিষয়গুলি আমাদের জন্যে বাস্তব ভাবে বর্তমানে ইতিহাসকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার জন্যেও প্রয়োজনীয়।

উপরোক্ত কারণসমূহের কারণেই আমি তৃতীয় সংস্করণের ভূমিকায় দ্বিতীয় সংস্করণ থেকে কোন কোন ক্ষেত্রে কিছুটা ভিন্নতর বক্তব্য উপস্থাপিত করছি। আর আশা করছি একই বইয়ে এই বিভিন্নমুখী দৃষ্টিভঙ্গী বাংলার ইতিহাস সম্পর্কে গভীরতর গবেষণার প্রেরণা যোগাবে।

তবে তৃতীয় সংস্করণে যা সংশোধিত তা দ্বিতীয় সংস্করণে উল্লিখিত তথ্যাদির বিপরীত নয়, তার সম্প্রসারণ কিছুটা নতুনত্ব সহ। দ্বিতীয় সংস্করণকে অবিকৃত রেখে, ভূমিকাতে বাকীটুকু সংযোজনের এটাও অন্যতম কারণ।

প্রাচীন ভারতীয়, সেই সুবাদে বাঙলার ইতিহাসের দুটি প্রশ্ন নিয়ে বিতর্ক বা জটিলতার অবসান আজও পুরোপুরিভাবে হয়নি। একটি দাস ব্যবস্থা ও অপরটি ভূমির মালিকানা। উভয় প্রশ্ন সম্পর্কে সুনির্দিষ্টভাবে

www.pathagar.com

কিছু বলা কঠিন। তবে এ সম্পর্কে উপমহাদেশীয় ও তার বাইরে সাম্প্রতিক চিন্তাভাবনা যা এই বইয়ে ইতোপূর্বে সন্নিবেশিত হয়নি বা পুরোপুরি-ভাবে হয়নি তা সংক্ষেপে এখানে উপস্থাপিত করতে চেষ্টা করবো।

দাস প্রথা

দাস প্রথা সম্পর্কে কিছু কথা এর আগে বইতে বলা হয়েছে। সমাজ-ব্যবস্থা হিসেবে দাস সমাজ ব্যবস্থা অর্থাৎ যে সময় ক্রীতদাস নিয়োগ করে মূলতঃ উৎপাদন করা হতো তার অস্তিত্ব ভারত বা বাঙলায় ছিল কিনা এ নিয়ে কি ইউরোপীয় বা ভারতীয় পণ্ডিতরা তেমন কিছু বলেন নি। ফলে এমন একটা ধারণা প্রচলিত যে, মূলতঃ গৃহকর্মে দাস নিয়োগের সাক্ষ্য থাকলেও সমাজ ব্যবস্থা হিসেবে দাস ব্যবস্থার অস্তিত্ব ভারতীয় উপমহাদেশ বা বাঙলায় ছিল না। আমি আমার বইয়ে এই ব্যাপারে সুনির্দিষ্টভাবে কিছু না বললেও (কারণ এই ব্যাপারে সুনির্দিষ্টভাবে কিছু বলতে গেলে যে পরিমাণ গবেষণার ভিত্তি থাকা দরকার তা এখনো অনুপস্থিত) একটা কথা বলতে চেষ্টা করেছি যে, প্রাচীন কৌম সমাজের ভাঙনের পর এবং সামন্ত প্রথা দৃঢ়ভাবে প্রতিষ্ঠিত হবার আগে বাঙলায় যে সমাজ ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠিত ছিল তা ঠিক সামন্ত সমাজ ছিল না। এভাবে কথা বলা অবৈজ্ঞানিক নিঃসন্দেহে। কিন্তু ভালভাবে না বুঝে কোন বিশেষ নামে এই সময়কালকে চিহ্নিত করা বোধহয় ততোধিক অবৈজ্ঞানিক। যা প্রয়োজন তা হলো, এ বিষয়ে আরও গভীর গবেষণা।

সোভিয়েত ভারতত্ত্ববিদরা, বিশেষ করে গ. ফ. ইলিন উপমহাদেশে দাস প্রথা সম্পর্কে মূল্যবান গবেষণা চালিয়েছেন। মূলতঃ তাঁদের বক্তব্যের উপর নির্ভর করে এ সম্পর্কে কিছু কথা এখানে উপস্থাপিত করবো।

তবে এই প্রসঙ্গে একটি জিনিস মনে রাখা দরকার। তা হলো, এই উপমহাদেশের বিশাল ভূভাগে ইতিহাস বা সমাজ-বিকাশ কোন সময়ই সমান তাল বা লয়ে অগ্রসর হয় নি। এই অসম বিকাশই স্বাভাবিক। ক্রীতদাস প্রথার সূচনা হয় বৈদিক যুগে। তবে তখন তার বিকাশ ছিল খুবই ধীর। মৌর্য সাম্রাজ্যের আমলে এই বিকাশ অপেক্ষাকৃত দ্রুত হয়ে ওঠে। তবে মৌর্য সাম্রাজ্যের সর্বত্রই যে সমাজ বিকাশের স্তর একরকম ছিল তা নয়।

www.pathagar.com

মৌর্য সাম্রাজ্যের আয়তন ছিল বিশাল। এবং এই বিশাল সাম্রাজ্যের সব-খানে সমাজ-বিকাশের পর্যায় একই ছিল না। বাঙলার উত্তরাঞ্চল মৌর্য সাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত ছিল।

বৌদ্ধ পুঁথিসমূহে ক্রীতদাসদের নানা জায়গায় বিশদ উল্লেখ আছে। এই পুঁথিগুলিতে ক্রীতদাসদের তুলনা করা হয়েছে গৃহপালিত প্রাণীর সাথে। বস্তুতঃ তাদের মানুষ বলে মনে করা হতো না। গোড়ার দিকের মহাকাব্যগুলিতেও ক্রীতদাসদের উল্লেখ করা হয়েছে গরু, ছাগল প্রভৃতি গৃহপালিত পশুর সাথে। তাদের আখ্যায়িত করা হয়েছে খামার পালিত জন্তু হিসেবে। ক্রীতদাসদের সম্পর্কে এই ধারণার সাথে প্রাচীন গ্রীস বা রোমে তাদের সম্পর্কে প্রচলিত ধারণার সাদৃশ্য চোখে পড়ার মতো। সে সময় প্রাচীন গ্রীস বা রোমে ক্রীতদাসদের আখ্যায়িত করা হতো সবাক যন্ত্র (talking fool) হিসেবে। কোন কোন পুঁথিতে তাদের দ্বিপদ প্রাণী হিসেবে উল্লেখ করা হয়েছে। যাদের সম্পর্কে ধারণা ছিল এরকম তাদের জীবন যাত্রা যে মোটেই সহজ ছিলনা তা বুঝতে অসুবিধে হয় না। বস্তুতঃ বৌদ্ধ পুঁথিগুলি থেকেই জানা যায় যে, তাদের লোহার অংকুশ দিয়ে চালনা করা হতো। অনেক সময়ই তাদের শেকল দিয়ে বেঁধে কাজ করানো হতো।

ক্রীতদাস মালিক কারা ছিল তা সহজেই অনুমেয়। বিত্তবানরা ছিলেন ক্রীতদাসদের মালিক।

সমাজব্যবস্থা হিসেবে বিচার করতে গেলে সবচেয়ে যে বিষয়টি গুরুত্ব-পূর্ণ তা হলো, উৎপাদনের ক্ষেত্রে দাস-শ্রমের ভূমিকা।

আমরা জানি রাজাদের থাকতো বিশাল খাসমহাল। বৌদ্ধ শাস্ত্রের সাক্ষ্য অনুযায়ী এই খাসমহালগুলিতে আবাদের জন্যে বিশেষভাবে বীজ বোনার জন্যে ক্রীতদাস বা ঠিকা-মজুর ব্যবহার করা হতো। বৃহদায়তন খামার মালিকদের জমিতেও চাষাবাদের জন্যে ক্রীতদাস নিয়োগ করা হতো। জমিতে লাঙ্গল দেয়া, বীজ বোনা, ফসল কেটে ঘরে তোলার পুরো কাজটাই করতো ক্রীতদাসরা। বৌদ্ধ শাস্ত্রাদিতে এই ক্রীতদাসদের সম্পর্কে বিশেষ ভাবে উল্লেখ আছে। বৌদ্ধধর্মাবলম্বী মালিকরা ক্রীতদাস নিয়োগ কর-তেন। কিন্তু ক্রীতদাসরা বৌদ্ধসম্প্রদায়ের সদস্য হতে পারতেন না।

www.pathagar.com

এটা ঠিকই প্রাচীন গ্রীস বা রোমের মত দাস-শ্রম যে সময়ের কথা বলা হচ্ছে সে সময় উৎপাদনের মুখ্য ধরণ হয়ে দাঁড়ায়নি। ঠিকা মজুরের কথা আগেই বলা হয়েছে। তাছাড়া ভাড়াটে চাষীপ্রজা নিয়োগ করেও ভূস্বামীরা আবাদ করাতেন। তাছাড়া সমগ্র ভারতীয় ইতিহাসের অন্যতম বৈশিষ্ট্য শোষক ও শোষিতের মধ্যে পিতাপুত্রের সম্পর্কের ন্যায় সম্পর্ক অনেক সময়ই উলঙ্গ শোষণের ব্যাপারটা আড়াল করে রাখতো। এ ক্ষেত্রে অর্থাৎ দাসদের ক্ষেত্রেও এ প্রশ্নে ব্যতিক্রম হয়নি। অর্থশাস্ত্র প্রণেতা কৌটিল্য সাময়িক ও স্থায়ী এই দুই ধরনের ক্রীতদাসের কথা উল্লেখ করেছেন। তিনি স্বাধীন আর্যরা যাতে দাসে পরিণত না হয় সে ব্যাপারে বক্তব্য রেখেছেন সবিশেষ যত্নের সাথে। উচ্চতর বর্ণের যে সদস্যরা ভাগ্য বিপর্যয়ে ক্রীতদাসে পরিণত হতেন কৌটিল্য তাঁদের পক্ষে অবস্থান গ্রহণ করেছিলেন। তাছাড়া প্রাচীন ভারতে গৃহকর্মের জন্যে দাসদের ব্যবহার ছিল ব্যাপক। বস্তুতঃ এটা ছিল উপমহাদেশীয় দাস ব্যবস্থার অন্যতম বৈশিষ্ট্য। ফলে দাসদের সাথে মালিক-দের সম্পর্কের ক্ষেত্রে পিতা-পুত্রের ছোঁয়াচ লাগাটা ছিল স্বাভাবিক। "সম্ভবতঃ এরই ফলে মোগাস্থেনিষ এই ভ্রান্ত উক্তি করেছিলেন যে, 'সকল ভারতীয়ই সে যুগে ছিল স্বাধীন এবং ক্রীতদাস বলে কেউ ছিল না" (ভারতবর্ষের ইতিহাস। কো. আন্তনোভা, গ্রি. বোল্‌গার্দ, লেভিন, গ্রি. কতোভ্‌স্কি। প্রগতি প্রকাশন, মস্কো—পৃ: ১২৬)

বস্তুতঃ বৌদ্ধ ধর্মশাস্ত্রগুলিই দাসদের সম্পর্কে জানার সবচেয়ে বড় সূত্র। যে সময়ের কথা বলা হচ্ছে সে সময় উপমহাদেশে রাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠিত হলেও দেশের সর্বত্র তা বিস্তৃত ছিল না। কতকগুলি রাষ্ট্র গণ বা সঙ্ঘ বলে অভিহিত হতো। এগুলি ছিল অভিজাত বা বিত্তবানদের শাসিত প্রজাতন্ত্র। এখানে বিত্তবানরা শাসকদের মনোনীত করতো যা অনেক সময়ই রাজা বলে অভিহিত হতো। এই প্রজাতন্ত্রগুলিতে সমাজের বিত্তবান ও প্রভাবশালী অর্থাৎ ক্ষত্রিয় সদস্যদের সাথে প্রজাতন্ত্রের অন্যান্য সদস্যের বিরোধ ছিল খুবই তীব্র। বৌদ্ধ ধর্মশাস্ত্রে শাক্য প্রজাতন্ত্রের ক্রীতদাসদের প্রকাশ্য বিদ্রোহের কথা উল্লিখিত হয়েছে। এখানে উল্লেখ্য বুদ্ধ ছিলেন শাক্য বংশোদ্ভূত। বুদ্ধ যাঁদের কাছে অধ্যয়ন করেছিলেন তাঁদের মাঝে কেউ কেউ যে দাস বিদ্রোহের নেতা ছিলেন সে বিষয়ে বইয়ে ইতোপূর্বেই উল্লিখিত হয়েছে।

www.pathagar.com

এখানে দাস-ব্যবস্থা সম্পর্কে যেটুকু আলোচনা করা হলো তার প্রায় সবটুকু মগধ ও মৌর্যসাম্রাজ্য সম্পর্কিত। বাংলা সম্পর্কে এ ব্যাপারে স্বতন্ত্র আলোচনা উত্থাপিত হয়নি, কারণ সুস্পষ্ট তথ্যের অভাবে তা করা সম্ভব নয়। তবে বরেন্দ্রী ছিল মৌর্য সাম্রাজ্য অন্তর্গত। তাছাড়া সামন্ত সমাজ ব্যবস্থা পুরোপুরি জেঁকে বসার সময় সমাজের যে লক্ষণ দেখা যায় তার সাথে এ সময়কার বাংলার সমাজ-কাঠামো ঠিক একরকম নয়। যেটুকু প্রমাণাদি পাওয়া যায় তাতেই একথা বলা সম্ভব। বিশেষতঃ এ সময় ব্যবসা-বাণিজ্যে বাংলার সমৃদ্ধি এক বিশেষ উল্লেখযোগ্য ব্যাপার। সামন্ত সমাজে কৃষি-নির্ভরতা আরও বৃদ্ধি পায়। এ সময় ব্যবসায়ী, কারুশিল্পী প্রভৃতিরা ছিলেন সমাজে গণ্যমান্য। সামন্ত সমাজ যখন জেঁকে বসেছে তখন তারা সামাজিক মর্যাদায় অধঃপতিত। এ সব ব্যাপারে ইতোপূর্বে বিস্তারিত-ভাবেই উল্লিখিত হয়েছে। সমাজে যখন সামন্ত ব্যবস্থা পুরোপুরি জেঁকে বসেনি এবং সমাজ শ্রেণী বিভক্ত তখন অর্থনীতিক কর্মকান্ডে দাস শ্রমের ব্যবহার উড়িয়ে দেয়া যায় না। এ বিষয়ে গভীর গবেষণার প্রয়োজন আছে। সে ব্যাপারে ঐতিহাসিকদের দৃষ্টি আকর্ষণ করছি।

জমির ব্যক্তিগত মালিকানা

একটি কথা ব্যাপকভাবে প্রচলিত এবং এই প্রচলিত মতের উৎস চন্দ্র-গুপ্তের রাজদরবারে আগত মোগাস্থিনিসের উক্তি যে প্রাচীন ভারতে শেষ বিচারে জমির কোন ব্যক্তিগত মালিকানা ছিল না। শেষ বিচারে জমির মালিকানা ছিল সম্রাটের। এই ধারণার দ্বারা পরবর্তীকালে উপমহাদেশীয় ঐতিহাসিকরা পরিচালিত হয়েছেন। বাঙলার ইতিহাস সম্পর্কে যাঁরা মৌলিক গবেষণা করেছেন তাঁরাও একই ধারণা দ্বারা পরিচালিত হয়েছেন। এর সাথে যুক্ত হয়েছে সেচ কার্য সম্পর্কে কেন্দ্রীয় সরকারের দায়িত্ব জনিত বৈশিষ্ট্য। এই বৈশিষ্ট্যটি সমস্ত জমির উপর চূড়ান্ত বিচারে মালিকানা ছিল সম্রাটের এই ধারণা দৃঢ়তর করতে সাহায্য করেছে। আমার লেখা ইতোপূর্বেকার সংস্করণগুলিতেও তার ছাপ বিদ্যমান। প্রাচীন ভারতীয় আকার গ্রন্থগুলিতে তার বিস্তারিত সাক্ষ্য এবং ছাপও বিদ্যমান। এ ব্যাপারে সুনির্দিষ্টভাবে কিছু বলা কঠিন বলেই পূর্বোক্ত মতের

www.pathagar.com

বিপরীত সাক্ষ্য সম্পন্ন প্রমাণগুলি এখানে উল্লিখিত করছি সেই ভিত্তিতে পূর্বোক্ত লেখা সংশোধন না করেই। বিপরীত সিদ্ধান্তে উপনীত হতে সাহায্য করে এরূপ প্রমাণাদি বাংলার ইতিহাস সম্পর্কে আরও গভীর গবেষণার প্রয়োজনীয়তাকেই তীব্র করে তোলে। এ ব্যাপারে কোন প্রচলিত মত—তার প্রচলন যত ব্যাপকই হোক না কেন—স্বতঃসিদ্ধ বলে ধরে না নিয়ে তা খতিয়ে দেখা দরকার। আর সে প্রয়োজনীয়তার প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণের উদ্দেশ্যেই বর্তমান সংযোজন।

মানব ধর্মশাস্ত্র বা মনুসংহিতার সংকলন কাল খৃষ্টপূর্ব দ্বিতীয় শতক থেকে খৃষ্টীয় দ্বিতীয় শতকের মধ্যে। তাতে খুব স্পষ্টভাবেই উল্লিখিত হয়েছে যে প্রধান ব্যক্তিগত সম্পত্তির অন্যতম হলো ভূমি।

বস্তুতঃ দেশের সকল জমি মালিকানা অনুসারে তিনভাগে বিভক্ত ছিল। সেই তিনটি ভাগ হলো ব্যক্তিগত, রাজকীয় বা রাজার খাসদখল এবং সমষ্টি-গত বা সামাজিক।

জমির উপর ব্যক্তিগত মালিকানার ভিত্তি ছিল দৃঢ়। নারদস্মৃতি খৃষ্টীয় তৃতীয় ও চতুর্থ শতকের গ্রন্থ। সেখানে আছে জমির উপর ব্যক্তিগত মালিকানা খর্ব করতে পারতেন না। বৃহস্পতির স্মৃতিও সমসাময়িক গ্রন্থ। সেখানেও একই কথা বলা হয়েছে। সেখানে বলা হয়েছে কোন রাজা যদি একজনের ব্যক্তিগত মালিকানা কেড়ে নিয়ে অপরকে তা দান করেন তাহলে তিনি আইনবিরুদ্ধ কাজ করবেন। এই সম্পর্কে সোভিয়েত ভারততত্ত্ববিদ-দের মত হলো উপমহাদেশে জমির উপর ব্যক্তিগত মালিকানা দৃঢ়ভাবে প্রতিষ্ঠিত ছিল। মনুস্মৃতিতে বলা হয়েছে যে, কেউ যদি অন্যের জমিতে নিজের বীজ বপন করে তবে সে ফসলের মালিকানা জমির মালিকের উপর বর্তাবে। কারণ যার জমি তারই অধিকার সে জমিতে উৎপাদিত ফসলের উপর—তা তিনি আবাদ করুন বা না করুন। বস্তুতঃ জমির উপর ব্যক্তিগত মালিকানা ছিল অলঙ্ঘনীয়।

যারা জমির মালিক তাদের মাঝেও স্বাভাবিকভাবেই বর্তমানের মতো স্তর বিভাগ ছিল। তবে ক্ষুদে মালিকদের মালিকানাও ছিল সুরক্ষিত। আর জমির মালিকানা সংক্রান্ত তথ্যাদি সযত্নে নির্দিষ্ট দপ্তরে রক্ষিত

www.pathagar.com

হতো। নিজের মালিকানাধীন জমি ইচ্ছে করলে কেউ দান, বিক্রি করতে বা ইজারা দিতে পারবেন।

রাজা বা সম্রাট এই জমির উপর নির্দিষ্ট হারে করের অধিকারী ছিলেন। তাছাড়া ছিল রাজার খাস দখলী জমি। এগুলি রাজ সরকারের তত্ত্বাবধান ক্রীতদাস ক্ষেতমজুর দ্বারা আবাদ করা হতো। তাছাড়া আবাদের জন্য ভাড়াটিয়া কৃষক প্রজাদেরও দায়িত্ব দেয়া হতো।

তাছাড়া খনি, জঙ্গল, অনাবাদী বসতি জমি ছিল রাজার দখলে।

প্রাচীন কৌম সমাজের জের হিসেবে সামাজিক মালিকানাধীন জমিরও অস্তিত্ব ছিল। এই সামাজিক জমি ছিল গ্রামীণ সমাজের তত্ত্বাবধান। চারণভূমি, রাস্তা প্রভৃতি ছিল যৌথ মালিকানার দৃষ্টান্ত। যৌথ মালিকানাধীন গোচারণভূমির অস্তিত্ব তো এই সেদিন পর্যন্তও বিদ্যমান ছিল।

খৃষ্টজন্মের পরের শতকগুলিতে জমির উপর ব্যক্তিগত অধিকার ক্রমে দৃঢ় হতে শুরু করে। অন্যের জমি বে-আইনীভাবে হস্তগত করার শাস্তি এ সময় কঠিনতর হয়ে ওঠে। এই সময়ে রাজা বা ভূস্বামী কর্তৃক ভূমিদানের সংখ্যা বেড়ে যেতে শুরু করে তেমনি তার প্রকৃতিতেও পরিবর্তন দেখা দিতে থাকে। আগে ভূমিদান করা হতো সাময়িক বা নির্দিষ্ট সময়কালের জন্য—অর্থাৎ গ্রহীতা যতদিন নির্দিষ্ট সরকারী কাজে লিপ্ত থাকবেন ততদিনের জন্যই। কিন্তু এই সময়কালে তা প্রথম বেশী করে বংশানুক্রমিক হয়ে উঠতে থাকে। মালিকরাও অনেক ক্ষেত্রে কেন্দ্রীয় শাসকদের অধীনে নামমাত্র থাকলেও অনেক ক্ষেত্রে কার্যতঃ স্বাধীন হয়ে উঠতে শুরু করলেন। রাজাও তাদের আগের অনেক বাধ্যবাধিতা থেকে মুক্ত করে দিতে শুরু করলেন। ভূস্বামীর অধীনস্থ জমিতে যারা চাষবাস করতো তাদের উপর ভূস্বামী কিছু কিছু শাসন-পরিচালনার ক্ষমতা অর্জন করতে লাগলেন। আগে রাজকীয় পরিদর্শকরা চাষবাসের কাজ কেমন চলছে তা পরিদর্শন ও তদারক করতে পারতেন। ক্রমে রাজা ভূস্বামীদের এ ব্যাপারে রেয়াত দিতে শুরু করলেন। ষষ্ট শতকের দিকে দেখা যায়, রাজা ভূস্বামীদের উপর রাজকর, শাসন পরিচালনা ও অন্যান্য কতক আইনগত দায়-দায়িত্ব ছেড়ে দিচ্ছেন। এই অধিকারগুলি তাম্রশাসনে উৎকীর্ণ করে ভূস্বামীদের উপর ছেড়ে দেয়া হতে থাকলো। এইভাবে এই সময় ভূস্বামীরা ক্রমে সামন্ত

www.pathagar.com

ভূস্বামীদের কাছাকাছি বা অনুরূপ হয়ে উঠতে লাগলেন। কৃষকদের মাঝে স্তর বিন্যাসের ফলে অপেক্ষাকৃত দরিদ্ররা ক্রমেই জমি হারিয়ে ও অনেক সময় চাষাবাদের উপকরণ হারিয়ে পরিপূর্ণভাবে ভূস্বামীদের উপর নির্ভরশীল হয়ে পড়ছিলেন। তাছাড়া এ সময় আরও একটি বৈশিষ্ট্য দেখা যায়। তা হলো, জমি যখন এক মালিক থেকে আরেক মালিকের কাছে হস্তান্তরিত হচ্ছে তখন যে শুধু জমির মালিকানাই হস্তান্তরিত হচ্ছে তাই নয়। তার সাথে হস্তান্তরিত হচ্ছে সেই জমির কর্মরত কৃষকরাও।

এই সময়ের শাস্ত্র গ্রন্থাদির একটি বিষয়ে বিতর্কের সাক্ষাত পাওয়া যায়। তা হলো ক্রীতদাসের মুক্ত করার ব্যাপারে। দেখা যাচ্ছে, শাস্ত্র গ্রন্থাদিতে ক্রমেই সহজ শর্তে ক্রীতদাসদের মুক্ত করে দেয়ার স্বপক্ষে অভিমত ব্যক্ত করা হচ্ছে। বলা হচ্ছে নিতান্ত পেটের জ্বালায় যাঁরা দাসত্ব বরণ করেছেন তাঁরা যদি অন্নগ্রহণে অস্বীকার করেন অথবা যাঁরা পেটের দায়ে দাসত্ব গ্রহণে বাধ্য হয়েছেন তাঁরা যদি প্রাপ্য সুদসহ ঋণের অর্থ পরিশোধ করতে পারেন তাহলে দাসত্ব থেকে মুক্ত হবেন। সমাজে সামন্ত সম্পর্ক ক্রমে যে দৃঢ় হয়ে উঠছে দাসদের মুক্ত করে দেয়া সম্পর্কিত বিতর্ক তার অন্যতম প্রমাণ।

সমগ্র উপমহাদেশ হিসেবে, বিশেষতঃ উত্তরাপথে সামগ্রিকভাবে বিচার করলে বলতে হয় খৃস্টীয় ষষ্ঠ থেকে দ্বাদশ শতকের মাঝের সময়কাল হলো সামন্ততন্ত্রে উত্তরণের সময়কাল। এই পরিবর্তন চলে এক দীর্ঘকালীন সময়ব্যাপী এবং সমগ্র এলাকায় এই পরিবর্তন এক সময়ে হয়নি।

সামন্ততন্ত্রীকরণের একটি বৈশিষ্ট্য হলো, বেশী বেশী করে জমি খাজনার অধীনে আনা হতে থাকে। জমিদানের প্রক্রিয়া আর খাজনার অধীনে জমি আনা চলে সমতালে। আগে গ্রাম সমাজে মোড়লরা ছিলেন গ্রামীণ সমাজের স্বার্থরক্ষাকারী। ক্রমে তাঁরা হয়ে উঠলেন ক্ষুদে সামন্ত-ভূস্বামী।

বাংলাদেশে এ সময় ভূমিদানের আদেশ সম্বলিত তাম্রপট্টোলী পাওয়া গেছে। এতে দেখা যায় ভূমিদান করছেন রাজারা। তাছাড়া রাজা তাঁর অধীনস্থ কর্মচারীরা নানা ধরনের জাঁকজমকের খেতাবে বিশেষিত। সামন্ততন্ত্র যে ক্রমে জেঁকে বসছে তা এ থেকে বোঝা যায়। আঞ্চলিক ভূস্বামী-

www.pathagar.com

দের অধিকার ক্রমে বাড়তে থাকে এ সময়। বিশেষ করে দ্বাদশ শতাব্দীতে দেখা যায় সামন্তপ্রভুরা নিজেদের তালুকের অন্তর্গত জমি বাঁটোয়ারা, গ্রামীণ সমাজের অধীনে খাজনা বিলির অধিকারী হয়ে ওঠেন। দ্বাদশ শতকে দেখা যায়, জমির কর ছাড়াও নানা অজুহাতে সামন্তপ্রভুরা নানা-ধরনের কর আদায় করছেন। গ্রামে যখন রাজকর্মচারীরা যেতেন তখন রাজ-কর্মচারীদের থাকা-খাওয়ার ব্যবস্থা করতে হতো। তাছাড়া বাধ্যতামূলক শ্রমেরও প্রসার হতে থাকে। অনেকে এদেশের সামন্ততন্ত্রের ধরনের সাথে ইউরোপীয় চিরায়ত সামন্ততন্ত্রের পার্থক্যের দিকে ইঙ্গিত করে এদেশের সামন্ত সমাজকে কিছুটা ভিন্নতর বলে অভিহিত করতে চান। এই প্রসঙ্গে তাঁরা ইউরোপে প্রচলিত 'করভির' (বাধ্যতামূলক শ্রম) এদেশে অনুপস্থিতির কথা বলতে চান। অথচ দ্বাদশ শতকে দেখা যায়, এদেশে বেগার শ্রম ব্যাপক-ভাবেই প্রচলিত ছিল। হিন্দু-মন্দির ও মঠগুলিও ছিল সামন্তভূস্বামী। এরা ছিল যথেষ্ট পরিমাণে ধনী। মন্দির বা মঠের সাথে সম্পর্কিত ব্রাহ্মণেরা যৌথভাবেই ছিলেন সামন্ত ভূস্বামী।

এ সব থেকে বোঝা যায় বাংলাদেশে দশম, একাদশ, দ্বাদশ শতকে বিশেষতঃ শেষের দিকে সামন্ততন্ত্র ভালভাবেই জেঁকে বসেছে। তবে আগেই অর্থাৎ ইতোপূর্বেকার সংস্করণসমূহে বলতে চেষ্টা করেছি যে, আমাদের দেশের একটি বৈশিষ্ট্য হলো এখানে কোন সমাজ ব্যবস্থাই একে-বারে নিঃশেষে উৎপাটিত হয়ে পরবর্তী সমাজ সৃষ্টি হয় না। পরবর্তী সমাজে পূর্ববর্তী সমাজের স্মারক চিহ্নগুলি শুধু গোড়ার দিকে নয়, তার পরও দীর্ঘকাল টিকে থাকে। ট্রাইব্যাল সমাজের অসমাপ্ত বিলোপ আমাদের ইতিহাসের অন্যতম বৈশিষ্ট্য। তার নিদর্শন হিসেবেই হোক, আর গ্রামবাসীদের প্রতিরোধের কারণেই হোক বাংলাদেশে ভূমিদান করা হতো—রাজা যখন ভূমিদান করতেন তখন—সমগ্রভাবে স্থানীয় জনসাধারণ, বিশেষতঃ নিম্নবর্ণের লোকদের উপস্থিতিতে। এতে বোঝা যায় গ্রাম সমাজ কিছুটা হলেও প্রভাব অক্ষুণ্ণ রাখতে সক্ষম হয়েছিল। তবে পরবর্তীতে ভূমিদানের তাম্রশাসনগুলিতে ভূমিদানের সময় প্রজাসাধারণের উপস্থিতির উল্লেখ ক্রমে কমে আসতে থাকে। এ থেকে বোঝা যায় যে, তারা ক্রমে অধিকারহারা হচ্ছে।

www.pathagar.com

বার বার উল্লেখ করলেও একটি কথা পুনরায় উল্লেখ করে এই প্রসঙ্গের ইতি টানবো। তা হলো, এদেশের সমাজের অসম বিকাশের কথা। মৌর্য্য সাম্রাজ্যের সময় বরেন্দ্র অঞ্চল উক্ত সাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত হওয়ার তখন সেখানে মগধ অঞ্চলে প্রচলিত ব্যবস্থা মোটামুটি প্রবর্তিত ছিল এটা ধরে নেয়া যেতে পারে। তবে সে সময় সেই ব্যবস্থা বর্তমান বাংলাদেশের বিশেষতঃ পূর্ব বাংলায় প্রচলিত ছিল এটা ধরে নেয়ার কারণ নেই। তবে একাদশ, দ্বাদশ শতক বা তার কিছু আগে থেকে সারা বাংলাদেশে সামন্ততন্ত্র পুরো-পুরি প্রাধান্য বিস্তার করেছে এটা সুনিশ্চিত।

www.pathagar.com

www.pathagar.com

এক

"সকল দেশের রাণী সে যে
আমার জন্মভূমি।"

পলিমাটির দেশ বাংলা। জল-বৃষ্টি-বন্যা আর জোয়ারের দেশ। নামেই তার পরিচয়। নির্দিষ্ট করে বলার উপায় নেই। তবু পণ্ডিত ব্যক্তিরা যে অনুমান করেছেন তার সূত্র ধরেই বলা চলে, 'বঙ্গ'—যা থেকে এসেছে বাঙ্গালা দেশের নাম—শব্দটি মূলে ছিল চীন-তিব্বতী গোষ্ঠীর শব্দ। আর এই বঙ্গ শব্দের 'অং' অংশের সাথে গঙ্গা, হোয়াংহো, ইয়াং-সিকিয়াং ইত্যাদি নদী-নামের সম্বন্ধ ধরে তাঁরা অনুমান করেছেন যে শব্দটির মৌলিক অর্থ ছিল জলাভূমি। আবুল ফজল তাঁর 'আইন-ই-আক-বরীতে' বাঙ্গালা শব্দটির আর একটি ব্যাখ্যা দিয়েছেন। বলেছেন বঙ্গ শব্দের সাথে আল্ যুক্ত হয়ে হয়েছে বাঙ্গাল বা বাঙ্গালা। আর 'আল্' বলতে তো শুধু ক্ষেতের আল্ বোঝায় না, ছোট-বড় বাঁধও বোঝায়। বাংলাদেশ বন্যা আর বৃষ্টির দেশ, কাজেই ছোট-বড় বাঁধেরও দেশ। নামের সাথেই মিলেমিশে রয়েছে দেশের প্রকৃতি।

সীমানা

অনেক কিছুর মতোই ইতিহাসের বিভিন্ন পর্যায়ে বাঙ্গালা দেশের চতুঃসীমারও পরিবর্তন হয়েছে। সুপ্রাচীনকালে বঙ্গ বা বাঙ্গাল বলতে যে জায়গা বোঝাত তা আজকের পূর্ব ও পশ্চিম বাংলার অংশ মাত্র। বৃটিশ ভারতে বাংলদেশের যে চতুঃসীমা, তা তখন ছিল বিভিন্ন জনপদের সমষ্টি। এই জনপদগুলির নাম কি ছিল, কোথায় অবস্থিত ছিল এগুলো বা এখানে কারা বাস করতো, সে কথা পরে। যেটা লক্ষ্য করার মতো ব্যাপার তা হ'ল সপ্তম-অষ্টম শতক থেকেই কখনো বা পাল সাম্রাজ্যের আওতায়, আবার কখনো সেন রাজ্যের সীমানার মাঝে ধীরে ধীরে এই জনপদগুলি ঐক্যবদ্ধ হচ্ছিলো। আরও পরে, পাঠান আমলে বঙ্গ নামেই বাংলার সবগুলো জনপদ ঐক্যবদ্ধ হয়। সেই থেকে এই ভূভাগের সবটুকুই

www.pathagar.com

বঙ্গ বা বাঙ্গালা নামে পরিচিত। আকবরের আমলে এর নাম ছিল—সুবা বাংলা।

বৃটিশ ভারতে বাংলাদেশের যে সীমানা আকবরের সুবা বাংলার সীমানা ছিল তার চাইতে অনেক বেশী ব্যাপক। পরগণা আকমহল (বর্তমানে রাজমহল), শ্রীহট্ট ও পূর্ণিয়া পরগণা, সাঁওতাল পরগণার অন্তর্গত তেলিয়াগারি গিরি-সংকট ছিল সুবা বাংলার অন্তর্ভুক্ত। বর্তমান দ্বারভাঙ্গা (দ্বারবঙ্গ) ছিল পশ্চিমতম সীমান্তে। উত্তরে তুষার-শুভ্র হিমালয় পর্যন্ত বাংলাদেশের সীমানা বিস্তৃত হয়েছিল আরও আগে—গুপ্ত রাজাদের আমলে। আরও পরের কথা ধরা যাক না কেন, ১৮৭৪ সালে অর্থাৎ এই সেদিনও কাছাড় ও গোটা শ্রীহট্ট জিলা ছিল ঢাকা বিভাগের অন্তর্ভুক্ত। এ থেকে দেখা যায়, বিভিন্ন জনপদগুলি নিজেদের স্বাতন্ত্র্য ঘুচিয়ে অখণ্ড রাষ্ট্র-সম্বন্ধে আবদ্ধ হবার এবং বাংলা বা সুবা বাংলা নামে পরিচিত হবার পরও বিভিন্ন সময় রাজনৈতিক কারণে ইতিহাসের বিভিন্ন পর্যায়ে বাংলার রাষ্ট্রীয় সীমারেখার হেরফের হয়েছে। আয়তন কখনো সম্প্রসারিত হয়েছে, কখনো বা হয়েছে সীমিত।

কিন্তু এতোসব সত্ত্বেও অর্থাৎ ইতিহাসের উত্থান-পতনের সাথে সাথে রাজনৈতিক সীমারেখার পরিবর্তন সত্ত্বেও বাংলা ভাষাভাষী বাঙালীরা যে ভূভাগে বাস করে তার প্রাকৃতিক সীমারেখার বদল আজ পর্যন্তও হয়নি।

বিভিন্ন জনপদরাষ্ট্র নিজেদের স্বাতন্ত্র্য ঘুচিয়ে মোটামুটি এক রাষ্ট্র কাঠামোয় ঐক্যবদ্ধ হওয়া ও মাগধী প্রাকৃতের পর্যায় থেকে প্রাচীন বাংলার আত্মপ্রকাশ অনেকটা কাছাকাছি সময়ের ঘটনা। এ সম্পর্কে পরে আরও আলোচনা করা হবে।

বাংলা ভাষাভাষী বাঙালীরা যে সুনির্দিষ্ট প্রাকৃতিক সীমারেখার মাঝে বাস করে তার উত্তরে অভ্রংলেহী হিমালয়, হিমালয়ের পাদস্থিত বিভিন্ন পার্বত্য কৌমের বাসস্থান ও জলপাইগুড়ি জেলা, উত্তর-পূর্বে বর্তমান আসামের ব্রহ্মপুত্র উপত্যকার পশ্চিমতম প্রান্ত, পূর্ব ব্রহ্মপুত্র নদ, আর অনুচ্চ খাসিয়া, জৈন্তিয়া ও গারো পাহাড়, পূর্ব-দক্ষিণে চট্টগ্রাম ও আরাকান গিরিরাজি। প্রাচীন ও মধ্যযুগের পর অবশ্য পশ্চিম সীমার পরিবর্তন ঘটেছে। সে যুগে পশ্চিম সীমা ছিল দ্বারভাঙ্গা জিলার পশ্চিমতম প্রান্ত অর্থাৎ গঙ্গার তীর পর্যন্ত বিস্তৃত।

www.pathagar.com

আধুনিক উত্তর বিহার ও উত্তর বঙ্গের মাঝে যে পার্থক্য তা মধ্যযুগ থেকে গড়ে উঠেছে। আগে দু'য়ের মাঝে পার্থক্য ছিল খুবই কম। তখন রাজমহল ও আধুনিক সাঁওতাল পরগণাও ছিল বাংলার অন্তর্গত। মানভূম পেরিয়ে ছোট নাগপুরের পর্বতমালা। এই পর্বতমালাই ছিল এ অঞ্চলে প্রাচীন বাংলার সীমারেখা। খুব নির্দিষ্ট করে বলতে গেলে বলা চলে রাজমহল থেকে বেরিয়ে যে অনুচ্চ পর্বতমালা ও লালমাটির মালভূমি সোজা দক্ষিণে প্রসারিত হয়ে সমুদ্র স্পর্শ করেছে তাই বাংলার স্বাভাবিক পশ্চিম সীমা। আধুনিক উড়িষ্যার, ময়ূরভঞ্জ-কেওঞ্জর-বালেশ্বর এই সীমান্তের অন্তর্গত। রাষ্ট্রীয় সীমারেখায় এই অঞ্চলের অবস্থান যেখানেই হোক না কেন, কি ভাষা কি সামাজিক জীবনযাত্রা কি কৌম-বিন্যাস সব দিকে। এই অঞ্চল বাংলার সাথে সম্পৃক্ত।

এক কথায় উত্তরে হিমালয়, উত্তর-পূর্বে ব্রহ্মপুত্র নদ ও তার উপত্যকা, পূর্বে গারো-খাসিয়া-জৈন্তিয়া-ত্রিপুরা ও চট্টগ্রামের গিরিরাজি, উত্তর-পশ্চিমে দ্বারভাঙ্গা পর্যন্ত গঙ্গার উত্তর তীরবর্তী সমতল ভূমি, পশ্চিমে রাজমহল, সাঁওতাল পরগণা, ছোট নাগপুর, মানভূম, ধলভূম, ময়ূরভঞ্জ ও কেওঞ্জরের জঙ্গলাকীর্ণ মালভূমি ও দক্ষিণে বঙ্গোপসাগর—এই চৌহদ্দির মাঝে যে বিরাট ভূভাগ এটাই হলো বাংলা ভাষাভাষী বাঙালীর বাসস্থান, তাদের কর্মক্ষেত্র। যুগে যুগে এখানেই তারা নতুন নতুন রাজ্যের পত্তন করেছে, গড়ে তুলেছে নতুন নতুন শহর, শিল্প-কর্মে চমক লাগিয়েছে দূর-দূরান্তের অধিবাসীদের।

এই ভূভাগই হলো বাংলাদেশে—ঐতিহাসিককালে বাঙালীর জন্মভূমি।

ভূ-প্রকৃতি

সুজলা-সুফলা-শস্যশ্যামলা বাংলা। পৃথিবীর বৃহত্তম বদ্বীপ অঞ্চল। এই বদ্বীপ অঞ্চলের বেশীর ভাগ ভূভাগই গড়ে উঠেছে গঙ্গা-ভাগীরথী-পদ্মা-মেঘনা-যমুনা-ব্রহ্মপুত্র বয়ে নেমে আসা পলি-মাটিতে, পৃথিবীর প্রাচীন ভূ-ভাগগুলির তুলনায় অপেক্ষাকৃত হাল আমলে। এই তো বেশী দিনের কথা নয় যতদূর জানা যায়, জল সরে গিয়ে ফরিদপুরের কোটালিপাড়া অঞ্চল মাত্র মাথা তুলেছে খ্রীস্টীয় ষষ্ঠ শতকে। তখনো এই অঞ্চল ছিল সমুদ্রের কাছাকাছি একটি গুরুত্বপূর্ণ বাণিজ্যকেন্দ্র। এখানে প্রাপ্ত চন্দ্র

www.pathagar.com

বর্মনের তাম্র শাসনেই এ সময়ে এই এলাকার বাণিজ্যিক সমৃদ্ধির কথা জানা যায়। আর শুধু তো কোটালিপাড়া নয়— শত শত বছর ধরে জমে ওঠা পলিমাটিতে এ ভাবেই সৃষ্টি হয়েছে বহু নতুন জনপদ। আবার এই পলিমাটি জমে জমে নদীপথও অগভীর হয়েছে। কখনো দুকূল বেয়ে উপচে পড়েছে বর্ষার বিপুল জলরাশি, কখনো বা নদীপথ সরে গিয়ে জলাভূমির সৃষ্টি হয়েছে, ভেঙ্গে তছনছ হয়েছে বাংলার ভূভাগ। কিন্তু তাতে ভূ-প্রকৃতির মৌলিক কোনও পরিবর্তন হয়নি।

যদিও বাংলার অধিকাংশ ভূ-ভাগই অপেক্ষাকৃত নতুন বা নবভূমি, তবু এই নতুনের মাঝে সবটুকু ঠিক নতুন নয়। আবার পশ্চিমাংশে বেশ কিছুটা প্রাচীন বা পুরাভূমিও বিদ্যমান।

বাংলার পশ্চিমাংশের পুরাভূমি রাজমহলের দক্ষিণ থেকে শুরু করে সমুদ্র পর্যন্ত বিস্তৃত। রাজমহল, সাঁওতাল পরগণা, মানভূম-সিংভূম-ধলভূমের জঙ্গলাকীর্ণ পার্বত্য প্রদেশ এই পুরাভূমির অন্তর্গত। মেদিনী-পুর-বাঁকুড়া-বর্ধমান-বীরভূম ও মুর্শিদাবাদের উচ্চতর লালমাটি অঞ্চলও পুরাভূমির অংশ। রাণীগঞ্জ-আসানসোলের অংশ বিশেষ, বাঁকুড়া-মেদিনী-পুরের কিয়দংশ এই পুরাভূমিরই নিম্নাঞ্চল।

আবার এই পুরাভূমিরই একটি শাখা রাজমহলের উত্তরে গঙ্গা পেরিয়ে উত্তর বাংলায়ও বিস্তৃত হয়েছে। বীরভূম মুর্শিদাবাদের মতোই এখানকার মাটিও লাল, স্থূল বালুময়। মালদহ-রাজশাহী-দিনাজপুর-রংপুরের ভিতর দিয়ে ব্রহ্মপুত্র পার হয়ে তার দুই তীর বেয়ে আসামের পার্বত্য অঞ্চল পর্যন্ত ব্যাপ্ত হয়েছে লালমাটির এই রেখা। এ যেন পলিমাটি দিয়ে গড়া বাংলাদেশের উর্বর ভূমি বেষ্টন করে অনুর্বর পুরাভূমির একটি বন্ধনী। উত্তরবাংলায় এই পুরাভূমির একটা অংশ অপরাংশের চেয়ে কিছুটা উঁচু। বগুড়া, উত্তর রাজশাহী, পূর্ব দিনাজপুর আর রংপুরের পশ্চিমাঞ্চল ব্যাপী অপেক্ষাকৃত উঁচু এই এলাকাই হলো ইতিহাস প্রসিদ্ধ বরিন্দ-বরেন্দ্রভূমির কেন্দ্রস্থল।

বাংলার পশ্চিমাঞ্চলের পুরাভূমির বন্ধনীটুকু বাদ দিলে আর বাদ বাকী প্রায় সবটুকু (চট্টগ্রাম ও ত্রিপুরার পার্বত্য অঞ্চল বাদ দিয়ে) হলো নবভূমি গঙ্গা, পদ্মা, ব্রহ্মপুত্র ও তার উপনদীসমূহের জলে সিঞ্চিত। পশ্চিমে লাল মাটির বুক ভেদ করে নেমে এসেছে ময়ূরাক্ষী, অজয়, রূপনারায়ণ,

www.pathagar.com

ইতিহাস প্রসিদ্ধ কপিশা (আধুনিক কসাই) গঙ্গার বিভিন্ন উপনদীসমূহ। এদের জলে উর্বর হয়েছে পুরাভূমি সংলগ্ন সমতলভূমি, রুক্ষ লাল মাটি উধাও হয়েছে, দেখা দিয়েছে স্তরে স্তরে জমে ওঠা পলিতে উর্বর শস্যশ্যামল নবভূমি। উত্তরেও ঠিক পশ্চিমের মতোই লালমাটি অঞ্চলকে ঘিরে আছে আত্রাই-মহানন্দা-করতোয়ার জল আর পলিমাটি দিয়ে গড়া ভূ-ভাগ। আর পূর্ব বাংলার তো কথাই নেই। শ্রীহট্টের পূর্বাঞ্চল, ময়মনসিংহের মধুপুর গড়, ঢাকার ভাওয়ালের গড়, পার্বত্য ত্রিপুরা, পার্বত্য চট্টগ্রাম বাদ দিয়ে পূর্ব বাংলার সবটুকুই হলো নবভূমি। এর মাঝে ময়মনসিংহ, ঢাকা, ফরিদপুর, ত্রিপুরার সমতলভাগ ও শ্রীহট্টের অধিকাংশ ভূমি তুলনা-মূলকভাবে প্রাচীন। খুলনা, বরিশাল, চট্টগ্রাম ও নোয়াখালীর সমতল ভূমি অঞ্চল আরও নতুন। সেজন্যই এ অঞ্চলকে বলা হয় নাব্যমণ্ডল। মধ্য ও দক্ষিণ বঙ্গেরও একই অবস্থা। সমুদ্রের নিকটবর্তী বিরাট নদীর জলে সিঞ্চিত, নদী-নালা-খাল-বিল-জলাভূমি সমাকীর্ণ নবভূমি বৃক্ষশ্যামল শস্যবহুল জনপদ।

নদ-নদী

বাংলা নদীবহুল দেশ। নদী বাংলার প্রাণ। নদীপথে বাঙালী বাণিজ্যের, পসরা ভাসিয়ে বিদেশে যাত্রা করে, নদীর জলে সিঞ্চিত মাটির বুকে ফসল ফলায়। বলতে গেলে এই নদীই বাংলাকে গড়ে তুলেছে, বাঙালীর ভাগ্য নিয়ন্ত্রণ করেছে। সেই জন্যই তো নদীর সাথে বাঙালীর নাড়ীর টান।

বাংলা গোটা পূর্ব ভারতের নদীসমূহের সঙ্গমস্থল। উত্তর ভারত আর আসামের সমতলভূমি বেয়ে উপনদী-শাখানদীসমূহ নিয়ে নেমে এসেছে গঙ্গা-ব্রহ্মপুত্র। বাংলার নরম পলিপড়া মাটিতে এসে নানা শাখা উপশাখায় বিভক্ত হয়েছে। এ যেন একটা বিরাট জাল গোটা বাংলাদেশ জুড়ে বিস্তৃত। বর্ষার বিপুল জলরাশি সমগ্র উত্তর-ভারত আর আসামের পলি-প্রবাহ বুকে নিয়ে এই জাল বেয়ে সমগ্র বাংলাদেশে ছড়িয়ে পড়ে। বাংলার নবভূমি অনেকখানেই এই প্রচণ্ড ভার সহ্য করতে পারে না। দুকুল জুড়ে চলে ভাঙ্গা-গড়া। নদীর খাত বদলে যায়। এক কালের সমৃদ্ধ নগর পরিত্যক্ত হয়, নতুন নগর গড়ে ওঠে। এভাবে নদীপথের

www.pathagar.com

পরিবর্তনের জন্য কত জনবহুল জনপদ আর নগর যে ধুঁকেধুঁকে ক্ষয়ের দিকে এগিয়ে গেছে বাংলার ইতিহাস তার সাক্ষী। বেশী দিনের কথা বাদ দিয়েই বলা চলে, গত এক শ' বছরে বাংলার নদ-নদীর প্রবাহপথের যে পরিবর্তন হয়েছে তা সত্যই বিরাট।

তেলিগড়ি ও সিক্রিগলির সরু গিরিপথ বেয়ে রাজমহল পাহাড়ের কোলে ঘেঁষে গঙ্গা বাংলাদেশে প্রবেশ করেছে। বাংলার ইতিহাসে তেলি-গড়ি ও সিক্রিগলির এই সংকীর্ণ গিরিপথের স্থান খুবই গুরুত্বপূর্ণ। এ যেন বাংলার প্রাকৃতিক দুর্গদ্বার। এর কাছাকাছিই এক সময় গৌড়, লক্ষ্মণাবতী, পাণ্ডুয়া, রাজমহলের মত ইতিহাস প্রসিদ্ধ রাজধানীসমূহ গড়ে উঠেছিল।

গঙ্গার গতিপথ আজকাল রাজমহল পাহাড়ের ঢাল ঘেঁষে বিরাট বাঁক নিয়েছে। ষোড়শ শতাব্দীর আগে কিন্তু ঠিক তা ছিল না। গৌড় শহরকে ডাইনে রেখে আরও উত্তর-পূর্ব দিয়ে ছিল তার প্রবাহ পথ। ক্রমে সেখান থেকে গতিপথ দক্ষিণ-পশ্চিমে সরে এসে বর্তমান রূপ নিয়েছে, পিছনে ফেলে এসেছে কয়েকটি শুকনো খাত। এই শুকনো খাতগুলিই প্রাচীন গতিপথের সাক্ষী হয়ে আজও টিকে আছে।

প্রাচীন গৌড়ের প্রায় পঁচিশ মাইল দক্ষিণে গঙ্গার প্রবাহ দু-ভাগে ভাগ হয়েছে। দক্ষিণ-বাহিনী প্রবাহের নাম ভাগীরথী। সমুদ্রের কাছা-কাছি ভাগীরথীই হুগলী নামে অভিহিত। আজকাল গঙ্গার প্রধান ধারা অপর প্রবাহ পদ্মা দিয়ে প্রবাহিত। এক সময় কিন্তু তা ছিল না। ভাগী-রথীই ছিল গঙ্গার প্রধান প্রবাহ পথ। কবে, কোন্ সময় থেকে ভাগীরথী ক্রমে শীর্ণ হয়ে উঠেছে তা ঠিক করে বলার উপায় নেই। তবে ষোড়শ শতকের প্রথম দিকেই গঙ্গার প্রধান জলস্রোত যে পদ্মার খাতে বইতে শুরু করেছে তাতে সন্দেহ নেই।

গঙ্গার মত ভাগীরথীও বহুবার প্রবাহ পথ বদলেছে। যতদূর জানা যায়, প্রাচীনকালে ভাগীরথীর ধারা পূর্ণিয়ার দক্ষিণে রাজমহল পার হয়ে রাজমহল-মানভূম-ধলভূমের কোল ঘেঁষে সোজা দক্ষিণ বাহিনী হয়ে সমুদ্রে পড়ত। তখনো কিন্তু এই প্রবাহেই ছিল অজয়, মোর-এর মত নদীগুলির সঙ্গম। এ সব নদীর জল বুকে নিয়ে ত্রিবেণী (হুগলীর নিকটে) পর্যন্ত সোজা দক্ষিণে এসে পরে ভাগীরথী ত্রি-ধারায় ভাগ হয়ে গিয়েছিল।

www.pathagar.com

সপ্তগ্রামকে (সাত গাঁও) পাশে রেখে দক্ষিণ পশ্চিমবাহী প্রবাহ সরস্বতী সমুদ্রে পড়ত আধুনিক তমলুকের কাছাকাছি কোন জায়গায়। রূপ-নারায়ণ আর দামোদর তখন এই সরস্বতীর প্রবাহেই নিজেদের জলধারা উৎসারিত করে দিত। ভাগীরথীর প্রধান ধারা বুকে নিয়ে সরস্বতী তখন জম-জমাট নদী, তার সঙ্গমে জমজমাট ইতিহাস প্রসিদ্ধ তাম্রলিপ্তি বন্দর। যমুনা ছিল দক্ষিণ-পূর্ববাহী প্রবাহের নাম। আর দু'য়ের মাঝে ছিল ভাগীরথী।

অষ্টম শতকের আগে কোনো এক সময় গঙ্গা তার প্রাচীন প্রবাহপথ থেকে আরও পূবে সরে এসে রাজমহল থেকে গৌড় নগরীকে ডানদিকে বর্তমান কালিন্দী-মহানন্দার খাতে বইতে শুরু করে। অষ্টম শতকের পর সমুদ্রের কাছে সরস্বতীর মুখও বুঁজে যায়। জম-জমাট তাম্রলিপ্তি বন্দর পরিত্যক্ত হয়। সরস্বতীর ধারাপথ বদলে যায়। তাম্রলিপ্তির স্থান নেয় সপ্তগ্রাম (বর্তমান সাতগাঁও)। চতুর্দশ শতকে এই সপ্তগ্রাম ছিল দক্ষিণ-পশ্চিম বঙ্গের রাজধানী। ষোড়শ শতকে ভাগীরথীর প্রধান স্রোত হুগলীর সমীপবর্তী প্রবাহ দিয়ে বইতে শুরু করে। তখন সপ্তগ্রাম তার গুরুত্ব হারিয়ে ফেলে।

সরস্বতীর সঙ্গমে তাম্রলিপ্তি যখন জমজমাট তখন ভাগীরথী আধুনিক কলকাতা পর্যন্ত বর্তমান হুগলী নদীর প্রবাহ পথে প্রবাহিত হয়ে কালি-ঘাট, বারুইপুর, মগরার কোল ঘেঁষে আদি-গঙ্গার খাত বেয়ে সমুদ্রে পড়তো। বর্তমানে আদিগঙ্গার খাত পরিত্যক্ত। সরস্বতীর উত্তরার্ধ আজ মৃত। মধ্যযুগে নিম্নাংশে সরস্বতী যে পথে প্রবাহিত হতো, আজকাল সাঁকরাইলের পর ভাগীরথী সেই খাত বেয়ে সমুদ্রে পড়ে।

দশম-একাদশ শতকে গঙ্গার প্রাচীনতম উল্লেখ পাওয়া যায়। পদ্মা অবশ্য আরো প্রাচীন। অনেকের মতে খ্রীস্টীয় দ্বিতীয় শতকেই পদ্মার প্রবাহ পথের অস্তিত্ব ছিল। পদ্মা বহুবার গতিপথ বদলেছে। প্রাচীন পথ কি ছিল নির্দিষ্ট করে বলার উপায় নেই। বোধ হয় গোড়ায় পদ্মা রামপুর-বোয়ালিয়া হয়ে চলন বিলের ভিতর দিয়ে ঢাকাকে পাশে রেখে বুড়ীগঙ্গা-ধলেশ্বরীর খাত বেয়ে মেঘনার খাড়িতে মেঘনার সাথে মিশে সমুদ্রে পড়ত। বোধ হয় এই পথই ছিল পদ্মার প্রাচীনতম পথ। আর সে জন্যেই ঢাকার পাশে যে নদী তার নাম বুড়ীগঙ্গা। চতুর্দশ শতকে

www.pathagar.com

পদ্মার প্রবাহপথ চট্টগ্রাম পর্যন্ত বিস্তৃত ছিল—এখানেই ছিল ব্রহ্মপুত্রের সাথে পদ্মার সঙ্গমস্থল। অষ্টাদশ শতকে এই সঙ্গমস্থল আরও দক্ষিণে সরে এসেছে। তখন ফরিদপুর-বাখরগঞ্জ জেলার ভিতর দিয়ে চাঁদপুরের সোজা পঁচিশ মাইল দক্ষিণে দক্ষিণ-শা'বাজপুর দ্বীপের কাছাকাছি মেঘনার খাড়িতে এসে মিশত পদ্মা। সে সময় কালীগঙ্গা ছিল একটি ছোট নদী—পদ্মা থেকে বেরিয়ে মেঘনায় পড়ত। উনবিংশ শতাব্দীতে এই ছোট নদীটিই প্রধান হয়ে ওঠে। এখন এই খাতেই পদ্মার স্রোত বইতে শুরু করেছে। বর্তমানে ব্রহ্মপুত্র (যমুনা) গোয়ালন্দের কাছে পদ্মার সাথে মিশেছে। এই মিলিত প্রবাহ চাঁদপুরের কাছে মেঘনার সাথে একত্র হয়ে সমুদ্রে পড়েছে সন্দীপের কাছাকাছি।

ভাগীরথী-পদ্মা ছাড়াও আরও কয়েকটি নদীপথে গঙ্গার জল নিকাশ হয়। জলঙ্গী ও মাথাভাঙ্গা পদ্মা থেকে বেরিয়ে ভাগীরথীতে পড়েছে। ভৈরব-কুমার-মধুমতি-আড়িয়াল খাঁর প্রবাহপথেও পদ্মার জল সমুদ্রে উৎসারিত হয়। এদের মাঝে কুমারই সবচেয়ে প্রাচীন। মধ্যযুগে ভৈরব গুরুত্বপূর্ণ নদী ছিল। বর্তমানে মধুমতী ও আড়িয়াল খাঁই পদ্মার প্রধান শাখানদী।

আজকাল লোহিত বা ব্রহ্মপুত্রের প্রধান স্রোত যমুনা দিয়ে প্রবাহিত হয়। গোয়ালন্দের কাছাকাছি যমুনা পদ্মার সাথে একত্র হয়। আগে ব্রহ্মপুত্রের গতিপথ কিন্তু এ-রকম ছিল না। তখন গারো পাহাড়ের পশ্চিমে মোড় ঘুরে দেওয়ানগঞ্জের কাছাকাছি দক্ষিণ-পূর্বে প্রবাহিত হয়ে জামালপুর-ময়মনসিংদের ভিতর দিয়ে মধুপুর গড়ের পাশ ঘেঁষে ঢাকা জিলার পূর্বাঞ্চল অতিক্রম করে সোনারগাঁর দক্ষিণ-পশ্চিমে লাঙ্গলবন্ধ পার হয়ে ধলেশ্বরীতে নিজে উৎসারিত করে দিত ব্রহ্মপুত্র। ঢাকা জিলায় প্রবেশের পথে মূল নদী ব্রহ্মপুত্র শাখানদী লক্ষ্যাও মূল নদীর প্রায় সমান্তরালে প্রবাহিত হয়ে ধলেশ্বরীতে এসে মিশত। সপ্তদশ শতকে এই ছিল ব্রহ্মপুত্র-লক্ষ্যার গতিপথ। অষ্টাদশ শতকে এই পথ পরিত্যক্ত হয়। তখন ব্রহ্মপুত্র আরও পূব দিয়ে বইতে শুরু করেছে। সে সময় মেঘনা ব্রহ্মপুত্রের সঙ্গম ছিল ভৈরববাজারের কাছাকাছি। অষ্টাদশ শতকের শেষ ভাগ থেকেই নদী হিসেবে যমুনার গুরুত্ব বাড়তে থাকে। উনবিংশ শতাব্দীর মাঝা-

www.pathagar.com

মাঝি ব্রহ্মপুত্র আবার খাত বদলায়। পূর্বোক্ত পথ পরিত্যক্ত হয়। এ সময় থেকেই ব্রহ্মপুত্রের মূল স্রোতধারা যমুনা দিয়ে বইতে শুরু করেছে।

খাসিয়া-জৈন্তিয়া পাহাড়ে মেঘনার উৎপত্তি। উত্তরাংশে একই নদীর প্রাচীন নাম সুরমা। সুরমা শ্রীহট্ট জেলার ভিতর দিয়ে নেত্রকোণা-কিশোরগঞ্জ মহকুমার পূর্ব প্রান্ত স্পর্শ করে আজমীরগঞ্জকে বাঁয়ে রেখে ভৈরববাজারের কাছাকাছি এসে এক সময় ব্রহ্মপুত্রের সাথে মিশত। ভৈরববাজার থেকে সমুদ্র পর্যন্ত নদীর নাম মেঘনা।

তিস্তা বা ত্রি-স্রোতা উত্তরবঙ্গের গুরুত্বপূর্ণ নদী। হিমালয়ে তার জন্ম। বাংলাদেশে প্রবেশ করেছে দার্জিলিং-জলপাইগুড়ির ভিতর দিয়ে। জলপাইগুড়ি থেকে তিস্তা তিন ভাগে ভাগ হয়ে সোজা দক্ষিণে প্রবাহিত হয়েছে। দক্ষিণবাহী পূর্বতম প্রবাহের নাম করতোয়া, দক্ষিণবাহী পশ্চিমতম ধারার নাম পুণর্ভবা বা পুণর্ভবা। মধ্যবর্তী ধারার নাম আত্রাই। যে সময়ের কথা বলা হচ্ছে, তখন পুর্ণভবা মিশত মহানন্দার সাথে। আত্রাই চলন বিলের ভিতর দিয়ে প্রবাহিত হয়ে পরে করতোয়ার সাথে একত্র হতো। করতোয়া ও আত্রাইর মিলিত ধারা মিলত পদ্মার সাথে জাফরগঞ্জের কাছাকাছি।

আজ মৃতপ্রায় হলেও অতীতে করতোয়া ছিল প্রশস্ত বেগবতী নদী। গঙ্গার মতো এতোটা না হলেও প্রাচীনকালে এই অঞ্চলের মানুষের চোখে করতোয়া ছিল পুণ্যতোয়া। মহাভারতে বারবার করতোয়ার উল্লেখ আছে। প্রাচীন লোকের কাছে এই নদী যে কতটা ভক্তি-শ্রদ্ধার পাত্র ছিল 'করতোয়া মাহাত্ম্য' থেকে তা বোঝা যায়। আর শুধু তা সম্প্রদায় বিশেষের ধর্ম-কর্মের দৃষ্টিকোণ থেকে নয়—করতোয়া অন্যদিক থেকেও গুরুত্বপূর্ণ। ইতিহাস প্রসিদ্ধ পুণ্ড্রবর্ধন নগরের অবস্থান ছিল করতোয়ার তীরে। আজও করতোয়া মহাস্থান গড়ের কাছাকাছি দিয়ে প্রবাহিত।

অষ্টাদশ শতাব্দী পর্যন্ত তিস্তা ছিল গঙ্গা-পদ্মার শাখানদী। ১৭৮৭ খ্রীস্টাব্দের প্রলয়ংকরী বন্যার পর পুরানো খাত ছেড়ে দক্ষিণ-পূর্ববাহী হয়ে ব্রহ্মপুত্রে প্রবাহিত হতে শুরু করে। সেই থেকে তিস্তা ব্রহ্মপুত্রের শাখানদী।

উত্তরবঙ্গের আর একটি প্রাচীন নদী কোশী (কৌশিকী)। কোশীর খাত পরিবর্তন তিস্তার চেয়েও চমকপ্রদ। আজকাল কোশী বিহারের

www.pathagar.com

পূর্ণিয়া জেলার ভিতর দিয়ে রাজমহলের অনেক পশ্চিমে গঙ্গায় প্রবাহিত হয়। অথচ এক সময় সোজা পূর্ববাহী হয়ে কোশী ব্রহ্মপুত্রের সাথে মিশত। ক্রমেই নদীর খাত পশ্চিমে সরে গেছে। এ রকম পরিবর্তনের এক পর্যায়ে কোশী আর মহানন্দা একত্র হয়ে করতোয়ায় প্রবাহিত হত। সে সময় নদীর এই সীমাই ছিল দক্ষিণের 'সুসভ্য'দের ও উত্তরের কিরাত-কোচদের মাঝে সীমারেখা।

কোশীর খাত পরিবর্তনের ফলেই এক কালের সমৃদ্ধ গৌর অঞ্চল জলাভূমিতে পরিণত হয়েছিল। অস্বাস্থ্যকর জলাভূমি ও বার বার বন্যার ফলে পরিত্যক্ত হয়েছিল গৌড়-লক্ষণাবতী-পাণ্ডুয়া। আজও উত্তর বাংলায় অসংখ্য মরা নদীর সোঁতা দেখা যায়। তার অধিকাংশই নাকী কোশীর পরিত্যক্ত খাত।

ত্রিস্রোতা-কোশীর মত গঙ্গা-পদ্মা-লোহিত্য-করতোয়া প্রভৃতি বাংলার সবগুলো বড় বড় নদীই ঐতিহাসিককালের ভিতরে বার বার খাত বদলেছে। ফলে শুধু যে নদীর প্রবাহ পথেরই পরিবর্তন হয়েছে তা নয়, জনবহুল জনপদ জলাভূমিতে রূপান্তরিত হয়েছে, পরিত্যক্ত হয়েছে সমৃদ্ধ নগরী, অনেক ক্ষেত্রে কিছু পরিমাণে ভৌগোলিক পরিবেশেরও পরিবর্তন সাধিত হয়েছে। নদী অভিহিত হয়েছে কীর্তিনাশা নামে আবার যুগ যুগ ধরে এই পরিবর্তনই বাংলার বুকে ছড়িয়ে দিয়েছে উর্বর নরম পলিমাটির আস্তরণ। সেজন্যেই তো এত সব সত্ত্বেও নদী বাঙালীর এতো আদরের। আদর করে বাঙালী সেজন্যেই তো তাদের নাম রেখেছে ইচ্ছামতী, ময়ূরাক্ষী, কপোতাক্ষ, চূর্ণী, রূপনারায়ণ।

www.pathagar.com

দুই

কুলজীর সন্ধানে

"হেথায় আর্য হেথা অনার্য
হেথায় দ্রাবিড় চীন
শক হুন দল পাঠান মোগল
এক দেহে হল লীন।"

প্রস্তর যুগের সাক্ষ্য

পাক-ভারত উপমহাদেশে হিমযুগের পর থেকেই মানুষ বসবাসের সুনির্দিষ্ট খবর পাওয়া যায়। তারও আগে হয়তো এখানে মানুষ বাস করতো। শিবালিক পাহাড়ে নর-বানরের দাঁত আর চোয়ালের হাড় পাওয়া গেছে। ক্রমে এই নর-বানরই হয়তো বিবর্তিত হয়ে এই উপমহাদেশের বুকে মানুষ রূপে আবির্ভূত হয়েছিল। তবে এ-সম্পর্কে সুনির্দিষ্ট করে আজও কিছু বলার উপায় নেই।

কিন্তু প্রত্ন-প্রস্তর যুগ থেকে উপমহাদেশের প্রায় সর্বত্রই যে মানুষের বসবাস ছিল তার বহু ছড়ানো-ছিটানো প্রমাণ পাওয়া গেছে বহু জায়গায়। উপমহাদেশের বহু জায়গায় সে যুগের মানুষের ব্যবহৃত পাথরের হাতিয়ারসমূহ আবিষ্কৃত হয়েছে। বাংলাদেশও বাদ যায়নি।

বাংলাদেশে প্রত্ন-প্রস্তর যুগের যে ক'টি পাথুরে হাতিয়ার আবিষ্কৃত হয়েছে তার প্রায় সব ক'টিই পাওয়া গেছে পুরাভূমিতে—বাংলার দক্ষিণ-পূর্ব সীমান্তে ও পার্বত্য চট্টগ্রামে। অবশ্য অনেকে বলেন পার্বত্য চট্টগ্রামে আবিষ্কৃত অস্ত্র দেখতে প্রত্ন-প্রস্তরযুগের মতো হলেও আদতে তা আরও পরবর্তী যুগের।

বাংলাদেশের দক্ষিণ-পশ্চিম সীমান্তে দুটো প্রস্তরযুগের হাতিয়ার আবিষ্কৃত হয়েছে। এ ছাড়া বাংলাদেশে আর যে নিদর্শনটি পাওয়া গেছে তা সমতল ভূমিতে—হুগলী জেলার গোবিন্দপুর গ্রামের এগার মাইল

www.pathagar.com

দক্ষিণ-পশ্চিমে কুনকুনেতে। এখানে পাথরের তৈরী একটা কুঠার ফলক পাওয়া গেছে। একই ধরনের আর একটি কুঠার ফলক পাওয়া গেছে রাণীগঞ্জের কাছে পেনারোর কয়লার খনিতে।

দক্ষিদ-ভারতের মাদ্রাজে প্রত্ন-প্রস্তর যুগের যে সব হাতিয়ার পাওয়া গেছে তার সাথে বাংলাদেশের পাওয়া এই যুগের নিদর্শনগুলোর তুলনা করে পণ্ডিতেরা দু'য়ের মাঝে বিদ্যমান সাদৃশ্যের দিকে সবার দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন। শুধু আকারগত সাদৃশ্য নয়, দু'জায়গার অস্ত্রই এক জাতের পাথর দিয়ে তৈরী। এ জাতের পাথর বাংলাদেশে পাওয়া যায় না। যেখানে পওয়া যায় তা বাংলাদেশ থেকে বহু দূরে। এ থেকে অনেক অনুমান করেন যে, আদি-মানবগণ প্রত্ন-প্রস্তর যুগের এ সব হাতিয়ার দক্ষিণাপথ থেকে বয়ে নিয়ে এসেছিলেন বাংলাদেশে। বাঙালীর কুলজী খুঁজতে গিয়ে অতি প্রাচীন কালে দক্ষিণাপথের সাথে বাংলার যোগাযোগের এই ইংগিত খুবই গুরুত্বপূর্ণ।

প্রত্ন-প্রস্তর যুগের মানুষ পাথরের হাতিয়ার ব্যবহার করতে করতে অস্ত্র-নির্মাণ ও ব্যবহারে ক্রমে পারদর্শী হয়ে উঠেছিল। ক্রমে পুরানো হাতিয়ারও শুধু তীক্ষ্ন আর উন্নতই হয়নি, নতুন নতুন হাতিয়ারও আবিষ্কৃত হয়েছিল এ যুগে। ধনুকের সাহায্যে পাথরের গুটি বা পাথরের তীরের ব্যবহার আয়ত্ত হয়েছিল। পাথরের অপেক্ষাকৃত উন্নত ধরনের হাতিয়ারের এই যুগকে বলা হয় নব্য-প্রস্তর যুগ।

বাংলাদেশের যে অঞ্চলে প্রত্ন-প্রস্তর যুগের হাতিয়ারসমূহ আবিষ্কৃত হয়েছে সে এলাকায়ই পাওয়া গেছে নব্য-প্রস্তর যুগের হাতিয়ার। মানভূম জেলার বরাহভূম পরগণায় আবিষ্কৃত হয়েছে একটি কুঠারফলক। চট্টগ্রামের সীতাকুণ্ড পর্বতেও ভস্মীভূত কাঠের তৈরী একটি কৃপাণ আবিষ্কৃত হয়েছে। সিংভূম জেলার ধলভূম পরগণায় একটি কুঠারফলক পাওয়া গেছে এবং একটি মুষল পাওয়া গেছে আসামে।

নব্য-প্রস্তর যুগের আবিষ্কৃত হাতিয়ারসমূহের মাঝে অল্প ক'টির কথাই উল্লেখ করা হলো। প্রত্ন-প্রস্তর যুগ থেকেই উপমহাদেশের অন্যান্য অঞ্চলের মতোই বাংলাদেশেও যে মানুষের বসবাস শুরু হয়েছিল, এ থেকে তা বোঝা যায়।

www.pathagar.com

জনতত্ত্বের সাক্ষ্য

ঐতিহাসিক কালেরও বহু আগে, প্রত্ন-প্রস্তর যুগ থেকেই পাক-ভারত উপমহাদেশে নানা জনগোষ্ঠীর নানা জনস্রোত ঢেউয়ের মতো ভেঙ্গে পড়েছে বার বার। কত ধরনের মানুষ—আফ্রিকার মিশমিশে কালো নিগ্রো-প্রতিম মানুষের দল এসেছে সবার আগে, সবার শেষে একেবারে হাল আমলে ঔপনিবেশিক শাসক হিসাবে এসেছে আধুনিক ইউরোপীয়রা। এই দুই প্রান্তের মাঝে আরও এসেছে অনেকে। আধুনিক ইউরোপীয়রা ছাড়া আর সবাই উপমহাদেশের বুকে স্থায়ীভাবে বাসা বেঁধেছে। পূর্বতন জনগোষ্ঠীর সাথে নিজেদের রক্তধারা মিশিয়েছে। মেশামেশি হয়েছে বিভিন্ন জনগোষ্ঠীর বাঁচার ধরনের মাঝে। একের বিশিষ্টতার সাথে অপরের বৈশিষ্ট্য মিলেমিশে সৃষ্টি হয়েছে নতুন ধরন। আমাদের পূর্ব-পুরুষেরাও এ ভাবে নানা রক্তধারার সংমিশ্রণে, নানা বিশিষ্টতার সংশ্লেষণে গড়ে উঠেছেনে।

প্রাক-ঐতিহাসিক যুগে এই উপমহাদেশে প্রথম আসে খর্বকায় নিগ্রো-প্রতিম লোকেরা। আফ্রিকা থেকে আরব উপদ্বীপ হয়ে পারস্যের উপকূল বেয়ে তারা এই উপমহাদেশে প্রবেশ করে, ক্রমে ছড়িয়ে পড়ে সর্বত্র। পূর্ব আসামের নাগাদের মাঝে আজও সেই নিগ্রোপ্রতিম লোকদের রক্তধারার অস্তিত্ব বিদ্যমান। নিগ্রোপ্রতিম এই মানুষের দল বা নেগ্রিটোরা উপমহাদেশের মূল ভূখণ্ড থেকে আন্দামান দ্বীপপুঞ্জেও ছড়িয়ে পড়েছিল।

নেগ্রিটোদের পর আসে আদি অস্ট্রেলীয় বা অষ্ট্রিকরা। মধ্যমাকৃতির লম্বামাথা এই জনগোষ্ঠী আসে পশ্চিম ভূমধ্যসাগরীয় অঞ্চল থেকে, প্রত্ন-প্রস্তর যুগের জীবন রীতি, সংস্কৃতি নিয়ে। শুধু উপমহাদেশে নয়,—আরব-আফগানিস্তান থেকে শুরু করে দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার সুমাত্রা-জাভা-অস্ট্রেলিয়া-মেলানেশিয়ায় ছড়িয়ে পড়ে। মধ্যমাকৃতির লম্বামাথা এই জনগোষ্ঠীর বহু চিহ্ন আজও এ সব দেশের লোকের চেহারার মাঝে ছড়িয়ে আছে। বিভিন্ন দেশে ছড়িয়ে পড়ায় এদের চেহারার আদলে যেমন কিছু কিছু বিভিন্নতা দেখা দেয়, তেমনি বিভিন্নতা দেখা দেয় ভাষায়। এই বিভিন্ন জাতীয় ভাষা মিলে যে গোষ্ঠী তারই নাম অষ্ট্রিক ভাষাগোষ্ঠী। 'অষ্ট্রিক' কোন জন-গোষ্ঠীর নাম নয়, আর্য বা দ্রাবিড়ের মত ভাষাগোষ্ঠীর নাম।

www.pathagar.com

উপমহাদেশে কোল-মুণ্ডা ও নিকোবর দ্বীপে কথিত ভাষা অষ্ট্রিক-গোষ্ঠীর অন্তর্গত। এই উপমহাদেশেই এই জাতীয় লোকেরা প্রথম হাতী পোষ-মানাতে শেখে।

অষ্ট্রিকদের পর আসে দ্রাবিড়ভাষী লোকেরা। এরাও ভূমধ্যসাগরীয় অঞ্চল থেকেই উপমহাদেশে প্রবেশ করে। জনতত্ত্বের বিচারে এরা ও অষ্ট্রি-করা একই গোষ্ঠীর অন্তর্ভুক্ত। প্রাচীন তামিল ভাষা প্রায় দেড় থেকে দু'হাজার বছর পুরানো। দ্রাবিড়ভাষীরা উপমহাদেশে আসে তারও প্রায় দুই কি তিন হাজার বছর আগে।

উপমহাদেশের আরও একটি জনধারা প্রবাহিত হয়েছিল যাদের আগমন কাল, ভাষা ইত্যাদি সম্পর্কে আজও সঠিকভাবে অনুমান করা সম্ভব হয়নি। এরাও আর্যভাষী বা দ্রাবিড়ভাষীদের মত পশ্চিম দিক থেকেই উপমহাদেশে প্রবেশ করে। নৃতাত্ত্বিক ভাষায় এদের নাম হলো Western Brachy cephals বা পশ্চিমী চওড়া বা গোলমাথা জনধারা।

প্রাক-ঐতিহাসিক কালে আর্য-ভাষী নর্ডিক ও মঙ্গোলরা আসে পরে। অনুমান করা হয় দীর্ঘমুণ্ড নর্ডিকরা যখন আর্যভাষী হয়ে ওঠেনি তখন তাদের আদি বাসস্থান ছিল বর্তমান রাশিয়ার অন্তর্গত উরাল পর্বত মালার দক্ষিণে ইউরোপীয় মালভূমিতে। এই নর্ডিকরা ছিল পশুপালক। এখানেই তারা ঘোড়াকে পোষ মানায়। খ্রীস্ট-জন্মের প্রায় তিন হাজার বছর আগে নিজেদের পুরানো আবাসভূমি ছেড়ে এরা দক্ষিণে চলতে শুরু করে। মেসোপোটেমিয়ায় আসে খ্রীস্ট-পূর্ব তিন হাজার সালের কাছা-কাছি সময়। এখানে তারা গরুকে পোষ মানায়। ভূমধ্যসাগরীয় এলাকা থেকে তারা সংগ্রহ করে ছাগল। মেসোপোটেমিয়ার প্রাচীন ইতিহাস থেকে দেখা যায় এ সময় আর্যদের বিভিন্ন শাখা এখানে অনেকগুলি বসতি স্থাপন করেছিল। মেসোপোটেমিয়ার আর্যবসতি স্থাপনের সম-সাময়িক কালেই ইরানেও আর্যবসতি স্থাপন হয়। নিজেদের প্রচণ্ড সংঘ শক্তি, রীতি-নীতি, বিশ্বাস প্রভৃতি নিয়ে আর্য-ভাষী নর্ডিকদের একটা শাখা পাক-ভারত উপমহাদেশে আসে খ্রীস্ট-জন্মের প্রায় দেড় হাজার বছর আগে।

কিছুটা অপ্রাসংগিক হলেও আর্যভাষী নর্ডিকদের এই পরিক্রমার একটা প্রমাণ এখানে উল্লেখ করা যেতে পারে। নর্ডিকদের একটা শাখা মিতান্নিরা বর্তমান এশিয়া মাইনরের একাংশে বসতি স্থাপন করেছিল।

www.pathagar.com

সেখানে যোগাকোই নামক স্থানে কীলকাক্ষরে লিখিত মিতান্নি রাজদের কতকগুলি মাটির সন্ধিপত্র আবিষ্কৃত হয়েছে। তাতে দেখা যায় মিতান্নি রাজরা মিত্র, বরুণ, অরুণ, ইন্দ্র ও নাসত্যদ্বয়ের অর্থাৎ অশ্বিনী কুমার-দ্বয়ের নাম দিয়ে সন্ধিপত্র শুরু করেছেন। উপমহাদেশের প্রাচীন বৈদিক দেবতাদের সাথে মিল কতই না সুস্পষ্ট।

প্রাক-ঐতিহাসিক কালে যে সব জনধারা উপমহাদেশের মাটিতে এসে পড়েছে তাদের মাঝে মঙ্গোলরাই বোধ হয় সর্বশেষ। মঙ্গোলরা সব এক-সাথে আসেনি। বিভিন্ন শাখার মঙ্গোলরা এসেছে বিভিন্ন সময়, বারে বারে। প্রথম বেদ সংকলনের সময় আনুমানিক খ্রীস্ট জন্মের হাজার বছর আগে। উপমহাদেশের উত্তরে ও উত্তর-পূর্বের পার্বত্য অঞ্চলে এ সময়েই যে মঙ্গোলপ্রতিম জাতির বসবাস ছিল প্রাচীন বৈদিক সাহিত্যে তার প্রমাণ বিদ্যমান। মহাভারতে এই প্রমাণ তো ভুরি ভুরি।

আর্যভাষী নর্ডিকরা ও মঙ্গোলরাই প্রাক-ঐতিহাসিক কালে সর্বশেষ জনধারা। ঐতিহাসিক কালেও একইভাবে বিভিন্ন জনধারার আগমন বন্ধ হয়নি কখনো। উপমহাদেশের ইতিহাসে এ-যেন একটানা, এক প্রবাহ। একের পর এক জনস্রোত ভেঙ্গে পড়েছে, রক্তে রক্তে মেশামেশি অব্যাহত রয়েছে সব সময়।

ঐতিহাসিক কালে যারা এসেছে তাদের তালিকা জনস্রোতের রীতিমতো একমিছিল। এসেছে আসিরীয় ও এলামাইট আক্রমণকারীরা, পারসিকরা, মেসিডোনীয় ও গ্রীকরা, সিরীয় ও ফিনিশীয়রা, শক ও কুশানরা, পরবর্তী কালের পারসিকরা, হুন ও প্রাক-ইসলামিক তুর্কীরা, পরবর্তী কালের আরবীয়, কুর্কী, ইরানী আফগান ও মোগলরা এবং একেবারে হাল আমলের আধুনিক ইউরোপীয়রা। এ ভাবেই জনধারার আগমন অব্যাহত রয়েছে।

ঐতিহাসিক কালে যে সব জনধারার আগমনের কথা এখানে উল্লেখ করা হলো তাদের সবাই এই উপমহাদেশের রক্তধারায় সমানভাবে প্রভাব রেখে যেতে পারেনি। প্রাক-ঐতিহাসিক কালে জনগোষ্ঠীর যে সব স্রোত এখানে এসে ধাক্কা মেরেছিল ঐতিহাসিক কালের প্রারম্ভেই, মোটা-মুটি তাদের সংমিশ্রণেই তৈরী হয়ে গিয়েছিল উপমহাদেশের মানুষের রক্তধারা, চেহারার আদল। পরবর্তীকালে এই চেহারার আর রক্তধারার

www.pathagar.com

সাথে অন্য জনগোষ্ঠীর মেশামেশি সত্ত্বেও অধিকাংশ ক্ষেত্রেই তার ছাপ পড়েছে খুবই কম।

আবার এই উপমহাদেশের সব জায়গার অবস্থাও তো ঠিক এক রকম নয়। সব জায়গায় একই মাত্রায় সব রক্তের মেশামেশি হয়নি। ফলে উপ-মহাদেশেও দেশভেদে নানা জায়গায় চেহারার নানা ধাঁচ দাঁড়িয়ে গেছে। মনের গড়ন, ভাষা আর চেহারায় ছাপ পড়েছে সেই সব জনগোষ্ঠীর, যাদের সংমিশ্রণে তৈরী হয়েছে সেই এলাকার মানুষের রক্ত, তাদের চেহারা।

ভেড্ডিড ও দ্রাবিড়

বেদে নিষাদের বর্ণনা আছে। মিশমিশে কালো রঙ, বেঁটে ধরনের গড়ন, ধ্যাবড়া নাক—মানুষ। পণ্ডিতেরা মনে করেন এই নিষাদরাই ছিল বাংলাদেশের আদিবাসী।

একটু আগে বিভিন্ন জনধারার কথা বলতে গিয়ে আদি-অষ্ট্রলীয় বা অষ্ট্রিকদের কথা বলা হয়েছে। লম্বা আর নীচু মাথাওয়ালা এই জাতের মানুষদেরই আর্যরা বলতো নিষাদ। বাঙালীর প্রায় সর্বস্তরে এদের রক্ত ছড়িয়ে আছে প্রচুর পরিমাণে। মহেনজোদাড়োর ধ্বংস্তূপের মাঝেও এ জাতীয় নরমুণ্ড পাওয়া গেছে।

নৃতাত্ত্বিক পরিভাষায় বাঙালীর এই পূর্ব-পুরুষদের নাম হ'ল Dravido-Munda Longheads বা দ্রাবিড়মুণ্ডা দীর্ঘমুণ্ড জনধারা। সিংহলের ভেড্ডাদের সাথে চেহারার সাদৃশ্যের জন্য এদের ভেড্ডিডও বলা হয়ে থাকে। ভাষায় এরা ছিল অষ্ট্রিকভাষী। সেজন্য এদের আর এক নাম অষ্ট্রিক। এই অষ্ট্রিক বা ভেড্ডিডরা শুধু যে বাংলার অধিবাসী বা আমা-দের পূর্ব-পুরুষ তাই নয়, আমাদের ভাষা, সংস্কৃতি, মানসিক গড়ন সব কিছুতেই এদের প্রভাব খুবই গভীর।

দ্রাবিড় উপাদান

বাঙালীর রক্তে আর একটি উপাদান হ'ল দ্রাবিড়ভাষীদের। জনতত্ত্বের বিচারে দ্রাবিড় ও অষ্ট্রিক-ভাষীরা একই জনগোষ্ঠীর অন্তর্ভুক্ত। দু'য়ের পূর্ব-পুরুষরাই এসেছিল ভূমধ্যসাগরীয় অঞ্চল থেকে, তবে একসাথে নয়।

www.pathagar.com

দ্রাবিড়-ভাষীরা এসেছিল আরও পরে। হয়তো বা তারা ছিল একই জনগোষ্ঠীর আর একটি শাখা। বাংলাদেশে এসে তারাও বাসা বেঁধেছিল। আমাদের ভাষা, আচার-আচরণে তার প্রমাণ আজও টিকে আছে।

মঙ্গোলীয় জনধারা

বাঙলাদেশের লোকজনের মাঝে মঙ্গোলীয় জনগোষ্ঠীর প্রভাবও বেশ স্পষ্টভাবেই চোখে পড়ে। বেশী করে চোখে পড়ে বাঙলার উত্তর-পূর্ব ও দক্ষিণ-পূর্বাঞ্চলে। পার্বত্য চট্টগ্রামের মগ ; চাকমা প্রভৃতিদের কথা বাদ দিলেও উত্তর ও পূর্ব সীমান্ত অঞ্চলে তথাকথিত নিম্নবর্ণ হিন্দু ও মুসলমানদের মাঝে এই প্রভাব বেশ স্পষ্ট। উত্তর বাঙলার কোচ আর রাজবংশীদের চেহারা তো প্রায় খাঁটি মঙ্গোলীয় ধরনের। সাদা চোখেই তা বোঝা যায়।

চেপ্টা নাক, গালের উঁচু হাড়, গোঁফ-দাড়ি অপেক্ষাকৃত কম, গোল বা মাঝারি মাথা, চোখের কোণে ভাঁজ—সাধারণভাবে এগুলিই হলো মঙ্গোলীয় চেহারার বৈশিষ্ট্য।

মঙ্গোলীয়দের এই বৈশিষ্ট্যের কিছু কিছু বাঙলার প্রায় সর্বত্রই চোখে পড়ে। বিভিন্ন এলাকায় বিভিন্ন মাত্রায় রক্তের সংমিশ্রণের জন্যই এই তারতম্য। উত্তর বাঙলায় যাদের কথা বলা হলো তাদের মাঝে মঙ্গোলীয় রক্তের সাথে মিশ্রণের ভাগ অপেক্ষাকৃত কম। মগ-চাকমাদের মাঝে তা প্রায় নির্ভেজাল।

বাঙালীর চেহারায় বিশেষতঃ উত্তর বাঙলায় মঙ্গোল জনগোষ্ঠীর যে শাখার ছাপ সবচেয়ে বেশী তার নাম হলো প্যারোইয়ান। মঙ্গোলরা বাঙলাদেশে সব এক সাথে আসেনি। বিভিন্ন শাখা বিভিন্ন সময় এসেছে। মগ-চাকমা ইত্যাদি উপজাতির মাঝে ব্রহ্মদেশীয় উপাদান বেশী স্পষ্ট।

অ্যালপীয় উপাদান

বাঙলাদেশে আর এক ধরনের চেহারা দেখা যায়। বিশেষতঃ তথাকথিত উচ্চকোটি বা উচ্চবর্ণের মাঝে এই ধাঁচের প্রাচুর্য চোখে পড়ে।

যাদের কথা বলা হচ্ছে নৃতাত্ত্বিক ভাষায় এদের নাম Alpine Short-heads বা অ্যালপীয় গোলমুণ্ড জনধারা। এদের কথা এর আগে কিছুটা বলা

www.pathagar.com

হয়েছে। বৈদিক আর্যদের আগে এরা উপমহাদেশে প্রবেশ করেছিল তা ঠিক, তবে ঠিক কবে, কোথা থেকে এরা এসেছিল বা এদের ভাষা কি ছিল তা আজও নির্দিষ্টভাবে জানা যায়নি, অজানা রয়ে গেছে। তাই বলে এদের অস্তিত্ব নিয়ে কোন প্রশ্ন নেই। কারণ, আমাদের এই অচেনা পূর্বপুরুষরা তাদের শক্ত ও সমর্থ চেহারা আর গোল-মাথা, সরল নাক আর গোঁফ-দাড়ির প্রাচুর্যের বৈশিষ্ট্যটুকু আমাদের চেহারায় চিরস্থায়ীভাবে এঁকে দিয়ে নিজেদের অস্তিত্বের প্রমাণ রেখে গেছে। শুধু বাঙলাদেশে নয়,—চেহারায় অ্যালপীয় উপাদান সিন্ধু-দেশে, গুজরাটে, মধ্য-ভারতে, কর্ণাটকে ও অন্ধ্রেও চোখে পড়ে। পাক-ভারত উপমহাদেশের বাইরেও বহু দেশে একই ধাঁচের চেহারা দেখা যায়।

আর্যভাষী নর্ডিক জনধারা

বলিষ্ঠ চেহারা, লম্বা মাথা, লম্বা সরু নাক, কটা চোখ, গৌরবর্ণ এই জনধারার প্রভাব বাঙালীর চেহারায় খুবই কম। উপমহাদেশের পাঞ্জাব, কাশ্মীর, রাজপুতনা ও উত্তরাপথের উচ্চবর্ণের মাঝে এদের প্রভাব অনেক বেশী পরিস্ফুট।

বাঙলাদেশে আর্যরা এসেছে বহু পরে। আর্যভাষীদের রীতিমতো বসবাস শুরু হয়েছে বলতে গেলে উত্তর-বাঙলায় মৌর্যাধিকার প্রতিষ্ঠিত হবার পর। সে তো বড় জোর খ্রীস্ট জন্মের চারশ' বছর আগের কথা। হয়তো তার আগেই ছোট ছোট দলে এখানে-ওখানে অল্পবিস্তর আর্য বসবাস শুরু হয়েছে—তার কিছু কিছু প্রমাণও আছে মহাভারতে, বিভিন্ন ধর্মশাস্ত্রে। তবু সে ছিল নেহাতই কম। তার বহু আগে থেকে শুরু হয়েছে কোল-ভাষী ও দ্রাবিড়-ভাষী দ্রাবিড়-মুণ্ডা দীর্ঘমুণ্ড জনগোষ্ঠী, গোলমাথা অ্যালপাইন শর্ট-হেডস্ ও ভোট-চীনভাষী মঙ্গোলীয়দের বসবাস। আর্য আগমনের সময় এরা সবাই মিলেমিশে একটি বিশিষ্ট জনধারায় পরিবর্তন না হলেও এত পরে এসে আর্যরা এ-দেশের মানুষের রক্তে তেমনভাবে ছাপ ফেলতে পারেনি। তাছাড়া বাঙলাদেশে আর্যরা আসে মগধ, বিদেহ থেকে। সপ্ত-সিন্ধুর পার থেকে সমতল ভূমি বেয়ে আর্যরা ক্রমে যখন পূবে ছড়িয়ে পড়তে থাকে তখন স্থানীয় লোকজনের রক্তের সাথে মেশামেশি শুরু হয়ে গেছে। কাজেই তারা যখন একেবারে পূর্বতম

www.pathagar.com

প্রান্তে এসে পেঁছিল, তখন খাঁটি আর্য রক্তে মিশ্রণ হয়ে গেছে অনেক। আর এজন্যই অন্যান্য উপাদানের তুলনায় বাঙালীর রক্তে আর্যভাষী নর্ডিক উপাদান খুবই কম।

বস্তুতঃপক্ষে বাঙালী জীবনে নৃতাত্ত্বিক প্রভাবের তুলনায় আর্যদের সাংস্কৃতিক প্রভাবই প্রবলতর। ভাষা, মানসিক গড়ন প্রভৃতিতে সে প্রভাব অনেক বেশী অভিব্যক্ত।

অন্যান্য উপাদান

ঐতিহাসিক কালে আরও যে-সব জনধারা বাঙালীর রক্তে রক্ত মিশিয়েছে, চেহারায় ছাপ ফেলতে চেষ্টা করেছে তাদের কথা বলতে যাবার আগে নেগ্রিটো বা নিগ্রোপ্রতিম জনধারা সম্পর্কে দু-একটা কথা বলে নেয়া দরকার।

পাক-ভারত উপমহাদেশে যে-সব জনধারা একের পর এক এসেছে তাদের মাঝে এই নিগ্রোপ্রতিম জনগোষ্ঠী এসেছিল সবার আগে। তারা গোটা দেশজুড়ে ছড়িয়ে পড়েছিল। হয়তো বা বাঙলাদেশেও তারা বসতি স্থাপন করেছিল। কিন্তু আজ কি বাঙালীর চেহারায়, কি রক্তে তার কোন চিহ্নই প্রায় নেই। বাঙালী জাতিতে এই উপাদান খুব সম্ভব অনুপস্থিত। তবে বাঙলার পশ্চিমে ও পূর্বে মাল-পাহাড়ী ও নাগাদের মাঝে এই উপাদান অল্প-বিস্তর দেখা যায়।

অন্যান্য উপাদানের কথা বলতে গেলে প্রথমে শকদের কথা বলতে হয়। বোধহয় আর্যভাষী নর্ডিকদের পর পরই উপমহাদেশে পারস্য-তুর্কিস্তান এলাকা থেকে শকদের অভিযান শুরু হয়। এরা গোটা উপমহাদেশব্যাপী বিশেষতঃ দক্ষিণ ও পূর্বাঞ্চলে ছড়িয়ে পড়ে। অনেকে মনে করেন বাঙালীর গোলমাথার পিছনে আছে এই শকদের চওড়া গোলমাথা, হালকা হলদে চোখ, লম্বা নাকওয়ালা চেহারার উপাদান।

তবে আজও এ সম্পর্কে একেবারে সুনির্দিষ্ট করে কোন কিছু বলে দেওয়া সম্ভব নয়। কোন্ উপাদান ঠিক কতখানি পরিমাণে বিদ্যমান, কোন্ কোন্ জনগোষ্ঠী বাঙালীর রক্তধারায় রক্ত মিশিয়েছে সে সম্পর্কেও শেষ কথা বলে দেবার সময় আজও আসেনি। বাঙলার সম্পর্ক তো শুধু পাক-ভারত উপমহাদেশের বিভিন্ন জনগোষ্ঠীর সাথেই নয়, সম্পর্ক তার

www.pathagar.com

সেই প্রাচীন চম্পা (বর্তমান ইন্দোচীন) থেকে শুরু করে দক্ষিণ-পূর্বাঞ্চলের দ্বীপপুঞ্জ ও ব্রহ্মদেশ পর্যন্ত। আর এ সম্পর্ক দূরের নয়—নিকটের। কম হলেও এদের মাঝেও কেউ কেউ নানা সূত্রে রক্ত মিশিয়েছে বাঙলার বিভিন্ন জনগোষ্ঠীর সাথে।

বাঙলার জনতাত্ত্বিক ইতিহাসে এ-যেন এক বৈশিষ্ট্য। প্রাগৈতিহাসিক কালে বাঙলার মাটিতে বিভিন্ন জনগোষ্ঠীর পরস্পরের মাঝে রক্ত মিশ্রণের যে ধারার সূচনা হয়েছিল ঐতিহাসিক কালেও তা সমানভাবেই অব্যাহত রইলো। আর এভাবেই বাঙালীর সাথে রক্তের সম্পর্ক স্থাপিত হলো তিন মহাদেশ জোড়া বিভিন্ন জনগোষ্ঠীর।

ঐতিহাসিক কালে এই মেশামেশি হয়েছে নানাভাবে। উপমহাদেশের বিভিন্ন অঞ্চল থেকে বিভিন্ন জনগোষ্ঠীর রাজা-মহারাজারা লোক-লস্কর, সৈন্য-সামন্ত নিয়ে বাঙলার বুকে হানা দিয়েছে। লোক-লস্কর, সৈন্য-সামন্ত-দের অনেকে যুদ্ধাবসানের পরও থেকে গেছে বাঙলাদেশে। ক্রমে স্থায়ী বাসিন্দা হয়ে নতুন রক্ত উৎসারিত করে দিয়েছে বাঙালী রক্তে। তবে এদের নৃতাত্ত্বিক প্রভাব এত কম যে, বাঙালীর রক্তে বা চেহারায় নতুন কোন উপাদান বা ছাপ এরা রেখে যেতে পারেনি। তাই ইতিহাসের পৃষ্ঠায় হূন বা মালব রাজারা যত পরাক্রান্ত যোদ্ধাই হন না কেন বাঙালীর নৃতত্ত্বের বিচারে এরা মূল্যহীন। আর শুধু হূন বা মালব-রাজরাই নয়, বিভিন্ন সময় এদের মত আরও যারা এসেছে তারা কেউই নতুন কোন ধারা সঞ্চারিত করতে পারেনি—বাঙলার বিরাট জনসমুদ্রে তলিয়ে গেছে।

তুর্কী বিজয়ের আগে কয়েকটি রাজবংশ অন্য দেশ থেকে এসে বাঙলা-দেশে স্থায়ীভাবে বাসা বেঁধেছিল। এদের মাঝে কর্ণাটবাসী সেন-রাজবংশই প্রধান। সেন রাজারা প্রায় দু'শ বছর দেশ শাসন করেছে। বাঙলার সমাজ-ব্যবস্থার উপর গভীর ছাপ রেখে গেছে তারা। সে ছাপ এত গভীর যে, আজও বাঙালী সমাজের একাংশ তার ঊর্ধ্বে উঠতে পারেনি। তবু এই সেন রাজারাও বাঙলার জনধারায় কোন নতুন ধারা সঞ্চারিত করতে পারেনি। কারণ, কর্ণাট দেশের উচ্চবর্ণের লোকেরাও গোলমুণ্ড অ্যালপাইন গোষ্ঠী-ভুক্ত। বাঙালীর রক্তে এই জনগোষ্ঠীর ধারার উপস্থিতির কথা তো আমরা আগেই লক্ষ্য করেছি।

www.pathagar.com

তুর্কী বিজয়ের পর বাঙালীর রক্তে ও চেহারায় যে নতুন উপাদান সঞ্চারিত হলো তাও নেহায়েতই নগণ্য। এদেশে যারা বাস করতো, প্রাগৈতিহাসিক কাল থেকে যাদের পূর্ব-পুরুষরা এদেশে বাস করে আসছে তারাই কালক্রমে ইসলাম ধর্ম অবলম্বন করেছেন। আরবী মুসলমান পরিবার বাঙলাদেশে খুবই কম। একেবারে যে আসেনি তা নয়। কিছু কিছু পরিবার বাণিজ্য করতে এসে সমুদ্র উপকূলে চট্টগ্রাম-নোয়াখালী অঞ্চলে স্থায়ীভাবে থেকে গেছে। তাই এ সব দিকে কখনো কখনো দু'একটি আরবী চেহারা চোখে পড়ে। তবে বাঙলার জনসংখ্যার তুলনায় এদের সংখ্যা নেহায়েতই অকিঞ্চিৎকর।

পাঁচ ছ'জন হাবসী সুলতান বেশ অনেক কাল জুড়ে বাঙলাদেশে রাজত্ব করেছে। দীর্ঘ দিন এদেশে থাকায় ক্রমে তারাও বাঙালী হয়ে গিয়েছিল। তবু তারা যে রক্তধারা সেদিন সঞ্চারিত করেছিল তার ফলেই উচ্চ-বর্ণের-হিন্দু-মুসলমানের মাঝে আজও দু'একটি খাঁটি হাবসী চেহারা চোখে পড়ে। সেই ঘন কোঁকড়া চুল আর পুরু ওল্টানো ঠোঁট—সাদা চোখেই হাবসী বলে চিহ্নিত করা যায়।

জলদস্যু মগরাও এক সময় বাঙালীর রক্তের সাথে রক্ত মিশিয়েছে। তবে এদের ধারার প্রভাব বাঙলার জনসমষ্টিতে খুবই কম।

শংকর জাত বাঙালী

প্রত্যেক জাতির মধ্যেই বাঙালী-চেহারারও নিজস্বতা আছে—বৈশিষ্ট্য আছে। অন্য দশটা দেশের লোকের ভিতর থেকে চিনে নিতে অসুবিধে হয় না। এক নজর দেখে নিয়েই বলে দেয়া যায়। ব্যতিক্রম যে নেই তা নয়, তবে সাধারণভাবে যাকে বলে মাঝারি গোছের চেহারা অর্থাৎ মাথার গড়ন লম্বাও নয় গোলও নয়, নাক অতিরিক্ত লম্বা বা একেবারে চ্যাপ্টার মাঝামাঝি, উচ্চতায়ও মাঝারি, এক কথায় সবই মাঝারি ধরনের—এই হল খাঁটি বাঙালী আকৃতি, বাঙালী চেহারার বৈশিষ্ট্য।

যে সব উপাদান মিলে এই বৈশিষ্ট্য তাদের মাঝে পশ্চিম ভূমধ্যসাগরীয় অঞ্চল থেকে আগত দ্রাবিড়-মুণ্ডা দীর্ঘমুণ্ড উপাদান বা ভেডিডড উপাদানই প্রধান। গোড়ায় গোটা দেশ জুড়ে এরাই ছড়িয়ে ছিল। পরে

www.pathagar.com

নানা অবস্থায় এরই সাথে মিশেছে কম-বেশী পরিমাণে একই জনগোষ্ঠীর দ্রাবিড়ভাষী ধারা, অ্যালপীয় উপাদান, আর্যভাষী নর্ডিক ও গোলমাথা ওয়ালা মঙ্গোলীয় রক্তস্রোত। অঞ্চল ভেদে এই মিশ্রণের মাত্রায় কিছু পরিমাণে তারতম্য ঘটেছে ঠিকই—যেমন পশ্চিমাঞ্চলে দ্রাবিড় ভাষীদের মিশ্রণ ঘটেছে বেশী, পূর্বাঞ্চলে মঙ্গোলীয়দের। তবে বাঙালীর জনপ্রকৃতি গঠনের ক্ষেত্রে এই তারতম্যের ভূমিকা খুবই নগণ্য। ভেডিডড উপাদানের সাথে দ্রাবিড় অ্যালপীয় নর্ডিক ও মঙ্গোলীয় উপাদান মিলেমিশে কালক্রমে গোটা দেশ জুড়েই একই ধরন দাঁড়িয়ে গেছে, সৃষ্টি হয়েছে বাঙালী চেহারার বৈশিষ্ট্য, জন্ম নিয়েছে নতুন উপাদান-বাঙালী।

বাঙালী হিন্দু-সমাজ নানা বর্ণে বিভক্ত। একই বর্ণের ভিতর নানা গোত্র—মূল ভাগের ভিতর নানা উপবিভাগ। বর্ণ বা গোত্রসমূহ সৃষ্টির পিছনে কি যে কারণ এ নিয়ে নানাজনের নানা মত। অনেকে মনে করেন গোত্র আর সমাজের নীচের দিকে বিশেষতঃ অন্ত্যজদের সাথে নানা জাতের সৃষ্টির পিছনে মুখ লুকিয়ে আছে প্রাচীন কৌম সমাজের ছাপ। অনেকে এই মত অস্বীকার করেন। তার কারণ যাই হোক না কেন বর্ণভেদ প্রথা যে হিন্দু-সমাজ পারস্পরিক অবাধ মেলামেশার পথে দুর্লঙ্ঘ্য বাধা তাতে সন্দেহ নেই। সামাজিক ও ধর্মীয় পবিত্রতার শিরোপা মাথায় নিয়ে এই বাধা যুগ যুগ জুড়ে স্বীকৃতি পেয়ে আসছে। ফলে সমাজের সব কটা স্তর মিলে কখনোই পুরোপুরি একটা কেমিক্যাল কম্বিনেশান হয়ে উঠতে পারেনি। অনেক পরিমাণে মেকানিক্যাল মিক্সচার রয়ে গেছে। আর এজন্যই বর্ণভেদে জনপ্রকৃতি গঠনের উপাদানসমূহের মিশ্রণের মাত্রায়ও তারতম্য রয়ে গেছে কিছু কিছু।

তবু যদি এই বর্ণ বিভক্ত বাঙালী হিন্দু-সমাজের অবয়ব বিশ্লেষণ করা যায় তাহলেও দেখা যাবে—বাঙালীর জন-প্রকৃতির যে মূল বৈশিষ্ট্যের কথা একটু আগে বলা হলো তা এখানেও শুধু উপস্থিত তাই নয়, অতিমাত্রায় উপস্থিত। মেকানিক্যাল মিক্সচার হওয়া সত্ত্বেও কোন স্তরই তার হেরফের হয়নি খুব।

বিশিষ্ট সংখ্যাতত্ত্ববিদ অধ্যাপক প্রশান্ত মহলানবিশ বাঙালী হিন্দু-সমাজের সাতটি জাতের (ব্রাহ্মণ, কায়স্থ, সদগোপ, কৈবর্ত, রাজবংশী, পোদ ও বাগদী) জনতাত্ত্বিক গঠন ইত্যাদি বিশ্লেষণ করে দেখিয়েছেন :

www.pathagar.com

(১) বাংলার বাইরের ব্রাহ্মণদের সাথে বাঙালী ব্রাহ্মণদের যত না মিল তার চেয়ে তাদের অনেক বেশী মিল বাঙালী-সমাজের অন্যান্য জাতির সাথে। বস্তুতঃপক্ষে বাঙালী ব্রাহ্মণ আর নমঃশূদ্রের মাঝে নৃতাত্ত্বিক কোন পার্থক্য প্রায় নেই বললেই চলে। (২) কায়স্থ, সদ্‌গোপ ও কৈবর্তরা হলো বাংলাদেশের বিশিষ্ট ভূমিজ জাত (Typical indigenous eastes of Bengal) তথাকথিত নীচু জাত হওয়া সত্ত্বেও রক্তে রক্তে মেশামেশি কায়স্থ সদ্‌গোপ বা অন্যান্য জাতের মতোই কৈবর্তদের মাঝেও সমভাবে বিদ্যমান। (৩) বাঙালী হিন্দুদের মাঝে একমাত্র ব্রাহ্মণদের সাথেই বাঙলার বাইরের উচ্চবর্ণের কিছুটা সাদৃশ্য আছে। কিন্তু সে সাদৃশ্যও খুব বেশী দূর ব্যাপ্ত নয়।

আর একজন পণ্ডিত মিঃ এইচ. সি. চাকলাদার কলকাতার বেশ কিছু সংখ্যক রাঢ়ী ব্রাহ্মণ ও বীরভূমের মুচিদের জনতাত্ত্বিক গঠন সম্পর্কে অনুসন্ধান চালিয়ে যে সিদ্ধান্তে পেঁছেন তাও মহলানবিশ মহাশয়ের অনুরূপ। তিনি দুয়ের মাঝেই অ্যালপীয় ও ভূমধ্যসাগরীয় জনগোষ্ঠী উপাদানসমূহের উপস্থিতি লক্ষ্য করেছেন।

আর এমনিধারা প্রমাণসমূহের উপর ভিত্তি করেই পণ্ডিতেরা আরও সিদ্ধান্ত করেছেন যে, বর্ণভেদে বিভক্ত হিন্দু সমাজ বা মুসলমান সমাজ নির্বিশেষে সব বাঙালী জনতাত্ত্বিক লক্ষণসমূহই প্রায় এক। তাঁদের এই সিদ্ধান্ত থেকে এ কথাটা জোর করেই বলা চলে, বাঙালী তার নিজস্ব জনতাত্ত্বিক বৈশিষ্ট্য নিয়ে আত্মপ্রকাশ করেছে ঐতিহাসিক কালের সূচনাতেই। তারপর থেকে নানা জাতের মানুষের সাথে বারবার মেলামেশা সত্ত্বেও এই বৈশিষ্ট্যের তেমন কোন পরিবর্তন হয়নি। আজ পর্যন্ত তা অপরিবর্তিত রয়ে গেছে।

www.pathagar.com

তিন

ভাষা

"মোদের গরব মোদের আশা
আ মরি বাংলা ভাষা।"

একেবারে গোড়া থেকেই মানুষ সমাজবদ্ধভাবে বাস করে আসছে। তাই পরস্পরের সাথে যোগাযোগের, ভাব বিনিময়ের প্রয়োজনও অনুভূত হয়েছে একেবারেই গোড়াতে। মানুষের বয়সের সাথে ভাষার বয়সের তফাৎ তাই খুবই কম।

আর্যভাষী নর্ডিকদের যে ধারা পাক-ভারত উপমহাদেশে প্রবাহিত হয় তাদের মাঝে সে কালে যে ভাষা প্রচলিত ছিল তার আধুনিক নাম ভারতীয় আর্য (Indo-Aryan)। ঋগবেদের ঋকসমূহে তার নিদর্শন টিকে আছে।

বাঙলা এই ভাষার দৌহিত্রী-স্থানীয়া। দেশভেদে, উচ্চারণভেদে নানা ধরনের সংমিশ্রণ প্রভৃতির ফলে প্রাচীন বৈদিক সেই ভাষা বিবর্তিত হতে হতে আধুনিক বাঙলায় রূপান্তরিত হয়েছে। এই পরিবর্তন শুধু একটু রকমফের নয়, একেবারে গুণগত।

কিন্তু উপমহাদেশে আর্যরা এসেছে অনেক পরে। বাঙলাদেশের তো কথাই নেই, তার বহু আগে থেকে অষ্ট্রিক-ভাষী দ্রাবিড়-ভাষী, ভোট-চীন-ভাষীরা স্থায়ীভাবে বাসা বেঁধেছে এ দেশে। নিজেদের রীতিনীতি নিয়ে অনেক ক্ষেত্রে গড়ে তুলেছে সমৃদ্ধ জনপদ।

তবু আর্যভাষার তোড়ের সামনে এদেশের প্রাচীন ভাষাগুলি টিকতে পারল না। বাঙলাদেশে যখন আর্যভাষার স্রোত সবেগে প্রবাহিত হচ্ছে তখন মগধের রাজশক্তির জয়জয়াকার। প্রাচীন বৈদিক বা পরবর্তীকালের ব্রাহ্মণ শাস্ত্রাদি অনুমোদিত ধর্মের পাশাপাশি বৌদ্ধ ধর্মের প্রসার হয়ে চলেছে। মগধের প্রতিষ্ঠা তখন সর্বক্ষেত্রে। বাঙলাদেশে আর্যভাষা এল এই প্রতিষ্ঠাবান মগধ রাজশক্তির প্রতিনিধিরূপে। রাজার ভাষা, ধর্মের

www.pathagar.com

ভাষা, সভ্যতার ভাষা হিসেবে আর্যভাষা অনার্যভাষী বাঙলার পূর্বপুরুষদের মাঝে প্রচারিত হতে লাগল। আর্য-পূর্বকালে যে সব ভাষা প্রচারিত ছিল প্রতিযোগিতায় তারা টিকতে পারল না। চীনা পরিব্রাজক হিউএন্‌থ-সাঙ সপ্তম শতকে যখন উপমহাদেশে আসেন তখন তিনি বাঙলাদেশ ঘুরে গিয়েছিলেন। সে সময়কার অবস্থা বর্ণনা করতে গিয়ে তিনি যা বলে গেছেন তা থেকে মনে হয়, তখন গোটা বাঙলাদেশটাই মোটামুটি আর্যভাষী হয়ে গিয়েছিল। এ থেকে দেখা যায়, ন'শো বা হাজার বছর আগে আর্যভাষার যে স্রোত বইতে শুরু করেছিল ন'শো বা হাজার বছর পর তা গোটা দেশে ছড়িয়ে পড়েছে। তার আগে শত শত বছর জুড়ে রাজত্ব করেছে আর্যভাষী রাজশক্তি—মৌর্য ও গুপ্ত রাজবংশ। দেশে বৌদ্ধ, জৈন ও হিন্দু ধর্মের প্রসার হয়েছে। সমাজের উচ্চস্তর থেকে নীচের দিকে আর্যভাষা ছড়িয়ে পড়েছে। স্থানীয় রাজশক্তিগুলি সে ভাষা ব্যবহার করেছে। নানা জটিল, মিশ্রণ ও সংশ্লেষণের ভিতর দিয়ে রূপ বদলে গেলেও দেশের প্রায় আপামর মানুষের মাঝে প্রসারলাভ করেছে আর্য-ভাষা। শত শত বছরের নানা ঘাত-প্রতিঘাতের ভিতর দিয়ে এ দেশের মানুষের মুখের ভাষা হয়ে দাঁড়িয়েছে।

আর্যভাষা যখন বাঙলাদেশে আসে তার আগে এ দেশে বাস করতো কোলভাষী, দ্রাবিড়ভাষী, মঙ্গোলভাষী অনার্যেরা। এদের মধ্যে দুটিতে বা তিনটিতে মিলে-মিশে হয়তো বা কোথাও একটি জাত তৈরী হয়েছিল, আর সেই সব মিশ্র জাতের মধ্যে হয়তো বা প্রচলিত ছিল একটি ভাষাই। ঠিক ব্যাপারটি কি হয়েছিল তা জানার উপায় নেই। মোটামুটি অনুমান করা যায় কোলেরা ছড়িয়ে ছিল সারা দেশে, দ্রাবিড়েরা ছিল বেশীর ভাগ পশ্চিম বংগে, আর মঙ্গোলেরা ছিল পূর্ব-বংগে আর উত্তর-বংগে। তিন ভাষাতেই লোকে কথা বলতো। ক্রমে এরাই আর্যভাষা গ্রহণ করে। গোটা দেশ জুড়ে একটি ভাষা প্রচলিত হয়। আর্যভাষার স্রোতে কালক্রমে তলিয়ে যায় আগেকার ভাষাসমূহ।

কিন্তু তলিয়ে গিয়েও একেবারে নিঃশেষ হয়ে যায় না। নতুন ভাষায় ছাপ রেখে যায় নিজেদের। অতীত প্রচলিত অষ্ট্রিক ও দ্রাবিড় ভাষার কথা মনে করিয়ে দেয়।

www.pathagar.com

বাঙলা ভাষায় অষ্ট্রিক ছাপ

বাঙলাদেশে এখনো 'কুড়ি' হিসেবে গোণার পদ্ধতি চালু আছে। 'কুড়ি' শব্দটি আর্যভাষা জাত নয়। আর্য-ভাষায় এর প্রতিশব্দ হলো 'বিংশতি' বা বিশ।

বিশিষ্ট পণ্ডিত জাঁ পশিলুস্কি প্রমাণ করেছেন, গণনার এই পদ্ধতি আর শব্দ দু'টোই হলো বাঙলায় কোল ভাষার অবদান। কোল অষ্ট্রিক ভাষা গোষ্ঠীর অন্তর্গত। বিশ বা অনেক ক্ষেত্রে দশ অর্থে কুড়ি বা অনুরূপ ধাঁচের শব্দ চালু আছে অষ্ট্রিক গোষ্ঠীর অন্তর্ভুক্ত অন্যান্য ভাষাতেও।

আবার অষ্ট্রিক ভাষায় 'কুর' বা 'কোর' ধাতুর অর্থ হলো মানুষ। কুড়ি হিসেবে গোণার পদ্ধতিটিও এসেছে মানুষ থেকেই। হাতের আঙুল দশ—পায়ের দশ সব মিলিয়ে বিশ। প্রাচীন মানুষের কাছে স্বাভাবিকভাবে তাই এই বিশই ছিল গণনার উচ্চতম সংখ্যা। সব জাতের প্রাচীন মানুষ না হোক, অন্ততঃ কোলভাষীদের মধ্যে গোণার এই ধরন চালু ছিল। তার ছাপ বাঙলা ভাষায় আজ পর্যন্তও টিকে আছে।

বাঙলা ভাষায় অষ্ট্রিক ছাপ শুধু দু-একটি শব্দের দৃষ্টান্তের মাঝেই সীমাবদ্ধ নয়। শব্দ, পদ-সাধন রীতি, সহকারী ক্রিয়ার ব্যবহার প্রভৃতি নানা ক্ষেত্রে তা ব্যাপ্ত। সব ক্ষেত্রের সব দৃষ্টান্ত এখানে উল্লেখ করা সম্ভব নয়। তবে যেটুকু উল্লেখ করবো তাতেই দেখা যাবে বাঙলা ভাষা ও বাঙালী জীবনে অষ্ট্রিক প্রভাব কতই না গভীর ও ব্যাপক।

কলা বাঙালীর একটি প্রিয় খাদ্য। সংস্কৃতে 'কলা'র প্রতিশব্দ হলো 'কদলী'। কদলী শব্দটি কিন্তু সংস্কৃত বা আর্য ভাষাজাত নয়। শব্দটি হলো অষ্ট্রিক।

অনুরূপ আর একটি শব্দ হলো তাম্বুল বা পান। আর্যভাষায় গৃহীত হওয়া সত্ত্বেও তাম্বুল শব্দের কোন অংশই আর্য ভাষার বংশোদ্ভূত নয়। পুরোপুরি অষ্ট্রিক। (অষ্ট্রিক গোষ্ঠী কোন কোন ভাষায় সাধারণ-ভাবে লতা অর্থেও তাম্বুলের অনুরূপ শব্দের প্রচলন আছে—পাতা অর্থে তো আছেই।) আর শুধু শব্দটি নয় শব্দের মতো পানেরও আদি উৎস হলো অষ্ট্রিক অঞ্চলে, অষ্ট্রিক ভাষাভাষীরা যে সব এলাকায় বাস করতো—সেখানে।

www.pathagar.com

বাঙালী হিন্দুদের ভিতর যারা পানের চাষ করে বা পান বিক্রি করে তাদের বলা হয় বারুই। যেখানে পানের চাষ করা হয় তাকে বলা হয় বরোজ। বারুই ও বরোজ—এই দুটো শব্দের মাঝে 'বার' শব্দটি বিদ্যমান। এই 'বার' শব্দটির অর্থ পান, আর এই শব্দটি একই অর্থবোধক অষ্ট্রিক শব্দের সাথে সম্পৃক্ত।

পানের সাথে সম্পর্কিত প্রায় সব কিছুরই উৎস যেমন অষ্ট্রিক, চাষ-বাসের ব্যাপারেও অনেকটা তাই। অষ্ট্রিকভাষীরাই এই উপমহাদেশে কৃষির প্রথম প্রবক্তা। বাঙলাদেশেও এর ব্যতিক্রম হয়নি। লাঙ্গল—লিঙ্গ—এই শব্দ-গুলোও অষ্ট্রিক বংশোদ্ভূত।

কম্বল, শিম্বল (সংস্কৃত শাল্মলী—বাঙলা শিমুল) এই শব্দ দু'টোও আর্য ভাষাজাত নয়, আমাদের ভাষায় অষ্ট্রিক অবদান। কার্পাস শব্দটিও তাই।

মঞ্জুশ্রী মূলকল্প নামক বৌদ্ধ গ্রন্থে যে-সব জায়গায় 'র' কার বহুল রূঢ় শব্দ প্রচলিত সে সব জায়গার তালিকা দিতে গিয়ে নাড়িকের (নারিকেল), ভারুসক (সুমাত্রা), নগ্ন (নিকোবর), বলি, যবদ্বীপ প্রভৃতি দ্বীপের সাথে কর্মরঙ্গাখ্য দ্বীপের উল্লেখ আছে। কিয়া-মো-লঙ-কিয়া নামে হিউএন্থসাঙ একই জায়গা বুঝিয়েছেন। অন্য চীনা পরিব্রাজকরা বুঝিয়েছেন লংকীয়াসু নামে। বাণ প্রণীত হর্ষ চরিতেও এই দ্বীপের উল্লেখ আছে।

আমাদের বাঙলা ভাষায়ও এই দ্বীপটির নাম আজ পর্যন্ত টিকে আছে, তবে একটু অন্যভাবে। 'র' কার বহুল রূঢ়-ভাষা আর্যরা যাকে বলতো অসুর অর্থাৎ অষ্ট্রিক ভাষা—সেই ভাষার দেশ কর্মরঙ্গাখ্য থেকে যে ফল এ দেশে এসেছিল আজও তার নাম কামরাঙা। বাঙালীর অতি পরিচিত ফলের একটি। বাঙলা ভাষায় অষ্ট্রিক বংশোদ্ভূত শব্দের তালিকা রীতিমতো দীর্ঘ ব্যাপার। নীচে আরও অল্প কটি উল্লেখ করা হলো।

খাঁ-খাঁ (খাঁ-খাঁ করে ওঠা অর্থে) খাঁখার, বাঁখারী, বাদুড়, কপোল, নারকেল, কানি (ছেঁড়া কাপড়), ভেক, জাং (সংস্কৃত জঙ্ঘা), গোড়ালি, ঠেঙ্গ বা টেঙ্গরী, ঠোঁট, মোছ, বাসি, খাড়, ইন্দুর, ছাঁচ, ছাঁচতলা বা ছোঞ্চ, কলিচুন, ছোট, পেট, ঝোপ বা ঝোড় বা ঝাড়, ঘণ্টা, চোঙ্গা, চোঙ্গ, মেড়া (ভেড়া অর্থে), গজ (হাতী), কাক বা কাউয়া, বোয়াল (মাছ), হলাহল,

www.pathagar.com

করাত, দা বা দাও, বাইগন বা বেগুন (সংস্কৃত—ভাটিঙ্গন), দাড়িম্ব, কদম্ব, নিম্ব, রম্ভা, লাবু, অলাবু, জম্বু, জাম্বুরা, পগাড়, মাতঙ্গ, ময়ূর, ময়ূখ, মুকুট প্রভৃতি সবগুলো শব্দই বাঙলা ভাষায় এসেছে অষ্ট্রিক ভাষাগোষ্ঠী থেকে। মূল সেখানে নিহিত।

আর একটি দৃষ্টান্তের কথা উল্লেখ করে এই প্রসঙ্গ শেষ করবো। জৈন গ্রন্থ আচারঙ্গ সূত্রে আছে ঃ "মহাবীর যখন পথহীন লাড়, বজ্জভূমি ও সুব্বভূমি অঞ্চলে ভ্রমণ করছিলেন, সে সময় বহু স্থানীয় লোক তাঁকে আক্রমণ করে। ...তারা তাঁকে আঘাত করছিল এবং চু-চু বলে চিৎকার করে কুকুর লেলিয়ে দিচ্ছিল।" মহাবীর যে এলাকায় ভ্রমণ করছিলেন তার একটা অংশে এখনো কোলভাষীরা বাস করে। তখন খুব সম্ভবতঃ কোলেরা গোটা এলাকায়ই ছড়িয়ে ছিল। আর চু-চু শব্দটির অর্থ খুব সম্ভবতঃ কুকুর। চু-চু বা তু-তু শব্দ করে কুকুর ডাকার রেয়াজ কিন্তু আমাদের মাঝে আজ পর্যন্তও প্রচলিত।

বাঙলায় দ্রাবিড় ভাষার ছাপ

বিভিন্ন শব্দ, পদ-সাধন রীতি, ব্যাকরণের রীতি বিশেষ প্রভৃতিতে অষ্ট্রিক ভাষার মতোই দ্রাবিড়-ভাষার প্রভাবও বাঙলায় গভীরভাবেই বিদ্যমান। দৃষ্টান্ত হিসেবে বাঙলায় প্রচলিত শব্দের ভিতর দ্রাবিড় বংশোদ্ভূত কতকগুলো শব্দের কথা উল্লেখ করছি।

কাল (রঙ অর্থে), কুটীর, কুটুম্ব, নীর, মীন, ওড়না, উড়নি, কুকুর, কানা, গোটা, (সম্পূর্ণ অর্থে), মাদুর, ছোলা, থোড়া (পূর্ব-বাঙলায় প্রচলিত শব্দ), নিরালা, বিলাই বা বিড়াল প্রভৃতি দৈনন্দিন জীবনের সাথে সম্পর্কিত শব্দগুলির মূল দ্রাবিড় ভাষায় নিহিত।

বাঙলাদেশের বিভিন্ন স্থান-নামের ভিতরও টিকে আছে প্রাচীন কোন দ্রাবিড় ভাষার প্রভাব।

প্রাচীন বাঙলায় অঙ্গ-বঙ্গ-পুণ্ড্র প্রভৃতি নামগুলো প্রসিদ্ধ আঞ্চলিক নাম। প্রাচীন ইতিহাসের সীমানা পেরিয়ে এই নামগুলোর রেশ আজ পর্যন্ত নানাভাবে টিকে আছে। আর এই নামগুলো হলো অষ্ট্রিক ভাষাজাত। প্রাচীন বাঙলায় আর একটি প্রসিদ্ধ নাম, তাম্রলিপ্তি—প্রাচীন বাঙলার প্রসিদ্ধ সামুদ্রিক বন্দর। দক্ষিণ পূর্বাঞ্চলে উত্তরাপথের তোরণদ্বার।

www.pathagar.com

অনেক জায়গায় একই শহর বোঝাতে গিয়ে তাম্রলিপ্তি, দামলিত্তি শব্দের ব্যবহার দেখা যায়। তা শহরটিকে যে নামেই অভিহিত করা হোক না কেন তাম্রলিপ্তি, তাম্রলিত্তি বা দামলিত্তি—সবগুলো শব্দই হলো অষ্ট্রিকমূল।

প্রকৃতপক্ষে যে সব স্থান নাম বা ভৌগোলিক নামের সূচনায় কাম, কার, কাল, তাম, তার, তাল, পাম, পার বা পাল প্রভৃতি শব্দগুলি বিদ্যমান, সেগুলোর অধিকাংশের মূলই অষ্ট্রিক ভাষায় নিহিত।

আজকাল ঢালু স্থান-নামের ভিতর কতকগুলোর শেষে 'দহ' বা 'দা' শব্দের ব্যবহার দেখা যায়, যেমন ঝিনাইদহ বা ঝিনাইদা, শিয়ালদহ বা শিয়ালদা। ইত্যাদি। (দহ শব্দের অর্থ জলভরা গর্ত নদী গর্ভের গর্ত) এই নামগুলো অষ্ট্রিক ভাষাজাত। অষ্ট্রিক ভাষাজাত আরেকটি প্রসিদ্ধ স্থান-নাম হলো লংকা।

প্রাচীনকালে ও বর্তমানে বহু জায়গার নামের শেষে ড়া, গুড়ি, জুলি, জেলে, জুড়, ভিটা, কুন্ড প্রভৃতি শব্দগুলি দেখা যায়। বাঙলা স্থান-নামে এই শব্দগুলো এসেছে দ্রাবিড় ভাষা থেকে। দ্রাবিড় ভাষার প্রভাবের সাক্ষ্য নিয়ে আজও টিকে আছে নানা স্থান- নাম ; যথা—বগুড়া, বাঁকুড়া, হাওড়া, জলপাইগুড়ি, শিলিগুড়ি, নাড়াজোল, ডোমজুড় প্রভৃতির ভিতর।

জল-টল, ঘোড়া-টোরা, দেশ-টেশ প্রভৃতি অনুকার শব্দগুলিতে যে পদ-সাধন রীতি বিদ্যমান—অর্থাৎ প্রথম অক্ষরের ব্যঞ্জনধ্বনির জায়গায় ট-কার বা অন্য ব্যঞ্জন ধ্বনি বসিয়ে মূল শব্দের সাথে সংযোগ করে পদ সাধন রীতির সন্ধান আর্য ভাষায় মিলে না। এ হলো কোল ও দ্রাবিড় শ্রেণীর ভাষা-গুলির একটি লক্ষণীয় বৈশিষ্ট্য।

বাঙলা ভাষায় সহকারী ক্রিয়ায় যেমন ; বসিয়া পড়া, বিয়া বসা—মারিয়া ফেলা প্রভৃতির ব্যবহারও অনার্য ভাষার (বিশেষতঃ দ্রাবিড় ভাষার) অনুরূপ।

অন্যান্য ভাষার প্রভাব

আর্য ভাষার স্রোত প্রবাহিত হবার আগে অষ্ট্রিক বা দ্রাবিড় ভাষাসমূহ ছাড়া বাঙলাদেশে আর যে ভাষা প্রচলিত ছিল তা ভোটব্রহ্ম গোষ্ঠীর অন্তর্ভুক্ত। বাঙলায় এই গোষ্ঠীর ভাষার প্রভাব খুবই ক্ষীণ। তবে পূর্ব

www.pathagar.com

ও উত্তর বাঙলার লোকদের মাঝে চালু কথ্য ভাষার বা কোন কোন স্থান নামে যেমন বানিয়াচঙ্গ ক্ষীণ হলেও তা আজও অনুভব করা যায়।

প্রাচীন গ্রীক ও পারসিক থেকে গৃহীত হয়ে যে শব্দগুলো আজ পর্যন্ত চালু আছে সেগুলো বাঙলায় সঞ্চারিত হয়েছে প্রাকৃতের মাধ্যমে। আর্য ভাষা যখন বাঙলায় রূপান্তরিত হয়নি তখনই শব্দগুলি সংস্কৃত বা প্রাকৃতে গৃহীত হয়েছিল। বাঙলা সেগুলো লাভ করেছে উত্তরাধিকার সূত্রে।

এ-ভাবে উত্তরাধিকার সূত্রে প্রাপ্ত গ্রীক শব্দের একটি হলো 'দাম'। এক ধরনের প্রাচীন গ্রীক মুদ্রার নাম ছিল 'দ্রাখমে'। এই মুদ্রাই যখন উপমহাদেশে গৃহীত হলো তখন তা অভিহিত হলো 'দ্রক্ষ্ম' নামে। আধুনিক বাঙলার 'দাম' এই দ্রক্ষ্মেরই রূপান্তর। এমনি ধারা আরেকটি শব্দ হলো 'কেন্দ্র'। 'দাম' শব্দটির মতই এটিও প্রাচীন গ্রীক বংশোদ্ভূত।

'মুচি' শব্দটির উৎস হলো প্রাচীন পারসিক। প্রাচীন পারসিক ভাষায় 'মোচক' শব্দের অর্থ হলো 'হাঁটু অবধি ঢাকা চামড়ার জুতা'। মুচি এই মোচক শব্দেরই রূপান্তর।

সংস্কৃতে 'পুস্তক' বা বাঙলা 'পুঁথি' ও প্রাচীন পারসিক শব্দ পোস্ত। (যার অর্থ লেখার জন্য বিশেষভাবে তৈরী চামড়া) থেকে উদ্ভূত।

আর্যভাষা ক্রমে বাঙলায় রূপান্তরিত হবার পর যে ভাষাসমূহ নানাভাবে প্রভাব বিস্তার করেছে, তার মধ্যে আধুনিক ফারসীই (অর্থাৎ মূল ফারসী, আরবী ও তুর্কী সমেত) প্রধান। আর এই প্রভাব প্রাচীন পারসিকের মতো অপ্রত্যক্ষ নয়, প্রত্যক্ষ এবং গভীর।

আধুনিক বাঙলায় আড়াই হাজারের বেশী ফারসী শব্দ চালু আছে। জীবনের বিভিন্ন দিকের সাথে সম্পৃক্ত এই শব্দগুলো, জীবনযাত্রার নতুনতর উপকরণ, বাস্তব সভ্যতা বা বিলাস দ্রব্যের তালিকায় নতুন সংযোজনের পরিচয়বহ।

আধুনিক ইউরোপীয় ভাষাসমূহের কোন কোনটাও বাঙলা ভাষার উপর প্রত্যক্ষ প্রভাব বিস্তার করেছে। তবে ফারসীর তুলনায় এই প্রভাব এখনো ক্ষীণ।

অষ্ট্রিক ও দ্রাবিড় ভাষা ব্যতীত বাঙলাভাষার উপর বিভিন্ন ভাষার প্রভাব সম্পর্কে আলোচনা করতে গিয়ে কিছুটা অবান্তর ভাবেই শেষ পর্যন্ত

www.pathagar.com

একেবারে আধুনিক কালে এসে পড়েছি। কথা হচ্ছিলো বাঙলা ভাষার গঠন নিয়ে—তার আগে যে সব ভাষা এ দেশে প্রচলিত ছিল অর্থাৎ অষ্ট্রিক-দ্রাবিড় বা ভোট-ব্রহ্ম প্রভৃতির ভাগ্য নিয়ে। এদের মাঝে অষ্ট্রিক ও দ্রাবিড় ভাষাসমূহের গভীর প্রভাবের কিছুটা হলেও আমরা আঁচ পেয়েছি। এবার আর্যভাষা থেকে বাঙলায় রূপান্তরের কাহিনী। ফারসী বা আধুনিক ইউরোপীয় ভাষার প্রভাবের কথা পরবর্তী যুগের ইতিহাসের অন্তর্গত।

আর্য ভাষা থেকে বাঙলা

ভাষাকে প্রবাহমান নদীর সাথে তুলনা করা হয়ছে। নদীর স্রোতের মতোই লোকমুখে ভাষা-স্রোতও যুগ যুগ ধরে বয়ে চলে। চলার পথে নতুন নতুন উপকরণ কুড়িয়ে নিয়ে সমৃদ্ধ হয়, বেগবতী হয়। আবার কোন কারণে কোন ভাষার সাথে লোক-সাধারণের সম্পর্ক যখন ছুটে যায়, কোন ভাষা যখন গোষ্ঠী বিশেষের মাঝে সীমাবদ্ধ হয়ে পড়ে, তখন শুকনো নদীর মতোই ভাষার স্রোতও শুকিয়ে যায়। বেগবতী নদীর পাশে বড়জোর বদ্ধ জলাশয়ের মত কিছুকাল টিকে থাকে। পরে কালক্রমে তাও শুকিয়ে যায়।

খ্রীস্ট জন্মের প্রায় দেড় হাজার বছর আগে থেকে অর্থাৎ উপমহাদেশে আর্য-আগমনের পর থেকে এই অঞ্চলে আর্যভাষার যে স্রোত বইতে শুরু করে—তার পাশাপাশি এমনিধারা এক বদ্ধ জলাশয় হলো সংস্কৃত।

সংস্কৃত কোন কালেই লোক-ভাষা ছিল না, জন-জীবনের দৈনন্দিন কাজে মানুষ কোন সময়ই সংস্কৃত ব্যবহার করতো না। শাস্ত্র চর্চা, সাহিত্য রচনা প্রভৃতির জন্যে বৈদিক ভাষার সাথে সংগতি রেখে, তার উপর নির্ভর করে বৈয়াকরণিকেরা অনেকটা সেই ধরনে এই কৃত্রিম ভাষা গড়ে তুলেছিলেন। পণ্ডিতদের প্রচেষ্টায় দীর্ঘকাল পর্যন্ত সংস্কৃতের ব্যবহার টিকে ছিল ঠিকই, কিন্তু মুষ্টিমেয় শিক্ষিতের গণ্ডির বাইরে তা কোন দিনই যেতে পারেনি।

সংস্কৃতে প্রচলিত শব্দাবলীর প্রচলন বাঙলায় যথেষ্ট ব্যাপক হওয়া সত্ত্বেও তাই প্রাচীন আর্যভাষা থেকে ক্রম-বিবর্তনের পথে বাঙলার আবির্ভাবের যে আলোচনা তার সূত্রপাত সংস্কৃত থেকে নয়।

সংহিতার ভাষা হলো উপমহাদেশে আর্যভাষার প্রাচীনতম নিদর্শন। নামেই বোঝা যায় সংহিতা গ্রন্থগুলি ছিল সংকলন। আর্যদের মাঝে যে

www.pathagar.com

মন্ত্রসমূহ দীর্ঘকাল থেকে প্রচলিত ছিল বা সে সময় রচিত হয়েছিল তাই চারটি সংহিতা অর্থাৎ ঋক, সাম, যজু, অথর্ববেদে সংকলিত হয়েছিল।

প্রচলিত ধর্ম-কর্মের মন্ত্র সংকলন—এ থেকে সহজেই ধরে নেয়া যেতে পারে, সবার কাছে বোধগম্য করার জন্যে, কিছুটা কাঁট-ছাঁট করে বেদে যে ভাষা ব্যবহৃত হয়েছে তা ছিল সেকালের সাহিত্যের ভাষা। আর্যভাষী সবগুলো শাখা যাতে বুঝতে পারে তার জন্যে সেদিন এটা বোধ হয় প্রয়োজনও ছিল।

সংহতির ভাষা তাই বলে পরবর্তীকালের সংস্কৃতের মতো কৃত্রিম ভাষা ছিল না। কথ্য ভাষার সাথে লেখ্য ভাষার যে তফাৎ, তখনকার দিনে লোকমুখের ভাষার সাথে সংহতির ভাষার তফাৎ বোধহয় তার চাইতে বেশী ছিল না। আবার আর্যভাষী সব শাখার কথ্য ভাষাও যে ঠিক এক ছিল তা নয়। যতদূর মনে হয়, প্রাচীনতম সংহিতার ভাষার আমলেও বিভিন্নতা ছিল আঞ্চলিক ভাষায়। তার আভাস পাওয়া যায় ঋগবেদ আর পরবর্তী অন্যান্য বৈদিক গ্রন্থে।

যেটুকু জানা যায়, যেটুকু সম্পর্কে পণ্ডিতরা মোটামুটি একমত তা হলো, ঋগ্‌বেদের যুগের পর আর্যেরা তাদের ভাষা নিয়ে উত্তর ভারতে ছড়িয়ে পড়ে। বিহার পর্যন্ত ব্যাপ্ত হয় তাদের বসবাস। এ সময়ে বেদের মন্ত্র রচনার যুগের অবসান হলো—এলো ব্রাহ্মণ গ্রন্থের যুগ। বেদের মন্ত্র আলোচনা, যজ্ঞ সংক্রান্ত সব খুঁটিনাটি, দার্শনিক তত্ত্বালোচনা, আর প্রাচীন কিংবদন্তী এই নিয়ে ব্রাহ্মণ গ্রন্থ। এ সময় বেদের ভাষা আরও সরল হয়ে আসতে শুরু করেছে। বিভিন্ন অঞ্চলের কিছু কিছু কথিত ভাষা স্থান পেতে শুরু করেছে শাস্ত্রগ্রন্থসমূহে। ব্রাহ্মণ গ্রন্থগুলিতে তার আভাস বিদ্যমান।

আর্যভাষা ক্রমেই যত পূর্ব দিকে এগুতে লাগল, ততই বেশী বেশী করে সংস্পর্শে আসতে লাগল কোলভাষী, দ্রাবিড়-ভাষীদের সাথে। কোলভাষী, দ্রাবিড়ভাষীরা আর্যভাষা গ্রহণ করলো, মেনে নিল আর্যরীতি-নীতি। খাঁটি আর্যদের সংখ্যা পূর্ব দিকে কোন সময়ই অধিক ছিল না। পূর্বদিকে এই আর্যকৃত অনার্যদের দ্বারাই প্রচার হলো আর্য ভাষার।

আর্য-ভাষার প্রথম ভাঙ্গন ধরেছিল এই পূর্বাঞ্চলেই। সময়টা বোধ হয় বুদ্ধ জন্মের কিছু আগে।

www.pathagar.com

আর্যভাষা ভেঙ্গে যে ভাষা তৈরী হলো তা ছিল লোক-সাধারণ অর্থাৎ প্রাকৃত জনের কথ্য ভাষা। ভাষার নামও তাই প্রাকৃত।

ক্রম পরিবর্তনের পথে আর্যভাষা থেকে প্রাচীন প্রাকৃতের আবির্ভাব তা কিন্তু খুব দ্রুত ঘটেনি। ঘটেছে খুব ধীর গতিতে, বিভিন্ন পর্যায় অতিক্রম করে। ঠিক কি ভাবে যে কি ঘটেছে, তা বলা সম্ভব নয়। ছিঁটে-ফোঁটা কিছু কিছু দৃষ্টান্ত ছাড়া পরিবর্তনের বিভিন্ন পর্যায়ের নিদর্শন বড় একটা টিকে নেই।

প্রাকৃত বৈদিক আর্য ভাষা থেকে উদ্ভূত লোক-সাধারণের মাঝে প্রচলিত ভাষা। গোড়ার দিকে বৈদিক ভাষার সাথে এর সম্পর্ক ছিল খুবই নিবিড়। বৌদ্ধ ধর্মগ্রন্থসমূহ বুদ্ধের আমলে পূর্বাঞ্চলে প্রচলিত প্রাকৃতে রচিত। যাতে লোক-সাধারণের বোধগম্য হয় সেজন্যই বুদ্ধদেবের এই নির্দেশ। এই ভাষারই আর এক নাম হলো পালি। 'সুত্তনিপাত' পালি ভাষায় রচিত একটি বৌদ্ধ ধর্মশাস্ত্র। বৈদিক ভাষার সাথে এই গ্রন্থের প্রাচীন অংশের মিল বিশেষ লক্ষণীয়। ক্লাসিক্যাল সংস্কৃতের সাথে বৈদিক ভাষার যে মিল বলতে গেলে অনেক ক্ষেত্রে এই মিল তার চাইতেও বেশী।

কিন্তু এত সব সাদৃশ্য সত্ত্বেও প্রাচীন প্রাকৃত আর বৈদিক ভাষা ছিল আর্য ভাষা-গোষ্ঠীর অন্তর্গত দুটো পৃথক ভাষা। আর এই ভাষা গোড়ায় প্রাচ্য অঞ্চলে উদ্ভূত হলেও ক্রমে অন্ততঃ গোটা উত্তরাপথে ছড়িয়ে পড়েছিল। স্বাভাবিকভাবে এই বিস্তীর্ণ ভূখণ্ডের সবটা এলাকা জুড়ে প্রাকৃতের রূপ এক ছিল না। খ্রীস্টজন্মের পাঁচশ' বছর আগের দিকে দেশভেদে এই কথিত ভাষা তিনটি রূপ ধারণ করেছিল—(১) উদীচ্য, উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত অঞ্চল ও পাঞ্জাবে যা বলা হ'ত, (২) মধ্য দেশীয়, কুরু-পাঞ্চাল দেশে যা বলা হ'ত আর (৩) যে ভাষা কৌশল, কাশী, মগধ, বিদেহে প্রচলিত ছিল। শেষের যে ভাষা তারই নাম প্রাচ্য প্রাকৃত।

ক্রমে এই প্রাচ্য প্রকৃতেও ভাঙ্গন দেখা দিল। দেখা গেল, প্রাচ্য-প্রাকৃত দুই ভাগে ভাগ হয়ে গেছে—এক, পশ্চিম খণ্ডের প্রাচ্য-প্রাকৃত ; দুই, পূর্ব খণ্ডের প্রাচ্য-প্রাকৃত বা পূর্বী প্রাচ্য। মগধ অঞ্চলে বলা হতো বলে এর আর এক নাম মাগধী প্রাকৃত।

পশ্চিমা-প্রাচ্য আর পূর্বী-প্রাচ্যের মাঝে গোড়ার দিকে তফাৎ, কিন্তু খুব বেশী ছিল না। পশ্চিমা-প্রাচ্যের নিদর্শন পাওয়া যায় অশোকের

www.pathagar.com

অনুশাসনসমূহে। অশোক যুগেরই দু-একটি ছোট শিলা আর মুদ্রা থেকে পূর্বী বা মাগধী-প্রাচ্যের নিদর্শন পাওয়া যায়। এগুলির মধ্যে বর্তমান বিহারের অন্তর্গত রামগড় পাহাড়ের 'সুতনুকা-লিপি' সবচেয়ে মূল্যবান। দুই ভাষার এই সব নিদর্শন ও অন্যান্যভাবে যেটুকু জানা যায় তাতে দেখা যায় পূর্বী-প্রাচ্যে সব জায়গায়ই তালব্য 'শ' ব্যবহার হতো, আর পশ্চিমী-প্রাচ্যে ব্যবহৃত হতো দন্ত্য 'স'। পশ্চিমী-প্রাচ্যে তালব্য 'শ' ও পূর্ব-প্রাচ্যে দন্ত 'স' ব্যবহৃত হতো না। 'র'র ব্যবহার ছিল না কোনোটাতেই। 'র'র স্থলে ব্যবহৃত হতো 'ল'।

ক্রমে পূর্বী-প্রাচ্য-প্রাকৃতেরও ধীরগতিতে হলেও রূপান্তর হতে থাকে। এই সময়ে বিভিন্ন পর্যায়ের পরিবর্তীত রূপের কিছু সন্ধান মিলে সংস্কৃত নাটকে, আরও পরে বররুচির ব্যাকরণে। এই সব নাটকে অভিজাত শ্রেণীর পাত্র-পাত্রীরা কথা বলতো বিদগ্ধ জনের ভাষা সংস্কৃতে। আর যে দৃশ্যে সাধারণ মানুষের প্রবেশাধিকার ঘটতো সেখানে ব্যবহৃত হতো প্রাকৃত। সাধারণ লোকদের পক্ষেতো সংস্কৃত কথা বলা সম্ভব ছিল না। নাট্যকার তাই তাদের দিয়ে প্রাকৃতে কথা বলাতেন। অবশ্য এই প্রাকৃত আর লোকে যে প্রাকৃতে কথা বলতো দু'টোই যে এক ছিল তা নয়। সব জায়গায় বোধগম্য হবার জন্যে নাট্যকার তাই কিছু বদলে নিতেন। অনেকটা কোলকাতাভাষী নাট্যকারের চরিত্রের মুখ দিয়ে তথাকথিত বাঙলা ভাষা বলানোর চেষ্টার মতো। তবু আদতে যে ভাষা চলতি ছিল তার কিছু কিছু ছাপ থেকে যেত। এই পরবর্তী কালের মাগধী-প্রাকৃতের নিদর্শন হিসেবে পূর্বোক্ত সীমাবদ্ধতা সত্ত্বেও সংস্কৃত নাটকের দৃষ্টান্তগুলি সেজন্যেই গুরুত্বপূর্ণ। বররুচির ব্যাকরণেও একই দৃষ্টান্তের সন্ধান মেলে। বররুচি বোধ হয় কালিদাসের সমসাময়িক—অর্থাৎ, খ্রীস্টীয় চতুর্থ-পঞ্চম শতাব্দীর লোক। কালিদাসের মতোই উনিও বোধ হয় চন্দ্র-গুপ্ত-বিক্রমাদিত্যের সভা অলংকৃত করেছিলেন। প্রাকৃত ভাষায় লেখা তাঁর ব্যাকরণে মাগধী-প্রাকৃত সম্বন্ধেও তিনি দুটো কথা বলে গেছেন। এগুলি খুবই মূল্যবান।

নদী যেমন সদা চঞ্চল, ভাষাও তাই। স্থির থাকে না কোন সময়। সে জন্যেই তো ভাষাকে বলা হয় 'বহতা-নীর'। অপেক্ষাকৃত পরবর্তী সময়ের মাগধী-প্রাকৃতও কয়েক শতাব্দীর ব্যবধানে পরিবর্তিত হলো।

www.pathagar.com

সময়টা বোধ হয় আনুমানিক ৬০০ খ্রীস্টাব্দ থেকে ১০০০ খ্রীস্টাব্দের মাঝামাঝি। মাগধী-প্রাকৃত ক্রমে পরিবর্তীত হয়ে যে রূপ ধারণ করলো তাকে বলা হয় মাগধী-অপভ্রংশ। বাঙলা-বিহার-উড়িষ্যা বা আসামের কিয়দংশে লোকমুখে যে আর্যভাষা প্রচলিত ছিল এতদিন পর্যন্ত তাতে কোন তফাৎ দেখা যায়নি। ভাষার রূপছিল মোটামুটি এক। এবার এখানেও পরিবর্তন সূচিত হল। বলা যেতে পারে, মাগধী-প্রাকৃত ক্রমে ভোজপুরী, মৈথিলী, মগহী, বাঙলা, উড়িয়া আর আসামীতে ধীরে ধীরে পরিবর্তিত হচ্ছিল এ সময়। এ যুগের তেমন কোন দৃষ্টান্ত বাঙলায় পাওয়া যায় না। যতটুকু জানা যায় তা হলো সমসাময়িক তাম্র শাসনে দু-একটি স্থান-নাম বা ব্যক্তি-নাম, কোন কোন সময় দু-একটি শব্দ। সংখ্যায় অকিঞ্চিতকর হলেও বাঙলা ভাষার সীমানায় পেঁছিবার আগ মুহূর্তের দৃষ্টান্ত হিসেবে এগুলি খুবই মূল্যবান।

এর পরের ধাপেই বাঙলা ভাষার সীমানা। কালক্রমে সে সীমানাও বিস্তৃত হয়ে চলেছে। বাঙলা ভাষার একেবারে গোড়ার যুগে ভাষার যে চেহারা আজকের সাথে তার অনেক তফাৎ। একেবারে গোড়ায় প্রাচীন বাঙলার গায়ে মাতৃ-গর্ভের গন্ধ খুবই স্পষ্ট। বয়ঃপ্রাপ্তির সাথে এই গন্ধের উগ্রতা কিছু কমেছে। প্রাচীন বাঙলা মধ্যযুগের বাঙলার পথ বেয়ে আধুনিক যুগে এসে পেঁছেছে। তাই বলে বাঙলা ভাষা নতুন কোন ভাষায় রূপান্তরিত হয়নি।

বুদ্ধদেবের সময়ের উত্তরাপথের আর্য জনপদ বা রাজ্যের নামের একটা তালিকা প্রাচীন পালি সাহিত্যে পাওয়া যায়। তাতে বাঙলাদেশের নাম নেই। খুব সম্ভবতঃ মৌর্য-আমলেই বাঙলাদেশে আর্যভাষার স্রোত সর্ব-প্রথম ব্যাপকভাবে প্রবাহিত হলো। পূর্বী-প্রাচ্য প্রাকৃত শিকড় গাড়লো বাঙলার মাটিতে, পূর্বোক্ত পন্থায় বিবর্তনের পথে পা রাখলো বাঙলা ভাষার সীমানায়।

মহামহোপাধ্যায় হরপ্রসাদ শাস্ত্রী নেপাল রাজ-দরবারে সংস্কৃত পুঁথি খুঁজতে গিয়ে কতকগুলি প্রাচীন পুঁথি আবিষ্কার করেছিলেন—বাইশজন বৌদ্ধ সিদ্ধাচার্যের সাতচল্লিশটি চর্যাপদ ও তার সাথে আরও তিনটি পুঁথি। বাঙলা ভাষা ও সাহিত্যের ইতিহাসে এ এক গুরুত্বপূর্ণ আবিষ্কার।

www.pathagar.com

এর আগে যে পুঁথিসমূহ আবিষ্কৃত হয়েছিল তার মাঝে অনন্ত বড়ু চণ্ডীদাস রচিত শ্রীকৃষ্ণকীর্তনই ছিল সবচেয়ে প্রাচীন। সে তো বড়জোর চতুর্দশ শতাব্দীর ব্যাপার। মহামহোপাধ্যায়ের আবিষ্কারে প্রাচীন বাঙলা পুঁথির সীমানা এক লাফে প্রায় সাড়ে তিন শ' বছর পিছিয়ে গেল।

আজ পর্যন্তও মহামহোপাধ্যায়ের আবিষ্কৃত চর্যা ও পুঁথিগুলিই হলো প্রাচীন বাঙলার প্রাচীনতম নিদর্শন। সবগুলি পুঁথি অবশ্য এক সময়ের রচনা নয়। তবে প্রাচীনতম চর্যাগুলির রচনাকালও ৯৫০ খ্রীস্টাব্দের আগে বলে মনে হয় না। এর আগে লিখিত সাহিত্যের যে নিদর্শনগুলি হাতে এসেছে, তা হয় সংস্কৃতে লেখা না হয় শৌরসেনী অপভ্রংশে। এখানে শৌরসেনী অপভ্রংশ সম্পর্কে কয়েকটি কথা বলা দরকার। মহামহোপাধ্যায় আবিষ্কৃত পুঁথিগুলির মাঝেও শৌরসেনী কয়েকটি অপভ্রংশে রচিত।

পূর্বাঞ্চলের যে কথিত ভাষা তাকে যেমন বলা হতো প্রাচ্য-প্রাকৃত ঠিক তেমনি উত্তরাপথের মধ্যভাগে, পাঞ্জাবে, রাজপুতনায় প্রাকৃতের যে রূপ প্রচলিত ছিল তাকে শৌরসেনী প্রাকৃত নামে অভিহিত করা হতো। কালক্রমে প্রাচ্য-প্রাকৃতে যেমন ভাঙ্গন দেখা দেয় এবং এক সময় মাগধী-অপভ্রংশের আবির্ভাব হয়, ঠিক সেভাবে শৌরসেনী-প্রাকৃত থেকে জন্ম নেয় শৌরসেনী-অপভ্রংশ। দু'য়ের অর্থাৎ মাগধী-অপভ্রংশ আর শৌরসেনী-অপভ্রংশের জন্মকাল মোটামুটি এক—আনুমানিক ৬০০ খ্রীস্টাব্দের কাছাকাছি সময়। রাজপুত শক্তির অভ্যুদয় ও প্রসারের সাথে সাথে গোটা উত্তরাপথ ও দক্ষিণাপথ জুড়ে শৌরসেনী অপভ্রংশেরও প্রসার ঘটে। শৌরসেনী-অপভ্রংশ ছিল সাহিত্যের ভাষা, কাব্যের ভাষা। সে হিসেবে মগধ-বাঙলাদেশেও গৃহীত হয়। বাঙলায় সে সময় লোক-সাধারণের কথ্য ভাষা ছিল মাগধী-অপভ্রংশ আর সাহিত্যের ভাষা ছিল হয় সংস্কৃত না হয় শৌরসেনী-অপভ্রংশ। আর্য সাহিত্যের ভাষা হিসেবে বাঙলাদেশে গৃহীত হবার পর শৌরসেনী অপভ্রংশ একেবারে অপরিবর্তিত থাকেনি। একটু একটু করে প্রাচ্যদেশীয় রীতি-নীতি ও শব্দসম্ভার গ্রহণ করেছিল। আবার নিজেও প্রভাব বিস্তার করেছিল বাঙলাদেশে প্রচলিত কথ্য ভাষার উপর।

এবার বাঙলা লিপি সম্পর্কে দু-চারটি কথা। পাক-ভারত উপমহাদেশে আর্য ভাষার প্রাচীনতম বর্ণমালার নিদর্শন পাওয়া গেছে খ্রীস্টপূর্ব

www.pathagar.com

তৃতীয় শতকে অশোক অনুশাসনে। বাঙলাদেশেও সবচেয়ে প্রাচীন যে লিপি বগুড়া জেলার মহাস্থানগড়ে আবিষ্কৃত হয়েছে তাও সমসাময়িক কালের। অশোক অনুশাসনের লিপির সাথে এর পার্থক্য নেই।

অশোক অনুশাসন বা মহাস্থানগড়ে প্রাপ্ত এই লিপির নাম হলো ব্রাহ্মী লিপি। ব্রাহ্মী লিপি কোথা থেকে কিভাবে এলো, এই লিপির বহিরাগত না দেশজ এ নিয়ে পণ্ডিতদের মাঝে দুটো মত প্রচলিত। এক দল মনে করেন, ব্রাহ্মী লিপি মূলে হলো ফিনীশিয়। প্রাচীন ফিনীশিয় বর্ণমালার আধারের উপর ভিত্তি করে উপমহাদেশের পণ্ডিতরা এই লিপি সৃষ্টি করেছেন। কাজেই এই লিপি বহিরাগত। আর এক দল পণ্ডিত এই মতবাদ অস্বীকার করেন। তাঁরা বলেন, হরপ্পা ও মহেনজোদাড়োর ধ্বংসাবশেষের মাঝে আবিষ্কৃত মুদ্রা বা সীলমোহরে যে লিপির সন্ধান পাওয়া গেছে ব্রাহ্মী লিপি সে লিপির বিবর্তিত রূপ।

প্রায় চার হাজার বছরের প্রাচীন হরপ্পা লিপি সে মহেনজোদাড়োর লিপির পাঠোদ্ধার আজও সম্ভব হয়নি। ফলে, দ্বিতীয় মত সম্পর্কে সুনির্দিষ্টভাবে কোন কিছু বলা সম্ভব নয়।

সে যাই হোক পণ্ডিতদের মাঝে ব্রাহ্মী লিপির জন্মবৃত্তান্ত নিয়ে যত কথাই থাকুক না কেন, উপমহাদেশের কি উত্তরাপথ কি দক্ষিণাপথ সর্বত্রই প্রচলিত বর্ণমালার মূলে হলো ব্রাহ্মী লিপি ও বর্ণমালা।

উত্তরাপথে ব্রাহ্মী লিপি কুষাণ ও গুপ্ত রাজাদের আমলে পরিবর্তিত হয়ে কালক্রমে হর্ষবর্ধনের মৃত্যুর পর সপ্তম শতকে তিনটি বিশিষ্ট রূপ ধারণ করে। তিনটি রূপের মাঝে কাশ্মীর ও পাঞ্জাবে প্রচলিত রূপের নাম সারদা, রাজস্থান, মালব, গুজরাট ও মধ্যদেশে প্রচলিত রূপের নাম নাগর ও পূর্বাঞ্চলে প্রচলিত রূপের নাম কুটিল। লিপির এই 'কুটিল' রূপ থেকেই বাঙলা লিপির উৎপত্তি, নাগর রূপ থেকে দেবনাগরীর। বাঙ্গালা ও দেবনাগরীর লিপির জন্ম প্রায় সমসাময়িক কালে, হাজার বছর বা তার কিছু আগে।

বাঙালা ভাষা গোড়া থেকেই বাঙালা বর্ণমালায় লেখা হয়ে আছে। বাঙলা লিপিকে আশ্রয় করেই বাঙালা ভাষার বিকাশ হয়েছে। আবার এই লিপিও কোন সময়েই অন্য কোন ভাষার প্রকাশের মাধ্যম হয়ে ওঠেনি।

www.pathagar.com

ইতিহাসই বাঙালা ভাষা ও বাঙালা লিপিকে অঙ্গাঙ্গী সম্পর্কে আবদ্ধ করেছে।

সূচনা থেকেই নবম শতক বাঙালীর ইতিহাসে গুরুত্বপূর্ণ। রাজনৈতিক ক্ষেত্রে বাঙলাদেশে এ সময় আঞ্চলিক রাজত্বের প্রতিষ্ঠা স্থায়ী হয়েছে। হোক না সংস্কৃত বা পশ্চিমী অপভ্রংশ, এ সময় থেকেই সাহিত্য ক্ষেত্রেও নিজের বিশিষ্ট স্থানটি আবিষ্কার করে নিয়েছে বাঙালী। আবার এ সময়টাই হলো বাঙলা ভাষার জন্মের পূর্বলগ্ন। এক কথায় বাঙালী জীবনের একটি মাহেন্দ্রক্ষণ।

তারপর থেকে ইতিহাসের উত্থান-পতনের বন্ধুর পথে বাঙালী জীবনের সাথে সাথে বাঙলা ভাষাও দীর্ঘপথ অতিক্রম করে বর্তমানে এসে পেঁছেছে। গোড়া থেকেই তার যাত্রা শুরু হয়েছিল এদেশের বৈশিষ্ট্যসমূহ অর্থাৎ অষ্ট্রিক-দ্রাবিড়-ভোট-ব্রাহ্ম ভাষাসমূহের বিভিন্ন উপাদানসমূহ অঙ্গীভূত করে নিয়ে। পরবর্তীকালেও সে প্রক্রিয়া বন্ধ হয়নি। চলার পথে নতুন নতুন যে সব ভাষার সংস্পর্শে এসেছে তাদের উপাদানসমূহ আত্মসাৎ করে নিয়ে এগিয়ে গেছে বাঙলা ভাষা। পরিণত হয়েছে অন্যতম শ্রেষ্ঠভাষায়। সেজন্যেই তো বাঙলাভাষা মোদের গরব, মোদের আশা।

www.pathagar.com

চার

কৌম জীবনের ছায়া

"রাজনৈতিক আকাশে বহু ঝড়-ঝাপটা সত্ত্বেও, সাম্রাজ্যের বহু উত্থান-পতন সত্ত্বেও আমাদের দেশে অন্ততঃ ব্যাপকভাবে সমাজ বিকাশের পুরানো পর্যায়কে নিঃশেষে বিলুপ্ত করে নতুন পর্যায়ের সমাজের বাস্তবভিত্তি স্থাপন করতে পারেনি"।

—দেবীপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায়

সব দেশের, সব জাতের মানুষের জীবনে এমন একটা সময় ছিল যখন রাজা ছিল না, উজির ছিল না, ছিল না আধুনিক অর্থে রাষ্ট্র। মানুষ তখন বিভিন্ন দলে ভাগ হয়ে বাস করতো। জীবন ধারণ করতো ফলমূল সংগ্রহ করে, না হয় শিকার করে, আর না হয় কোদাল দিয়ে মাটি কুপিয়ে জমি চাষ করে। আর এভাবে ক্ষুদ-কুঁড়ো যা জুটতো তা তারা সমানভাবে ভাগ করে নিত। এক কথায় মানুষের পরস্পরের মাঝে বিত্তের মানদণ্ডে যে বিভাগ তা তখন ছিল অজানা।

মানব-ইতিহাসের এই যে অধ্যায়, একেই বলে আদিম সাম্যসমাজ। মানুষ তখন বিভিন্ন কৌমে ভাগ হয়ে বাস করতো বলে এই সমাজেরই আর এক নাম কৌমসমাজ। পরবর্তীকালের মধ্যযুগের যে সমাজ তার ভিত্তি রচিত হয়েছে এই কৌম সমাজেরই ধ্বংসস্তূপের উপর। বাঙলাদেশও তার ব্যতিক্রম নয়।

এটা শুধু ইতিহাসের কথা নয়—আমাদের কৌম-সমাজের যে অতীত তার দৃষ্টান্তও আমাদের চোখের সামনেই বিদ্যমান। বাঙলাদেশে যে উপ-জাতিসমূহ আজও বাস করে তাদের কথাই বলছি। আমাদের চোখের সামনেই দেখছি ক্রমেই তাদের সমাজ ভেঙ্গে যাচ্ছে। ক্রমেই তারা বৃহত্তর বাঙালী সমাজের অন্তর্ভুক্ত হচ্ছে। পরিধি বাড়ছে বাঙালী সমাজের।

তবে বাঙালী সমাজের বেশীর ভাগ কিন্তু পরিবর্তনের এই ধাপটি অর্থাৎ কৌম-সমাজ ভেঙ্গে সভ্য সমাজের সীমানায় পা রেখেছে অনেক

www.pathagar.com

আগে। ঠিক কত আগে তা সঠিকভাবে বলার উপায় নেই, তবে কালটা যে খ্রীস্ট-জন্মের আগে এ ব্যাপারে সন্দেহ নেই।

আবার কৌম-সমাজের ভাঙ্গনটাও ঠিক এক লাফে হয়ে যায়নি। তারও বিভিন্ন পর্যায় আছে। বিভিন্ন স্তর আছে কৌম সমাজেরও। সভ্যতার যুগ বলতে আমরা যা বুঝি তার আয়ু মোট সাড়ে তিন হাজার কি চার হাজার বছরের বেশী নয়। মানুষের জন্ম তো তার বহু আগে। সেই সময়-টুকু থেকে চার হাজার বছর বাদ দিলে যা থাকে তার সবটুকুই আদিম সাম্য সমাজের যুগ। কৌম-সমাজের যুগ।

এই সময়টা একটা দীর্ঘ সময়। আর এই দীর্ঘ সময় জুড়ে সমাজ এক জায়গায় থেমে থাকেনি, ধীর গতিতে হলেও এগিয়ে গেছে। সমাজ পরি-বর্তনের মৌলিক উপাদান—উৎপাদন যন্ত্রের হাতিয়ারসমূহের পরিবর্তন হয়েছে ধীরে ধীরে।

আদিম সাম্য সমাজের গোড়ার দিকে মানুষ ফল-মূল আহরণ করে। পশু শিকার করে পাথরের অসংস্কৃত হাতিয়ারসমূহ দিয়ে। ক্রমে শিকারের হাতিয়ারের উন্নতি হয়। বর্শা, তীর-ধনুকের ব্যবহার আয়ত্ত করে মানুষ। পশু শিকার ছাড়াও মাছ ধরতে শেখে। হাঁড়ি-কুড়ি তৈরী করা, কাপড় বোনা, পশুকে পোষ মানানোর প্রক্রিয়া আয়ত্ত করে।

এ পর্যন্ত দেশ নির্বিশেষে আদিম সাম্য-সমাজের চেহারা দুনিয়ার প্রায় সর্বত্রই এক। পার্থক্য যা তা পরের স্তরে। পরের স্তরে মানুষ কোথাও বা পশুপালনজীবী, কোথাও বা কৃষিজীবী। কৃষিজীবীরও আবার তিনটি স্তর। সর্বশেষে স্তরে অর্থাৎ আদিম সাম্য-সমাজের আয়ুষ্কাল যখন শেষ হয়ে এসেছে তার ঠিক আগে মানুষ ছোট ছোট ক্ষেতে কোদাল দিয়ে কুপিয়ে চাষ করার চেষ্টা ছাড়িয়ে রীতিমতো বড়ো ক্ষেতে লাঙ্গল দিয়ে চাষ করতে শুরু করেছে। একই সাথে শুরু করেছে পশুপালনও। আর এ ভাবেই, নিজের অজান্তেই মানুষ পা রেখেছে আদিম সাম্য-সমাজের শেষ প্রান্তে।

পরবর্তী ধাপে, উৎপাদন যন্ত্রের আরও বিকাশের প্রয়োজনে নিজের তাগিদেই আদিম সাম্য-সমাজের অবসান। সভ্যতার যুগের সূচনা। মোটা-মুটি এই হলো আদিম সাম্য-সমাজের পরিবর্তনের রূপরেখা।

www.pathagar.com

এবার নির্দিষ্টভাবে বাঙলাদেশের কথায় আসা যাক।

বাঙলাদেশেও একেবারে গোড়ায় যে নিগ্রোপ্রতিম জনধারার বসতির কথা অনুমান করা হয় তারা ছিল শিকারজীবী, পাথরের তীর ও ধনুক নিয়ে তারা এদেশে এসেছিল। হয়তো বসতিও স্থাপন করেছিল। কিন্তু একেবারে নিঃশেষে মিলিয়ে যাওয়ায় তাদের শিকারজীবী পর্যায়ের কৌম-সমাজ সম্পর্কে আমরা একেবারেই অজ্ঞ।

পরবর্তী আগন্তুক অষ্ট্রিক-ভাষী, দ্রাবিড়-ভাষীদের সম্পর্কে এর আগে বিস্তৃত আলোচনা করা হয়েছে। আদিম-সাম্যবাদী সমাজের শিকারজীবী স্তরেই হয়তো উভয় জনধারার কৌমগুলি এ দেশে বসতি স্থাপন করেছিল। কিন্তু পরবর্তী কালে উভয়েই কৃষিজীবী হয়ে ওঠে, স্থায়ীভাবে মাটির বুকে বাসা বাঁধে। থিতিয়ে বসে দেশের বুকে। অবশ্য অষ্ট্রিক-ভাষী আদি অস্ট্রেলীয়দের কতকগুলি অরণ্যচারী শাখা—যেমন নিষাদ, কোল শ্রেণীর শবর, মুণ্ডা, হো, সাঁওতাল প্রভৃতিরা পশু শিকারজীবী ছিল দীর্ঘকাল।

আর্য আগমনের আগেই উৎপাদনের উপকরণসমূহের স্বাভাবিক বিকাশের ফলে অষ্ট্রিক-ভাষী, দ্রাবিড়-ভাষী বা ভোট-ব্রহ্মভাষী কৌমগুলি সভ্যতার যুগে অর্থাৎ শ্রেণী-সমাজের যুগে পা রেখেছিল কিনা তা এখনো সঠিকভাবে বলা যায় না। মহাভারতের বিভিন্ন জায়গায়, তারও আগে দক্ষিণপূর্ব এশিয়ার চম্পা প্রভৃতি রাজ্যে প্রচলিত কিংবদন্তিতে বিভিন্ন শক্তিশালী রাজ্যের উল্লেখ দেখা যায়। এই রাজ্যগুলির অস্তিত্ব যদি সত্যিই বাস্তব হয়ে থাকে, তা'হলে এগুলির চরিত্র ঠিক কি ছিল অর্থাৎ রাজ্যগুলি কি শ্রেণী-বিভক্ত সমাজের উপর প্রতিষ্ঠিত ছিল, না কোন শক্তিশালী কৌমের বসবাসের অঞ্চলকেই রাজ্য বলে আখ্যায়িত করা হয়েছে, তা বলার উপায় নেই।

তবে এটা ঠিকই দ্রাবিড়ভাষীরাই উপমহাদেশে প্রথম নগর সভ্যতার পত্তন করে। মহেনজোদাড়ো-হরপ্পা তার উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত এবং মহেন-জোদাড়ো-হরপ্পার সর্বশেষ স্তরের যে ধ্বংসাবশেষ আবিষ্কৃত হয়েছে তা শ্রেণী-সমাজেরই স্মারক। বাঙলাদেশেও দ্রাবিড়ভাষীদের পক্ষে অনুরূপ নগর-পত্তন অসম্ভব নয়। তবে আজ পর্যন্তও কোথাও তার দৃষ্টান্ত আবিষ্কৃত হয়নি। এই প্রসংগেই একটা কথা মনে রাখা দরকার, উপমহা-দেশের বিস্তীর্ণ অঞ্চল জুড়ে প্রতিষ্ঠিত ছিল আদিম সাম্যবাদী সমাজ।

www.pathagar.com

কালক্রমে এই সমাজে স্বাভাবিক কারণে পরিবর্তন সূচিত হয়েছিল। কিন্তু ঠিক একসাথে নয়, দেশ ভেদে, নানা কারণের জন্যে তারতম্যে ছিল পরিবর্তনের গতির ভিতর। বিভিন্ন কারণে সমাজ কোথাও কোথাও এগিয়ে গিয়েছিল। আবার একই সময়ে অন্য জায়গায় হয়তো বা তা আটকে ছিল পুরানো গণ্ডীর ভিতর। এ জন্যেই তো আমাদের মাঝেই প্রাচীন কৌম-সমাজের দৃষ্টান্ত আজও বিদ্যমান। আর এ জন্যেই কোথাও কোথাও সমাজের গতি যখন প্রায় নিশ্চল তখনো দ্রাবিড়ভাষীরা মহেনজোদাড়ো-হরপ্পায় নগর সভ্যতার পত্তন করেছে। তবু এ কথা থেকেই বাঙলাদেশের দ্রাবিড়-ভাষীদের সম্পর্কে কোন সিদ্ধান্তে আসা চলে না।

আলেকজাণ্ডারের আক্রমণের সময় বাঙলাদেশে প্রথম প্রমাণসিদ্ধ রাজ্যের উল্লেখ পাওয়া যায়। সেই রাজ্যের সৈন্যদল ইত্যাদি সম্বন্ধে জানা যায়। তবে এ তো খ্রীস্ট জন্মের ৩২৬ বছর আগের কথা। এ সময় বাঙলাদেশে আর্য বসতি শুরু হয়ে গেছে।

খ্রীস্ট জন্মের ৩০০ থেকে ২০০ বছরের মধ্যে উপমহাদেশের সমাজ ব্যবস্থায় নানা রকম তোলপাড়ের যুগ। শত শতাব্দীর পুরানো বিশ্বাস তখন ভেঙ্গে পড়েছে, জন্ম নিচ্ছে নতুন নতুন বিশ্বাস, নতুন চিন্তাধারা। এ যেন এক যুগলসন্ধিক্ষণ। আর্যরাও বাঙলাদেশে আসে এ সময় মৌর্য আমলে।

ঐ সময় যে বিস্তীর্ণ সাম্রাজ্যের যুগের পত্তন হয় মৌর্য-রাজত্বে তার সূচনা। খ্রীস্ট জন্মের দেড় হাজার বছর আগে আর্যরা যখন উপমহাদেশে প্রবেশ করে, তখন তাদের সমাজ ছিল আদিম সাম্যবাদী সমাজ। সে সময় থেকে মৌর্যযুগের সূচনার মাঝে বহু শত বছর গত হয়েছে। ভাঙ্গন দেখা দিয়েছে তাদের প্রাচীন সাম্যবাদী সমাজে। অবশ্য সবগুলি আর্য-কৌম যে একই সাথে আদিম সাম্যবাদী সমাজ উতরে এসে শ্রেণী সমাজে পা রেখেছিলো এমন নয়। সময়ের পরিবর্তনের গতির তারতম্য ছিল। তবে যে প্রসঙ্গে এতো কথা, সেই মৌর্য সাম্রাজ্য পত্তন করেছিল যে আর্য-কৌম তারা আদিম সাম্যবাদী সমাজ পিছনে ফেলে এসেছিল। মৌর্য রাজত্বের রীতি-নীতি ও আইন-কানুন সবই শ্রেণী সমাজের স্মারক। রাজত্ব যে অঞ্চল-সমূহে বিস্তৃত ছিল সেই এলাকাসমূহে অবস্থা যাই থাকুক না কেন, মৌর্যরা সর্বত্রই একই আইন, একই রীতিনীতি চালু করে। গোটা

www.pathagar.com

সাম্রাজ্য জুড়ে কায়েম হয় শ্রেণী সমাজের আইন-কানুন। উৎপাদন শক্তির স্বাভাবিক বিকাশের ফলে আদিম সাম্যবাদী সমাজের যে ভাঙ্গন তা সম্পূর্ণ হবার পূর্বেই উপর থেকে চাপিয়ে দেওয়া হয় শ্রেণী সমাজের কাঠামো। অবস্থার পরিপক্কতার আগেই রাষ্ট্র শক্তির সাহায্যে পুরানো উৎপাদন সম্পর্কে জোর করে ভেঙ্গে দেওয়া হয়। ফলে, পুরানো সমাজে ভাঙ্গন ধরে ঠিকই, কিন্তু পুরোপুরি নিঃশেষ হয় না।

আদিম সাম্যবাদী-সমাজের অসম্পূর্ণ বিলোপ উপমহাদেশের ইতিহাসের একটি গুরুত্বপূর্ণ সূত্র। পরবর্তী ইতিহাসের অনেক বিচিত্র পরিণতি, সমাজ-কাঠামোর বহু বৈশিষ্ট্যের পিছনে লুকানো কারণ খুঁজতে গিয়ে এই সূত্রের ছায়ার সন্ধান মেলে। বাঙলাদেশের ইতিহাসের এটি অন্যতম গুরুত্ব-পূর্ণ চাবিকাঠি।

সূত্রটি আমরা মৌর্য সাম্রাজ্যের উত্থানকে ভিত্তি করে বিশ্লেষণ করার চেষ্টা করলাম। তাই বলে এটা শুধু মৌর্য সাম্রাজ্যের বেলায়ই যে সত্য তা নয়। মোটামুটি গোটা উপমহাদেশ সম্পর্কেই এই সূত্রটি প্রযোজ্য।

এবার এই অধ্যায়ের মূল আলোচনা। আমাদের পূর্ব-পুরুষরাও যখন কৌম-সমাজে গোষ্ঠীবদ্ধভাবে বাস করতো, তখন তাদের রীতি-নীতি চাল-চলন ঠিক কি ছিল তা আজ এতদিনের ব্যবধানে বলে প্রত্যক্ষ প্রমাণসিদ্ধভাবে জানার উপায় নেই। জানার উপায় নেই তাদের ধ্যান-ধারণা-বিশ্বাসের যে জগৎ তার পূর্ণ পরিচয়। তবু আমাদের দেশে কৌম-সমাজ যেহেতু সম্পূর্ণভাবে বিলুপ্ত হয়ে যায় নি, নতুন সমাজের ভিতরেও যেহেতু প্রাচীন কৌম-সমাজের বিলুপ্তাবশেষ আজও মুখ লুকিয়ে আছে, সেই হেতুই এবং অন্যান্য নানা কারণে সে যুগে প্রচলিত রীতি-নীতি-বিশ্বাসসমূহ ঠিক সেভাবে না হলেও আজও কিছু কিছু টিকে আছে। আদি তাৎপর্য নিয়ে না হলেও টিকে আছে কিছু কিছু প্রাচীন আচার। আর এগুলি থেকেই আবছাভাবে হলেও আমাদের প্রাচীন কৌম-অতীত সম্পর্কে কিছুটা আঁচ করা যায়। এই অধ্যায়ে আমরা তাই করতে চেষ্টা করবো।

কিন্তু তার আগে আদিম সাম্যবাদী সমাজ সম্পর্কে আর একটি কথা।

আদিম সাম্যবাদী সমাজের একেবারে গোড়ায় আর পরবর্তী কালে কৃষিজীবী স্তরে সমাজ হলো মাতৃতান্ত্রিক। কারণ, এই দুই স্তরেই

www.pathagar.com

উৎপাদনের ক্ষেত্রে পুরুষের তুলনায় মেয়েরা বেশী দায়িত্বশীল। কথাটা আজকের দিনে হয়তো কিছুটা অবিশ্বাস্য মনে হতে পারে, গোড়ায় কৃষি-কাজের দায়িত্ব ছিল মেয়েদের উপর। মানব-ইতিহাসে কৃষি মেয়েদের আবিষ্কার। আরও নির্দিষ্টভাবে বলতে গেলে এই ব্যাপারে উপমহাদেশের মেয়েদের ভূমিকা ছিল খুবই গুরুত্বপূর্ণ। "এরেন্ ফেলস্" লিখেছেন "মেনমিনের মতে নব্য প্রস্তর যুগে কৃষি-কাজের পক্ষে উপযুক্ত পাথরের যে কুড়ুল সারা পৃথিবীময় ছড়িয়ে পড়েছিল, তা আবিষ্কার করে-ছিল ভারতবর্ষের মেয়েরাই।" [দেবী প্রসাদ চট্টোপাধ্যায় কর্তৃক রচিত লোকায়ত দর্শন থেকে উদ্ধৃত।] মেয়েরা এখানে (উপমহাদেশে) শুধুই যে সুষ্ঠুভাবে জমি খোঁড়বার পদ্ধতি বা হাতিয়ার আবিষ্কার করেছিল তাই নয়, এ পদ্ধতি কাজেও পরিণত করেছিল। এজন্যই উপমহাদেশের বিস্তীর্ণ এলাকা জুড়ে মাতৃতান্ত্রিক সমাজ প্রবল হয়ে উঠেছিল সে সময়।

আর্য আগমনের পূর্বে বাঙলাদেশে অষ্ট্রিক-ভাষী, দ্রাবিড়-ভাষী কৌমগুলিও ছিল মাতৃতান্ত্রিক। ভোট-ব্রহ্ম-ভাষীরাও তাই ছিল। আর্যরা কোন সময়ই কৃষিজীবী ছিল না তারা ছিল পশুপালক। কাজেই শিকার-জীবী স্তরের পর মাতৃতান্ত্রিক কোন পর্যায় তাদের অতিক্রম করতে হয়নি। পশুপালন ছেড়ে তারা যখন শ্রেণী-বিভক্ত সমাজে পা রাখলো তখন কৃষি সমাজের প্রধান উপজীবিকা হয়ে উঠলো ঠিকই, কিন্তু মাতৃতন্ত্রের প্রশ্ন তখন অবান্তর। কাজেই বাঙলাদেশে আর্যরা যখন প্রথম ব্যাপকভাবে বসতি স্থাপন করেছে তখন তাদের মাঝে সব বিভাগেই পুরুষ প্রাধান্য সুপ্রতি-ষ্ঠিত। এই সুপ্রতিষ্ঠিত বিধিবদ্ধ পুরুষ প্রধান সমাজের রীতি-নীতিই ক্রমে গোটা দেশে ব্যাপ্ত হয়। কিন্তু সব ব্যাপারটাই ঘটে বাইরে থেকে। ফলে আদিম সাম্যবাদী সমাজের মতোই নারী প্রধান সমাজ মরে গিয়েও মরে না। টিকে থাকে তার স্মৃতি, নানা লোকাচার।

এবার মূল কথায় আসা যাক।

বাইরে থেকে জোর করে ভাঙ্গার ফলে কৌম-সমাজের চিহ্নগুলি আজও আমাদের মাঝে কি ভাবে টিকে আছে, তা একটু তলিয়ে দেখলেই বুঝা যায়।

বিখ্যাত ঐতিহাসিক রমেশ চন্দ্র দত্ত বাঙলাদেশের কৃষকদের কথা বিচার করতে গিয়ে বলেছেন, "৩৭০ লক্ষ মানুষের মধ্যে পাঁচ লক্ষ ট্রাইব্যাল

www.pathagar.com

মানুষ এবং পঞ্চাশ লক্ষ হিন্দু-ধর্মভুক্ত ট্রাইব্যাল মানুষ, পঁচিশ লক্ষ জাত-হিন্দু এবং পাঁচ লক্ষ জাত-মুসলমানদের কথা বাদ দিলেও আমাদের পক্ষে আরো ২৮০ লক্ষের কিছু বেশী মানুষের হিসাব দেওয়া দরকার। এই ২৮০ লক্ষ মানুষকেও তাই স্থানীয় ট্রাইব্যাল মানুষদের বংশধরই মনে করা স্বাভাবিক। আর্যরা বাঙলাদেশ আক্রমণ করবার পর এ দেশে তাদের ধর্ম ব্যাপকভাবে প্রচার করেছিলেন। আদিবাসিদের মধ্যে যারা অপেক্ষাকৃত সাহসী ও দুর্ধর্ষ, তারা আত্মসমর্পণ না করে বাঙলাদেশের বনে-জঙ্গলে গিয়ে আশ্রয় নিয়েছিলো, কিন্তু অপেক্ষাকৃত দুর্বল মানুষগুলি আক্রমণ-কারীদের ধর্ম গ্রহণ করলো এবং আগের মতোই কৃষিকর্ম নিয়ে রইলো।"

রমেশ চন্দ্র দত্ত তাঁর সময়ে অর্থাৎ গত শতাব্দীর শেষে বাঙলাদেশের মানুষের যে বৈশিষ্ট্য লক্ষ করেছেন, তার উপর দাঁড়িয়েই সিদ্ধান্ত করে-ছেন। আর সেই সিদ্ধান্ত কতই না চাঞ্চল্যকর। কৌম-সমাজের বিলোপ যেভাবেই হোক না কেন, তা সুদূর অতীতের ব্যাপার। তারপর বহু শত বছর চলে গেছে, ইতিহাসেরও পট পরিবর্তন হয়েছে বার বার। কিন্তু এত কিছুর পরও বাঙলাদেশের কৃষকেরা প্রধানতঃ যে ট্রাইব্যাল মানুষদের বংশধর এই সত্যটা অতি সহজে চোখে পড়েছে ঊনবিংশ শতাব্দীতেও। একই সমাজ কাঠামোর ভিতরে পুরানো পার্থক্যের রেখাগুলি শত শত বছরের ব্যবধানেও টিকে থেকেছে—পুরোপুরি মুছে যায়নি।

কৌটিল্য ঠিক কে ছিলেন, এমন কি তিনি একান্তই কোনো ঐতি-হাসিক ব্যক্তি ছিলেন কিনা, এ নিয়ে পণ্ডিত মহল আজও কোন স্থির সিদ্ধান্তে আসতে পারেননি। তবে সাধারণতঃ ধরে নেওয়া হয় তাঁর রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক মন্ত্রণার উপরই প্রতিষ্ঠিত ছিল মৌর্য সাম্রাজ্যের ভিত। তা যদি সত্য হয় তা'হলে তিনি ছিলেন খ্রীস্ট জন্মের সওয়া তিন শ' বছর আগেকার মানুষ। সে সময়ই তিনি রাজ্যের ভিতরে বা আশে-পাশে অবস্থিত কৌমগুলি সম্পর্কে রাষ্ট্রশক্তির কর্তব্য নির্ধারণ করে গেছেন। তাঁর কথা হলো—কৌমগুলি ভেঙ্গে সে সমাজের মানুষগুলিকে নিয়ে ছোট ছোট স্বয়ংসম্পূর্ণ কৃষিমূলক গ্রামের পত্তন করতে হবে। শাসক সম্প্রদায়ও এ নীতি যে নিখুঁতভাবে অনুসরণ করেছিল তা একটু আগে উল্লিখিত তথ্য থেকে বোঝা যায়। আর এ থেকেই আমরা আমাদের ইতি-হাসের আর একটি গুরুত্বপূর্ণ অধ্যায়ের মুখোমুখি হই।

www.pathagar.com

স্বয়ংসম্পূর্ণ গ্রাম সমবায় (Village Communities) আমাদের ইতিহাসের একটি অতি গুরুত্বপূর্ণ বৈশিষ্ট্য। শুধু আমাদের ইতিহাসই বা কেন, এ বৈশিষ্ট্য গোটা উপমহাদেশের। শত শত বছর জুড়ে ইতিহাসের বহু উত্থান-পতন, সাম্রাজ্য নিয়ে রক্তক্ষয়ী যুদ্ধ প্রভৃতির ভিতরেও এই বৈশিষ্ট্য টিকে গেছে। ভাঙ্গন যা' ধরেছে তা একেবারে হাল আমলে—ইংরেজ যুগে। নির্দিষ্ট সীমার মাঝে এক একটি নিটোল ও স্বয়ংসম্পূর্ণ গ্রাম নিজেদের যাবতীয় প্রয়োজন উৎপাদন করছে। কামার-কুমার-ছুতোর-নাপিত-পুরোহিত প্রভৃতি প্রয়োজনীয় বৃত্তিগুলি বংশানুক্রমে নির্দিষ্ট। গ্রাম থেকে তারা বৃত্তি পায়, ফসলের অংশ পায়। বাদ বাকীরা কৃষি কাজ করে। তার সাথে সুতো কাটে ও কাপড় বোনে। গ্রামের প্রয়োজন মেটার পর বাড়তি যেটুকু থাকে একমাত্র সেটুকুই পণ্য হয়, তাও আবার রাজার রাজকর দেবার পর। বাকী উৎপাদন সবই গ্রাম-সমবায়ের ব্যবহারের জন্য। উৎপাদন সরল, প্রয়োনীয়ও কম। সব কিছুই যেন একটা অমোঘ প্রাকৃতিক নিয়মে বাঁধা। কখনো যদি জনসংখ্যা বেড়ে যায় তখন একই পরিকল্পনা অনুসারে নতুন গ্রামের পত্তন হয়। যুদ্ধ-বিগ্রহে বা আর কোনো কারণে কোনো গ্রাম যদি ধ্বংস হয়ে যায় তখনো ঠিক পুরানো ছাঁচেই অনেক সময় একই নামেই গ্রামটি আবার গড়ে ওঠে। আর এ ভাবেই যুগ যুগ জুড়ে একই ধারা বয়ে চলে, অব্যাহত থাকে একই ধরনের শ্রমবিভাগ, উৎপাদন পদ্ধতি, জীবনযাত্রা। ফলে, শত শত বছর জুড়ে সমাজও কার্যতঃ অপরিবর্তিত থেকে যায়।

আমাদের ইতিহাসের এই যে বৈশিষ্ট্য যা অনেক পরিমাণে পরবর্তী যুগের ইতিহাসকে বিচিত্র পরিণতির দিকে নিয়ে গেছে, অনেকে অনুমান করেন তার পিছনে লুকানো আছে কৌম-সমাজের ছায়া। কৌম-সমাজগুলি ভেঙ্গে যেভাবে তাদের ছোট ছোট দল নিয়ে কৃষিজীবী গ্রামের পত্তন করা হয় সেগুলিই কালে গ্রাম-সমবায়ের জন্ম দিয়েছে। কৌম-সমাজ স্বাভাবিক তাগিদে ভেঙ্গে যায়নি, জোর করে ভাঙ্গা হয়েছে। ফলে বিনষ্ট হয়নি কৌম-জীবনের দৃঢ় সহমর্মিতা বোধ (tribal bond) গ্রাম-সমবায়গুলি সে জন্যেই এত অপরিবর্তনীয়। আবার গ্রাম-সমবায়গুলিতে জমিচাষ মালিকানার যে ব্যবস্থা চালু ছিল তার পিছনেও প্রাচীন সাম্যবাদী সমাজের ছাপটা খুব অস্পষ্ট নয়।

www.pathagar.com

হিন্দু-সমাজে প্রচলিত জাতিভেদ প্রথা আমাদের ইতিহাসের আর একটি বৈশিষ্ট্য। জাতিভেদ প্রথার উৎস নিয়ে আজ পর্যন্ত কোন সুস্থির সর্ব জনস্বীকৃত সিদ্ধান্তে পেঁছানো সম্ভব হয়নি। তবে বিশেষ করে হিন্দু-সমাজের অন্ত্যজ শ্রেণী বা নীচের দিকে বিভিন্ন জাত সৃষ্টির পিছনে প্রাচীন কৌম-সমাজের প্রভাব যে সক্রিয় এ বিষয়ে আগেই উল্লেখ করেছি। শ্রীযুক্ত রমেশ চন্দ্র দত্তের যে মন্তব্য একটু আগে উল্লেখ করা হলো তা থেকেও এটা স্পষ্ট হয়ে ওঠে।

বাঙলাদেশে আর্যরা আসে তাদের মাঝে শ্রেণী সমাজের উদ্ভবের পর। ফলে কৌম-সমাজের যে অতীত তার সবটুকুই আর্যপূর্ব। আবার এই আর্য-পূর্বরাও সবটাই তো ঠিক এক জনধারার মানুষ নয়। অষ্ট্রিক-ভাষী, দ্রাবিড়ভাষী, ভোট-ব্রহ্ম ভাষীদের একটা বড় অংশের সবাই আর্যপূর্ব। ফলে তাদের সবাই কৃষিজীবী যৌথ-সমাজের অধিবাসী হওয়া সত্ত্বেও ব্যবহারিক-সংস্কৃতি প্রভৃতিতে কিছু কিছু পার্থক্য ছিল তাদের মাঝে। এই পার্থক্য সমেত আমাদের কৃষিজীবী কৌম-সমাজের পূর্বজদের মাঝে প্রচলিত ধ্যান-ধারণাও আজও আমাদের মানস-জগত, আচার-আচরণকে প্রভাবিত করে।

মানস জগত

বাউল-সহজিয়া সাধন-ভজন পদ্ধতি—দেহতত্ত্বের গান গ্রাম বাঙলার নিজস্ব সম্পদ। বাউল-গান আজও সম্প্রদায় নির্বিশেষে সব বাঙালীর মনেই আলোড়ন তোলে, দেহতত্ত্বের গানের আসরে মানুষ আজও ভিড় করে আসে। বাঙালী-মনে বাঙলার এই একান্ত নিজস্ব জিনিসগুলির আকর্ষণ। কিন্তু শুধু আজকের ব্যাপার নয়, এই আকর্ষণ দীর্ঘ দিনের। শুনতে অসম্ভব মনে হতে পারে, এই দীর্ঘ কাল কিন্তু দু'এক শতাব্দীর নয়, তা একেবারে আদিম কৌম-সমাজ পর্যন্ত বিস্তৃত। কারণ, বাউল-সহজিয়া সাধন-ভজন পদ্ধতির পিছনে আড়াল হয়ে আছে কৃষিজীবী পর্যায়ের কৌম-সমাজে প্রচলিত যাদু-বিশ্বাস। আরও সঠিক করে বলতে গেলে কৃষিজীবী, কৌম-সমাজে প্রচলিত যাদু-বিশ্বাসের সাথে বাউল-সহজিয়া সাধন-ভজন পদ্ধতির যোগাযোগটা একেবারে অপ্রত্যক্ষ নয়। যুগ-বদলে এ সব কিছুর আগেকার সেই তাৎপর্যটা আর নেই সত্য, তবু সম্পর্কটা কিন্তু স্পষ্ট।

www.pathagar.com

অধ্যাপক মনসুর উদ্দিন তো বাউল-সাধনা সম্পর্কে স্পষ্টই বলেছেন : এর ইতিহাস জানতে হলে প্রাচীন ভারতবর্ষের আর্য ও অনার্য অধ্যাত্ম সাধনার কথা জানা দরকার। [হারামণির ভূমিকা—মোঃ মনসুর উদ্দিন।] দেহতত্ত্বের গানও এই জাতীয় সাধন-ভজন পদ্ধতির সাথেই সম্পৃক্ত।

বাউল, সহজিয়া প্রভৃতি সাধন-ভজন পদ্ধতির সাথে বাঙলাদেশের হিন্দু-সমাজে নানাভাবে প্রচলিত তান্ত্রিক সাধনার বিভিন্ন ধ্যান-ধারণার যোগও খুব নিবিড়। বলতে গেলে এ সব কিছুর মূলই হলো তান্ত্রিক ধ্যান-ধারণা। পরযুগে তান্ত্রিক ধ্যান-ধারণা বিশিষ্ট সাধন-ভজন পদ্ধতিতে পরিণত হয়েছে, কিন্তু আদিতে তান্ত্রিক-সাধনাও কৃষিজীবী কৌম-সমাজে প্রচলিত যাদু-বিশ্বাস ও অনুষ্ঠান ছাড়া আর কিছু ছিল না।

তন্ত্র সাধনা বা তা থেকে উদ্ভূত বিভিন্ন সাধনা-ভজন পদ্ধতির প্রভাব বাঙলায় খুবই গভীর। লিখিত বাঙলা সাহিত্যের আদি নিদর্শন বৌদ্ধ দোঁহাগুলোই তার প্রমাণ। আবার এই তন্ত্র-সাধনারই একটি বিশিষ্ট অঙ্গ হলো ষটচক্র। আবার এই ষটচক্রই পরবর্তীকালের মরমীয়া সাধকদের সাধনায় স্থান করে নিয়েছে। মুসলমান মরমীয়া সাধকদের মাঝেও স্থান রয়েছে ষটচক্রেরই অনুরূপ ষড় লতিফার। আর এই ষটচক্র যে কৃষিভিত্তিক কৌম-সমাজের যাদু-বিশ্বাসের সাথে যুক্ত এ কথাটাও আজ খুবই স্পষ্ট।

বাঙলাদেশের হিন্দু-সমাজের ধর্ম-বিশ্বাসে একটি লক্ষণীয় ব্যাপার হলো দেবী প্রাধান্য। দুর্গা-কালী থেকে শুরু করে আজকের দিনে অবলুপ্ত বৌদ্ধ দেবী তারা বা জাঙ্গুলী পর্যন্ত বিস্তৃত তালিকাটি নেহাত ছোট নয়। বরঞ্চ বলতে গেলে অতি দীর্ঘ। উত্তর ভারতের অন্যান্য জায়গার সাথে এই ব্যাপারে বাঙলাদেশের হিন্দু-সমাজের পার্থক্যটাও যেন স্পষ্ট। অনুমান করা হয় বাঙালী হিন্দুর ধর্ম-বিশ্বাসের এই বৈশিষ্ট্যের পিছনে যে কারণটি লুকানো আছে তা হলো প্রাচীন কৃষিভিত্তিক কৌম-সমাজের মাতৃতন্ত্রের ছাপ।

বাঙলাদেশের প্রাচীন কৌমগুলির সবগুলির ছিল মাতৃতান্ত্রিক। মাতৃতন্ত্রের স্মৃতি তাই বাঙালী মন থেকে আজও একেবারে নিঃশেষ হয়ে যায়নি। নানা আচার-আচরণ রীতি-নীতির পিছনেও তা আড়াল হয়ে আছে। সম্পত্তির উত্তরাধিকার প্রশ্নে বাঙালী হিন্দু সমাজের প্রচলিত যে নিয়ম-কানুন তাতে মেয়েরা সম্পত্তির অধিকার থেকে একেবারে বঞ্চিত নয়। উত্তর ভারতের

www.pathagar.com

হিন্দু-সমাজের সাথে এই প্রশ্নে বাঙালী হিন্দু-সমাজের পার্থক্যটাও লক্ষণীয়। আর্য কৌমগুলি পশুপালনের স্তরে কোন সময়ই মাতৃতান্ত্রিক ছিল না। সমাজে শ্রেণী বিভাগের পর মাতৃতন্ত্রের তো প্রশ্নই উঠতে পারে না। কাজেই আর্য প্রভাব যেখানে বেশী সেখানে শ্রেণী-সমাজের আবির্ভাবের আগে বা পরে মেয়েরা সবসময়ই অধিকার-বঞ্চিতা। আর বাঙলাদেশের সমাজ থেকে প্রাচীন মাতৃতান্ত্রিক কৌম-সমাজের স্মৃতি একেবারে নিঃশেষ হয়ে যায়নি বলেই পরবর্তী কালের শাস্ত্রকারদের নিয়ম-কানুনের বেড়াজাল সত্ত্বেও সম্পত্তির উত্তরাধিকার প্রশ্নে মেয়েদের একেবারে অধিকার বঞ্চিতা করা যায়নি। জীমূতবাহনের গ্রন্থই তার প্রমাণ। বাঙালী মামা বাড়ীতে ভাগ্নের অধিকার ও স্থান, বাঙালী হিন্দুর বিয়েতে মেয়েকে সম্প্রদানের ব্যাপারে মামার অধিকার, অন্নপ্রাশনে ভাগ্নেকে মামার মুখে ভাত দেওয়ার অধিকার ইত্যাদি রীতি বা আচারও একই উৎসের সাথে সম্পৃক্ত কিনা সেটাও চিন্তা করে দেখা দরকার।

বাঙালী সমাজে কৃষিজীবী মাতৃতান্ত্রিক কৌম-সমাজের ছাপ ভুরি ভুরি। এখানে মাত্র অল্প ক'টিরই উল্লেখ করা হলো। অসমাপ্ত বিলোপের জন্যে ট্রাইব্যালসমাজ কিভাবে আজও আমাদের সমাজ-গঠন, মানস-জীবনকে প্রভাবিত করছে উক্ত দৃষ্টান্তগুলিতে অন্ততঃ সেটুকু স্পষ্ট হয়ে উঠেছে। আর একটি দৃষ্টান্ত উল্লেখ করে এই প্রসংগ শেষ করবো।

দৃষ্টান্তটি বাঙালী হিন্দু-সমাজের ব্রত অনুষ্ঠান সম্পর্কে। ঠিক শাস্ত্রসম্মত অনুষ্ঠান নয়, তবু ব্রত-অনুষ্ঠান আজকাল কার্যতঃ ধর্মানুষ্ঠানেই পরিণত হয়েছে। হারিয়ে গেছে তার আদি তাৎপর্য।

ব্রত-অনুষ্ঠানে প্রধান ভূমিকা মেয়েদের। মেয়েরা আলপনা আঁকে, ব্রতের উপাচার জোগাড় করে, অনুষ্ঠান করে কামনা করে নির্দিষ্ট আকাঙ্ক্ষার সাফল্য। মনে করে এ-ভাবেই তাদের কামনা সফল হয়ে উঠবে, ধনে-জনে ঘর তাদের পূর্ণ হবে, হেসে উঠবে ক্ষেতের ফসল।

একটু লক্ষ্য করলেই বাঙালী হিন্দু-সমাজের এই ব্রত অনুষ্ঠানের সাথে কৃষিজীবী কৌম-সমাজের প্রচলিত যাদু-বিশ্বাসের সম্পর্কটা চোখে পড়ে। আজ যা ব্রত-অনুষ্ঠান, আদিতে কৃষিজীবী কৌম-সমাজে তাই ছিল যাদু অনুষ্ঠান। অতীতের তাৎপর্যটুকু আজ হারিয়ে গেছে, টিকে আছে

www.pathagar.com

শুধু, খোলসটুকু। তার উপরেও সময়ের প্রলেপ পড়েছে। তবু মূলের সাথে সম্পর্কটি লক্ষণীয়।

মানস-জগতে প্রাচীন কৌম-সমাজের প্রভাব সম্পর্কে আলোচনা করতে গিয়ে যে ক'টা দৃষ্টান্ত উল্লেখ করেছি, তার সবগুলিই বাঙালী হিন্দু-সমাজের প্রচলিত ধর্ম-বিশ্বাস বা রীতি-নীতি থেকে নে'য়া। এই প্রসংগে উত্তর-ভারতের হিন্দু-সমাজের সাথে বাঙালী হিন্দু-সমাজের পার্থক্যও উল্লেখ করেছি। ধর্ম-বিশ্বাসে না হোক, রীতি-নীতি বা প্রচলিত লোকাচারে বাঙালী-মুসলমানদের সাথেও উত্তর-ভারতের মুসলমানদের পার্থক্য বিদ্যমান। বাঙালী-মুসলমানদের এই যে বিশিষ্টতা তা যে বাঙলাদেশের দেশজ প্রভাবের ফল এ বিষয়ে সন্দেহ নেই। তবে এই অধ্যায়ে যে আলোচনা করা হলো সেই দৃষ্টিতে এই বিশিষ্টতার কোন আলোচনা আজও হয়নি। এতে বাঙালী-মুসলমান-সমাজও যে প্রাচীন কৌম-সমাজে প্রচলিত রীতি-নীতি বা অনুষ্ঠান থেকে মুক্ত নয় তা তো বাউল-সাধনা সম্পর্কে আলোচনা করতে গিয়ে দেখেছি। এই জাতীয় মরমী সাধনার আরও যে সব রূপ প্রচলিত আছে তার সাথে বা বাঙালী মুসলমান সমাজে প্রচলিত উপকথা বা কাহিনীতে মেয়েদের যে স্থান দেখা যায় তার সাথে মাতৃতান্ত্রিক কৃষিজীবী কৌম-সমাজের কোন সম্পর্ক আছে কিনা তা আজও পণ্ডিত ব্যক্তিদের গবেষণার অপেক্ষা রাখে। এ দিকে সুধীজনের দৃষ্টি আকর্ষণ করছি। কারণ, আমাদের কৌম-সমাজের যে অতীত তাকে আজও আমরা এড়িয়ে যেতে পারবো না। নানাভাবে তার ছাপ আজও আমাদের মধ্যে বিদ্যমান। আমাদের এই অতীত কৌম-সমাজের বিলোপ যেমন আমাদের অতীত ইতিহাসে বহু বিশিষ্টতা এনে দিয়েছে ঠিক তেমনি আজও তা একেবারে নিঃশেষ হয়ে যায়নি। সে জন্যেই আমাদের কৌম অতীতটা ভালো করে জানা দরকার, জানা দরকার সেই অতীতের ভাঙ্গনের ইতিহাস ও রূপ। সমাজে প্রচলিত বহু রীতি-নীতি, ইতিহাসের বহু বিশিষ্টতাকে এই প্রেক্ষিতে বিচার করে দেখা দরকার। তা না হলে বাঙলাদেশ ও বাঙালী সম্পর্কে প্রতিটি বিচারই অসম্পূর্ণ থেকে যাবে। আমাদের এই অতীত তো শুধু মৃত অতীত নয়, বর্তমানেও তার ছায়া খুবই বাস্তবভাবে বিদ্যমান। সে জন্যেই আমাদের এই অতীত আমাদের কাছে এত গুরুত্বপূর্ণ।

www.pathagar.com

পাঁচ

সুচির-কালের বাঙলা

মহাভারতের এবং মৎস্যপুরানের পুরাকাহিনীতে দেখা যায় বলিরাজা ছিলেন অপুত্রক। রাজার এত নাম-ডাক, এত প্রসিদ্ধি, কিন্তু বংশ রক্ষার উপায় নেই। নানাভাবে চেষ্টা করেও যখন কিছুতেই কিছু হলো না তখন অনন্যোপায় হয়ে রাজা বিখ্যাত তাপস দীর্ঘতমাসের শরণাপন্ন হলেন। দীর্ঘতমাস তখন গঙ্গার বুকে ভেলায় ভেসে বেড়াত বেড়াতে বলি রাজার রাজ্যে এসে ঠেকেছেন। রাজার আকুতিতে মুনির মন টললো। অন্ধ মুনির ঔরসে রাণীর গর্ভে জন্ম নিল পাঁচ পুত্র : অঙ্গ, বঙ্গ, কলিঙ্গ, পুণ্ড্র ও সুহ্ম আর এদেরই নামে এদের বংশ বৃদ্ধির সাথে গড়ে উঠলো পর যুগের পাঁচটি বিখ্যাত জনপদ।

উপরে বর্ণিত কাহিনী নেহাতই পুরাকাহিনী। তবে সুহ্ম, বঙ্গ, পুণ্ড্র, রাঢ়—এগুলি হলো প্রাচীন বাঙলার বিখ্যাত জনপদ। এই জনপদ-গুলির সমবায়েই পরযুগে গড়ে উঠেছে আধুনিক বাঙলাদেশ। অনুমান করা হয় পুণ্ড্র, সুহ্ম, বঙ্গ, রাঢ় প্রভৃতি নামগুলো হলো মূলতঃ কৌম-নাম। কৌম-নাম থেকেই সৃষ্টি হয়েছে জনপদ-নাম। পূর্বোক্ত পুরাকাহিনীও একই ইংগিত দেয়। রাঢ় নামে এক দুর্দ্ধর্ষ কৌমের তো উল্লেখই পাওয়া যায় প্রাচীন সাহিত্যে।

যা হোক, রাঢ়, সুহ্ম, পুণ্ড্র, বঙ্গ নামে কতকগুলি প্রাচীন কৌম নাম থেকেই জনপদ-নামের সৃষ্টি হোক বা না হোক, এইসব এলাকায় যারা বাস করতো সেই সব মানুষের কোন পরিচয় প্রাচীন আর্য সাহিত্যে তেমন না পাওয়া গেলেও অন্যান্য সূত্রে তার কিছু কিছু সন্ধান মেলে। এ থেকে দেখা যায় খ্রীস্ট-পূর্ব-অষ্টম-সপ্তম শতকেই এ-সব অঞ্চলের মানুষেরা বেশ পরাক্রান্ত হয়ে উঠেছে। সমুদ্র পাড়ি দিয়ে তারা বসতি স্থাপন করেছে দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার বিভিন্ন দেশে।

অবশ্য দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার বিভিন্ন দেশের সাথে সমুদ্রপথে এ দেশ-বাসীর যোগাযোগ বহু প্রাচীন। বলতে গেলে প্রায় স্মরণাতীত কাল থেকে

www.pathagar.com

চলে আসছে। কাজেই পরযুগে কৌমগুলির যখন আরও শক্তি সঞ্চয় করেছে তখন দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার সাথে যোগাযোগ যে বাড়বে তাতে অবাক হবার কিছু নেই।

আন্নাম বা থাইল্যান্ডের প্রাচীন পুরাকাহিনীতে এই জাতীয় যোগাযোগের উল্লেখ পাওয়া যায়। দেখা যায় খ্রীস্ট জন্মের সাত শ' বছর আগে ভারতের বঙ-লঙ এলাকার লোকেরা আন্নামে বসতি স্থাপন করে। এদেরই প্রধান লাক-লোম আন্নামেও প্রধান হয়ে বসে। বিয়ে থা করে স্থায়ী বাসিন্দা হয়ে যায়। খ্রীস্ট জন্মের প্রায় আড়াই'শ বছর আগ পর্যন্ত বঙ-লঙ বাসীরা আন্নামে প্রাধান্য বিস্তার করেছিল। পরযুগে মগধের ক্ষত্রিয়রা এসে তাদের সরিয়ে দেয়। আন্নামে বৌদ্ধ ধর্মের প্রসার হয়।

এই কাহিনী কতদূর ঐতিহাসিক তা বলার উপায় নেই। কোন কোন চীনা গ্রন্থে নাকি এর উল্লেখ আছে। তবে নিছক কাহিনীই হোক আর নাই হোক, ভারতের বঙ-লঙ এলাকার সাথে আন্নামের সম্পর্ক যে ঘনিষ্ঠ ছিল তা বোঝা যায়। অধ্যাপক বিজয়চন্দ্র মজুমদারের মতে বঙ-লঙ আর বাঙলার মধ্যে কোন পার্থক্য নেই। মূলে দু'টি শব্দই এক। বাঙলা শব্দের উৎপত্তি কি তা নিয়ে আর একটি অভিমত ইতিপূর্বে উল্লিখিত হয়েছে। আর এই বঙ-লঙ এলাকার লোকদেরই বলা হতো বঙ বা বঙ্গ।

মহাভারত, রামায়ণ বা ধর্মশাস্ত্রসমূহ আরও পরবর্তী যুগের। এই সব গ্রন্থের নানাস্থানে বার বার এই অঞ্চলের বিভিন্ন জনপদের উল্লেখ দেখা যায়। বঙ্গ-প্রধান ও তাঁর সৈন্যবাহিনী তো কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধে কৌরব বাহিনীর পক্ষ হয়ে লড়াই করেছে। একইভাবে অন্যান্য জনপদবাসীদেরও উল্লেখ পাওয়া যায়। ভাগবত পুরাণে পাওয়া যায় সুহ্মবাসীদের কথা। মহাভারতের সভা-পর্বে পুণ্ড্রদের তো ক্ষত্রিয়-বংশ জাত বলেই উল্লেখ করা হয়েছে।

তবে এ সবই হলো প্রমাণ-সিদ্ধ ইতিহাসের যুগের আগের কথা। ঐতিহাসিক যুগের সূচনার দিকে এইসব জনপদের উল্লেখ দেখা যায় টলেমীর ভূগোলে, পেরিপ্লাস অফ দি এরিথ্রিয়ান সি ও মিলিন্দ পঞ্হ নামক গ্রন্থে এবং নাগার্জুনকোণ্ডার শিলালেখে।

মিলিন্দ-পঞ্হ গ্রন্থে সমুদ্র-যাত্রী জাতিসমূহের তালিকার মধ্যে বঙ্গদেশের কথা উল্লেখ করা হয়েছে। অনেক পর যুগের কথা, মহাকবি

www.pathagar.com

কালিদাসের উল্লেখ থেকেও জানা যায়, তাঁর সময়েও বঙ্গের নৌবাহিনী বিখ্যাত ছিল। 'নৌসাধনোদ্যত' বাঙালীদের জয় করতে কালিদাসের নায়ক রঘুকে রীতিমতো বেগ পেতে হয়েছিল।

অবশ্য কালিদাসের সময় বঙ্গ বলতে যে ভূখণ্ডটুকু বোঝাত মিলিন্দ পঞ্হ গ্রন্থের বঙ্গের সীমারেখা যে ঠিক তার অনুরূপ ছিল তা নয়। ঐতিহাসিক কালে বার বার এই জনপদগুলির সীমারেখা পরিবর্তিত হয়েছে। পুরানো জনপদের অংশ বিশেষ নতুন নামে পরিচিত হয়েছে সময় সময়। এবার সে সম্পর্কে দু'-একটি কথা।

গৌড়

ঠিক পুরো বাঙলাদেশ না হলেও এক সময় গৌড় বলতে বাঙলাদেশের অনেকখানি, এমন কি অনেক সময় তার চাইতেও অনেক বিস্তৃত অঞ্চল বোঝাত। গোটা অঞ্চলটাকে অভিহিত করা হ'ত গৌড়বঙ্গ নামে। সে জন্যেই গৌড়ের কথা সবার আগে।

গৌড় বলতে ঠিক কোন্ অঞ্চলটা বোঝাত এ নিয়ে মতভেদ আছে। আর যে এলাকা গৌড় বলে অভিহিত হতো কেনই বা সে অঞ্চল সে নামে অভিহিত হতে শুরু করে আজ পর্যন্ত সেটাও সঠিকভাবে জানা হয়নি।

তবে গৌড় নামটা যে যথেষ্ট প্রাচীন এ নিয়ে সন্দেহ নেই। পাণিনির ব্যাকরণে গৌড় দেশে তৈরী বিভিন্ন জিনিসের উল্লেখ আছে। উল্লেখ আছে বাৎস্যায়নেও। ষষ্ঠ শতকে লেখা বরাহ-মিহিরের বৃহৎ সংহিতায় দেখা যায় গৌড় অন্যান্য জনপদ যথা পুণ্ড্র, বঙ্গ, সমতট থেকে আলাদা পৃথক একটি জনপদ। ভবিষ্যৎ পুরাণে গৌড়ের স্থান নির্দেশ করেছে আধুনিক বর্ধমানের উত্তরে, পদ্মার দক্ষিণে। শশাঙ্কের রাজধানী কর্ণসুবর্ণের অবস্থিতিও ছিল এই অঞ্চলে। আর শুধু বা শশাঙ্কই কেন, পরবর্তী কালে আরও অনেকের রাজধানী ছিল এই গৌড়ে। নদী শুকিয়ে যাওয়ায় পরে এই শহর পরিত্যক্ত হয়।

পাল রাজাদের আমলে গৌড়ের নাম-ডাক সবচেয়ে বেশী ছিল। উত্তর ভারতের বিস্তীর্ণ অঞ্চল তখন গৌড়ের অন্তর্গত। সাম্রাজ্যের কেন্দ্রস্থল হওয়ায় প্রতাপ তার অপ্রতিহত।

www.pathagar.com

পরবর্তীকালে পাল সাম্রাজ্যের ভাগ্য পরিবর্তনের সাথে গৌড়েরও ভাগ্য পরিবর্তিত হয়। গৌড়ের সীমা সীমাবদ্ধ হয়ে আসে। ত্রয়োদশ-চতুর্দশ শতকের জৈন লেখকদের লেখা থেকে দেখা যায়, সীমাবদ্ধ হলেও তখনো গৌড় জনপদের অস্তিত্ব ছিল। আধুনিক মালদহ, মুর্শিদাবাদ, বীরভূম ও বর্ধমানের কিছু অংশ এই ছিল প্রাচীন গৌড় জনপদের সীমানা।

বঙ্গ

বঙ্গ খুবই প্রাচীন দেশ। প্রাচীন পুঁথিতে এর উল্লেখ আছে। উল্লেখ আছে মহাভারতেও। চন্দ্র রাজাদের মেহেররৌলী শিলালেখে, চালুক্য রাজ-বংশের ইতিবৃত্তে বঙ্গ জনপদের উল্লেখ আছে।

বঙ্গ ছিল পুণ্ড্র, তাম্রলিপ্ত, সুহ্মের সংলগ্ন দেশ। পরবর্তী সাক্ষ্য-প্রমাণ থেকে মনে হয় গঙ্গা ভাগীরথীই ছিল বঙ্গের পশ্চিম সীমা। যশোর এবং তার চার-পাশের অঞ্চলসমূহও এক সময় বঙ্গ থেকে স্বতন্ত্রভাবে উপবঙ্গ নামে অভিহিত হত। মধ্যযুগে রচিত 'দিগ্বিজয় প্রকাশে' এ বিষয়ে উল্লেখ আছে।

পাল বংশ যখন ক্ষীণবল তখন বঙ্গ জনপদ দু'ভাগে বিভক্ত, উত্তর-বঙ্গ এবং দক্ষিণ বা অনুত্তর বঙ্গ। উত্তরাঞ্চলের উত্তর সীমা ছিল পদ্মা, দক্ষিণের বদ্বীপ অঞ্চল ছিল অনুত্তর বঙ্গ। কুমারপালদের মন্ত্রী বৈদ্যবেদের কমৌলি তাম্রশাসনে অনুত্তর বঙ্গ সুস্পষ্টভাবে উল্লিখিত হয়েছে।

আরও পরবর্তীকালে কেশব সেন-বিশ্বরূপ সেনের আমলেও বঙ্গের দু'টি বিভাগ। তবে এবার নাম আলাদা। বর্তমান বিক্রমপুর পরগণাও তার সাথে আধুনিক ইদিলপুর পরগণার কিয়দংশ নিয়ে ছিল বিক্রমপুর ভাগ। অপর ভাগের নাম ছিল নাব্যমণ্ডল। বর্তমান বরিশাল জেলা ও আরও পূর্বদিকে সমুদ্র পর্যন্ত বিস্তৃত অঞ্চলের নাম ছিল নাব্যমণ্ডল। মেঘনার সঙ্গম মুখও ছিল এই নাব্যমণ্ডলের অন্তর্গত।

সমতট

সমুদ্রগুপ্তের এলাহাবাদ স্তম্ভ-গাত্রে খোদিত লিপিতে এই নামের জনপদের উল্লেখ দেখা যায়। ষষ্ঠ শতকে রচিত পুঁথি 'বৃহৎ সংহিতায়' আলাদাভাবে এই জনপদের উল্লেখ বিদ্যমান। ইউ এন থসাঙ যে বিবরণ

www.pathagar.com

দিয়ে গেছেন তা থেকে দেখা যায় সমতট অঞ্চলটা ছিল আর্দ্র নিম্নভূমি। অবস্থান ছিল কামরূপের দক্ষিণে। সপ্তম থেকে দ্বাদশ শতক পর্যন্ত বর্তমান ত্রিপুরা জেলা ছিল সমতটের অন্যতম অংশ। একসময় এই জনপদের পশ্চিম সীমা চব্বিশ পরগণার খাড়ি পরগণা পর্যন্ত বিস্তৃত ছিল। ভাগীরথীর পূর্বতীর থেকে শুরু করে মেঘনা মোহনা পর্যন্ত সমুদ্রকুলবর্তী ভূখণ্ডকেই খুব সম্ভবতঃ বলা হয় সমস্ত।

হরিকেল

চীনা পরিব্রাজক ই-ৎসিঙ বলেছেন, হরিকেল ছিল পূর্ব-ভারতের প্রান্ত সীমায়। পূর্ব-বাংলার চন্দ্র রাজবংশের বিবরণ থেকে দেখা যায় চন্দ্রদ্বীপের ত্রৈলোক্য চন্দ্র ছিলেন হরিকেল সম্রাটের প্রধান সহায়। এই সময় থেকেই হরিকেলকে বঙ্গের অন্তর্ভুক্ত বলে ধরা হয়। হেমচন্দ্র হরিকেল নগরীকে বঙ্গের সঙ্গে অভিন্ন বলে উল্লেখ করেছেন। আবার বৌদ্ধ গ্রন্থ মঞ্জুশ্রী-মূলকল্পে আলাদা আলাদাভাবে হরিকেল, বঙ্গ সমতটের উল্লেখ আছে। আবার কোন কোন পুঁথিতে দেখা যায় এক সময় হরিকেল বর্তমান শ্রীহট্ট পর্যন্ত বিস্তৃত ছিল। অনেকে আবার শুধু শ্রীহট্টের সাথে হরিকেলকে অভিন্ন বলে উল্লেখ করেছেন।

চন্দ্রদ্বীপ

রামপাল তাম্রশাসনে ত্রৈলোক্য চন্দ্রের শাসনাধীন ভূখণ্ডরূপে চন্দ্রদ্বীপের উল্লেখ আছে। 'আইন-ই-আকবরী' গ্রন্থে বাকলা পরগণা বর্তমান বরিশাল জেলার অন্তর্গত। মধ্যযুগে চন্দ্রদ্বীপ ছিল বর্তমান বরিশাল জেলার অংশ বিশেষের মাঝে সীমাবদ্ধ একটি নামকরা জায়গা।

বঙ্গাল

দক্ষিণ ভারতের বিভিন্ন লিপি এবং শামস্-ই-সিরাজ আফিফ লিখিত 'তারিখ-ই-ফিরোজ শাহীতে' বঙ্গ এবং বঙ্গাল এই দু'টো নামই আলাদাভাবে উল্লিখিত হয়েছে। খুব সম্ভবতঃ এই বঙ্গাল থেকেই আকবরের সময় গোটা সুবার নাম হয়েছিল সুবা-বাঙলা।

ময়নামতি-গোপীচাঁদের কাহিনীতে এক জায়গায় আছে 'ভাটি হইতে আইল বঙ্গাল লম্বা লম্বা দাড়ি'। ভাটি অঞ্চলের সাথে বঙ্গালবাসীদের এই

www.pathagar.com

যোগাযোগ শুধু এ ক্ষেত্রে নয় আরও বিভিন্ন জায়গায় দেখা গেছে। আর ভাটি বলতে যে বাখরগঞ্জ ও খুলনা জেলার সমুদ্রতটশায়ী অঞ্চলকে বোঝাত এ কথাও সর্বজনবিদিত। বস্তুতঃপক্ষে একাদশ শতকে বঙ্গাল বলতে এই অঞ্চলকে বোঝাত। এ সময় দক্ষিণ রাঢ়ের পরেই ছিল বঙ্গাল দেশ, আর দু'য়ের মাঝে সীমানা ছিল গঙ্গা-ভাগীরথী।

পুণ্ড্র ও বরেন্দ্রী

বৈদিক সাহিত্যে পুণ্ড্র জাতির উল্লেখ আছে। মহাভারতের দিগ্বিজয় পর্বে বলা হয়েছে—এই পুণ্ড্র জাতি আধুনিক মুঙ্গেরের পূর্বদিকে বাস করতো, রাজত্ব করতো কোশী নদীর উপকূলে। পরবর্তী কালে গুপ্ত যুগের বিভিন্ন লিপি ও চীনা পরিব্রাজকদের লেখা থেকে বোঝা যায় পুণ্ড্র জাতির বাসস্থান পুণ্ড্রবর্দ্ধন আর বর্তমান উত্তর বাঙলা এক জায়গা।

বরেন্দ্রী বা বরেন্দ্র মণ্ডল পুণ্ড্রবর্দ্ধন জনপদের সর্বাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ এলাকা। জনপদের প্রধান শহর, মৌর্য ও গুপ্ত আমলে প্রাদেশিক শাসন-কর্তার কেন্দ্র পুণ্ড্র বর্দ্ধনপুর বা পুণ্ড্রনগরের অবস্থানও ছিল এই বরেন্দ্রী এলাকায়। এই এলাকার অবস্থান সম্পর্কে বলতে গিয়ে সন্ধ্যাকর নন্দীর রামচরিতে বলা হয়েছে, গঙ্গা আর করতোয়ার মধ্যে যে ভূখণ্ড, বরেন্দ্রী ছিল তারই নাম। ভারতীয় সাহিত্য ও বিভিন্ন শিলালিপি থেকে জানা যায়, আধুনিক রাজশাহী, দিনাজপুর, বগুড়া জেলার অনেকখানি এই বরেন্দ্রীর অন্তর্গত ছিল। বর্তমান পাবনা জেলাও বরেন্দ্রীর অন্তর্গত ছিল বলে অনেকে অনুমান করেন।

বাঙলার ইতিহাসে পুণ্ড্রবর্দ্ধন-জনপদ ও বরেন্দ্রী—এই দুটি নামই বিখ্যাত। সাধারণতঃ একেবারে রাজমহল গঙ্গা থেকে শুরু করে করতোয়া পর্যন্ত বিরাট ভূ-ভাগই পুণ্ড্রবর্দ্ধন নামে প্রসিদ্ধ ছিল। ক্রমে রাজনৈতিক গুরুত্ব যত বেড়েছে জনপদের সীমানাও পরিবর্তিত হয়েছে একইভাবে। সেন আমলে তো পুণ্ড্রবর্দ্ধন পদ্মা পেরিয়ে একেবারে খাড়ি বিষয় (বর্তমান খাড়ি পরগণা) ও ঢাকা বাখরগঞ্জের সমুদ্রতীর পর্যন্ত বিস্তৃত ছিল। তবে এ সবই ছিল মূল পুণ্ড্রবর্দ্ধনের বিস্তৃতি। মূল ভূখণ্ড বলতে কোন এলাকা বোঝায়, তা আমরা একটু আগেই আলোচনা করেছি। এবার অন্য জনপদের কথা।

www.pathagar.com

রাঢ়

রাঢ়ের প্রথম উল্লেখ পাওয়া যায় জৈন পুঁথি আচারঙ্গ সূত্রে। জনপদের উত্তরতম সীমায় গঙ্গা-ভাগীরথী, পূর্ব সীমায়ও নদী। মাঝের অংশটুকুই রাঢ়-জনপদ।

রাঢ়ের দুই ভাগ ঃ সুহ্মভূমি ও বজ্রভূমি।

বর্তমান বর্ধমানের দক্ষিণাংশ হুগলী জেলার বহুলাংশ ও হাওড়া জেলাই প্রাচীন সুহ্ম জনপদ। পরবর্তীকালে এই অঞ্চল দক্ষিণ রাঢ় নামে পরিচিত হয়েছিল।

অজয় নদ ছিল রাঢ়ের দুই বিভাগের মাঝে সীমানা। অজয় নদের উত্তর দিকে রাঢ়ের অন্তর্গত যে ভূভাগ তারই নাম উত্তর রাঢ় বা বজ্রভূমি। সাধারণভাবে উত্তর রাঢ়ের উত্তর সীমা ছিল রাজমহল, তবু অনেক সময় এই সীমানারও পরিবর্তন হয়েছে, তবে সে পরিবর্তন ছিল নেহাতই ক্ষণস্থায়ী। পরে তা আবার পরিবর্তিত হয়েছে।

রাঢ়ের রাজধানী ছিল কোটিবর্ষে। যতদূর অনুমান করা যায়, দিনাজপুর জেলার যেখানে আধুনিক বাণগ্রাম নামক গ্রাম, সে জায়গায়ই ছিল প্রাচীন রাঢ়ের রাজধানী কোটিবর্ষ।

তাম্র লিপ্তি

প্রাচীন বাঙলার প্রসিদ্ধ বন্দর হিসেবে বিখ্যাত এই বন্দরের প্রথম উল্লেখ পাওয়া যায় মহাভারতে, ভীমের দিগ্বিজয় প্রসংগে। এখানে তাম্রলিপ্তি জনপদ অন্যান্য জনপদ থেকে স্বতন্ত্রভাবে উল্লিখিত হয়েছে। আবার কখনো অন্তর্ভুক্ত হয়েছে দণ্ডভুক্তি জনপদে। তবু বর্তমান মেদিনীপুর জেলার তমলুক এলাকাই ছিল তাম্রলিপ্তি জনপদের কেন্দ্রস্থল। পেরিপ্লাস গ্রন্থে এবং টলেমি, ফাহিয়ান, ইউ এন-থসাঙ ও ই-ৎসিঙের বিবরণে তাম্রলিপ্তি বন্দরের বর্ণনা আছে।

অখণ্ড বাঙলাদেশ

প্রাচীনতম ঐতিহাসিক কাল থেকে শুরু করে খ্রীস্ট জন্মের দু'শ সাত'শ বছর পর্যন্ত বাঙলাদেশ বিভক্ত ছিল বিভিন্ন জনপদে। সপ্তম শতকের গোড়ার দিকে উত্তর ভারতে যখন হর্ষবর্দ্ধন রাজত্ব করছেন সে সময়

www.pathagar.com

গৌড়ের রাজা হলেন শশাংক। তাঁর সময় এবং পরবর্তী কালে পাল আমলে বাঙলাদেশ সর্বপ্রথম এক রাষ্ট্রীয় ঐক্যলাভ করে। তখন বিভিন্ন জনপদ পরস্পরের ভিতর যেন বিলীন হয়ে যাচ্ছিল। ক্রমে প্রধান হয়ে উঠেছিল তিনটি জনপদ—পুণ্ড্র বা পুণ্ড্রবর্দ্ধন, গৌড় ও বঙ্গ।

শশাংকের আমলেই প্রথম গোটা বাঙলাদেশকে এক নামে অভিহিত করার প্রচেষ্টা দেখা যায়। শশাংকের রাজত্ব শুধু গৌড়ে সীমাবদ্ধ ছিল না। তবু তিনি গৌড়েশ্বর বলে নিজের পরিচয় দিলেন। পাল রাজাদের বেলায়ও একই ব্যাপার। সমগ্র পশ্চিম-বঙ্গের অধীশ্বর হওয়া সত্ত্বেও পাল রাজারাও গৌড়াধিপতি বলে খ্যাত ছিলেন। পরবর্তীকালেও গৌড় নামে বাঙলা-দেশের অখণ্ড জনপদ সত্তা দেখানোর চেষ্টা হয়েছে। বাঙলার বাইরেও বাঙালী মাত্রই এক সময় গৌড়বাসী বলে পরিচিত হয়েছিলেন। আর এ ভাবেই জনপদ নির্বিশেষে সমস্ত দেশটাকে এক নামে বেঁধে দেবার চেষ্টা চলেছিল। ক্রমে আকার নিচ্ছিল গোটা দেশের এক অখণ্ড সত্তা।

মোগল আমলে আকবরের সময় থেকে এই অখণ্ড সত্তা সুবা বাঙলা নামে অভিহিত হতে শুরু করে। জনপদসমূহের স্বতন্ত্র অস্তিত্ব বিলুপ্ত হয়ে গড়ে ওঠে বাঙলাদেশ।

www.pathagar.com

ছয়

"ইতিপূর্বে বিরাজমান সমাজসমূহের ইতিহাস হলো শ্রেণীসংগ্রামের ইতিহাস।"—মার্কস।

আমরা ইতিহাস সম্পর্কে আলোচনা করছি। বিজ্ঞানের বিভিন্ন শাখার মত ইতিহাসও একটি বিজ্ঞান। বাঙলাদেশের মূল ইতিহাসের আলোচনা শুরু করার আগে এবার সে সম্পর্কে দু'-চারটি কথা।

সভ্যতার যুগ থেকে আজ পর্যন্ত মানব-সমাজের ইতিহাস হলো শ্রেণী সংগ্রামের ইতিহাস। সভ্যতার অগ্রগতি, উৎপাদন যন্ত্রের অগ্রগতি, এক কথায় ইতিহাসের অগ্রগতির মূলে হলো শ্রেণী-সংগ্রাম। কথাটা হঠাৎ করে বেখাপ্পা শোনাতে পারে। তবু এটাই সত্য। সভ্যতার যুগ থেকে শোষকের বিরুদ্ধে, সমাজের মুষ্টিমেয় উচ্চবিত্তের বিরুদ্ধে বঞ্চিতের সংগ্রামের ভিতরেই সমাজ তথা ইতিহাসের অগ্রগমনের চাবিকাঠি নিহিত। কাজেই ইতিহাস দু-একজন মহদাশয় ব্যক্তির ক্রিয়া-কলাপ বা রাজবংশের ইতিবৃত্তের ইতিহাস নয়। যারা শ্রম করে অথচ শ্রমের ফল থেকে বঞ্চিত হয়, তাদের জীবনধারণ ও উৎপাদন পদ্ধতি, সমাজ কাঠামোর গড়ন, সমাজে প্রচলিত চিন্তাধারা ধ্যান-ধারণার রূপ ও বিভিন্ন সমাজ শ্রেণীগুলির মধ্যে পারস্পরিক সম্পর্কের কাহিনী প্রভৃতিই হলো ইতিহাসের উপজীব্য। আর সব কিছুর ভিতর দিয়ে, কখনো অন্তঃসলিলা ফল্গুধারার মতো, আবার কখনো বা বর্ষা-সমাগমে দুকূলপ্লাবী স্ফীতকায়া স্রোতস্বিনীর মতো কি ভাবে শ্রেণী সংগ্রামের মূল সূত্রটি নিয়ত বয়ে চলেছে, কি ভাবে প্রগতির মূল ধারা এগিয়ে চলেছে, সেটি বের করে এনে সবার সামনে উপস্থিত করার দায়িত্ব হলো ঐতিহাসিকের। ঐতিহাসিক জটিল ঘটনাবলীর আবর্তের ভিতর থেকে মূল সূত্রটি বার করে আনে। শ্রেণী সংগ্রামের মূল ধারাটি স্পষ্ট করে তোলে আর এ ভাবেই ইতিহাসের মূল সূত্রটি প্রতিভাত হয়ে ওঠে, ইতিহাস বিজ্ঞান হয়ে ওঠে।

বাঙলাদেশ তথা বাঙালীর ইতিহাসও ইতিহাস-বিজ্ঞানের এই আলোকে বিচার করা দরকার। মুস্কিল হলো এ ব্যাপারে শুধু যে তথ্যেরই অভাব

www.pathagar.com

তাই নয়, এই দৃষ্টিকোণ থেকে বাঙলা তথা বাঙালীর ইতিহাস পুনর্গঠনের কোন প্রচেষ্টাই আজ পর্যন্ত হয়নি। ফলে আমাদের অতীত আজ পর্যন্ত রাজবংশের উত্থান-পতনের ইতিবৃত্তেই রয়ে গেছে, অজানা রয়ে গেছে, তার প্রকৃত স্বরূপ।

যা আজ পর্যন্ত অজানা, যে বিষয়ে তথ্য নেহাতই অপ্রতুল, সে ব্যাপারে কোনো কিছু বলতে যাওয়া আঁধারে ঢিল ছোঁড়ার মতোই বিপজ্জনক। ফস্‌কে যাবার সম্ভাবনা ষোল আনা। তবু সে সম্বন্ধে দু-চারটি কথা বলে এগুবার চেষ্টা করবো।

বৃটিশ-শাসন এ দেশে চেপে বসার আগ পর্যন্ত স্বয়ংসম্পূর্ণ গ্রাম উপ-মহাদেশের সমাজ কাঠামোর একটি বিশিষ্ট বৈশিষ্ট্য। এ বিষয়ে ইতিপূর্বে কিছুটা আলোচনা হয়েছে। নতুন করে আবার সেখান থেকেই শুরু করছি।

বেশী দিনের কথা নয়, ঊনবিংশ শতাব্দীর গোড়ার দিকে ইংরেজ রাজপুরুষ স্যার চার্লস মেটক্যাফ উপমহাদেশের গ্রামাঞ্চল সম্পর্কে যখন লিখতে গেছেন তখনো ভারতের ইতিহাসের এই বৈশিষ্ট্যটি সম্পর্কে উল্লেখ না করে পারেন নি। স্যার চার্লস মেটক্যাফ লিখেছেন ঃ গ্রাম্য সম্প্রদায়গুলি হচ্ছে ছোট ছোট প্রজাতন্ত্র। তাদের যা কিছু প্রয়োজন তার প্রায় সব কিছুই তাদের আছে, গ্রামের বাইরে সম্পর্ক প্রায় নেই বললেই চলে। পৃথিবীতে সব কিছুই যেখানে নশ্বর সেখানে এগুলি যেন চিরস্থায়ী। একের পর এক রাজবংশের পতন হয়, বিপ্লবের পর বিপ্লব সংঘটিত হয়, হিন্দু, পাঠান, মোগল, মারাঠা, শিখ, ইংরেজরা ক্রমান্বয়ে একের পর এক রাজ্য ক্ষমতা দখল করে-তবু গ্রাম-সম্প্রদায়গুলি অপরিবর্তিত থেকে যায়। ... যদি কখনো তারা নিজেরা লুঠতরাজ ও ধ্বংসকার্যের শিকার হয়ে পড়ে, আক্রমণকারী শক্তি যদি অপ্রতিরোধ্য হয়ে ওঠে, তাহলে তারা নিকটবর্তী কোন বন্ধুগ্রামে পালিয়ে যায়। ঝড় বয়ে যাবার পর আবার ফিরে এসে নিজেদের কাজকর্ম শুরু করে। যদি লুঠতরাজ, হত্যাকাণ্ড কয়েক বছর জুড়ে চলে তবু শান্তি সংস্থাপনের পর গ্রামবাসীরা ফিরে আসে। পুত্রেরা পিতার স্থান দখল করে। জনশূন্য হয়ে যাবার আগে যেখানে গ্রামের অবস্থান ছিল সেখানে নতুন গ্রাম গড়ে ওঠে। আগে যাদের যে জমি ছিল তাদের বংশধররা সেই জমি চাষ

www.pathagar.com

করে। বাড়ীগুলি গড়ে ওঠে একই জায়গায়। আর এ ভাবেই সমাজ কাঠামোর মূল ধারাটি অবিচ্ছিন্ন গতিতে বয়ে চলে, যুগের পর যুগ। অতিক্রান্ত হয়ে যায় সময়, শতাব্দীর পর শতাব্দী অতিবাহিত হয়, তবু তা অপরিবর্তিত থাকে। এ যেন এক অনড় উপাদান, শত শত শতাব্দী জুড়ে যেমন ছিল তেমনি থাকে, পরিবর্তনের ছাপ পড়তে চায় না।

স্বয়ংসম্পূর্ণ গ্রাম যেমন অনড়, তেমনি অনড় সেই গ্রামের উৎপাদন যন্ত্রও উৎপাদন পদ্ধতি, গ্রাম-সমাজের শ্রেণী-সম্পর্ক। কৃষি ছিল প্রধান উপজীবিকা। উৎপাদন হতো নিজেদের ব্যবহারের জন্য। সবার ব্যবহারের পর নেহাত যেটুকু উদ্বৃত্ত থাকতো বাজারে বিক্রী হতো সেটুকু। কামার, ছুতোর বা এই জাতীয় অন্যান্য কারুশিল্পীদের কাজ ছিল গ্রামের তথা গ্রামবাসীর প্রয়োজনের যোগান দেওয়া। তার বিনিময়ে গ্রামবাসীরা যোগান দিত তাদের আহার-বাসস্থানের। একই ধাঁচের উপাদান, একই ধাঁচের চাহিদা—শত শত বছরের ব্যবধানেও কোন পরিবর্তন নেই। ফলে পরিবর্তন নেই উৎপাদন যন্ত্রের, সমাজের অনড় কাঠামোর।

এই প্রসংগে অন্যান্য দেশের সমাজ পরিবর্তনের কথা স্বভাবতঃই এসে পড়ে। উৎপাদন শক্তির অগ্রগতির সাথে সাথে সমাজ কাঠামো বদলে যায়, বদলে যায় সমাজের রীতি-নীতি, ধ্যান-ধারণা—এক কথায় সব কিছু। আর এ ভাবেই পরিবর্তনের পথে একের পর এক ধাপ পার হয়ে সমাজ আধুনিক পুঁজিবাদী স্তরে পা রাখে।

আদিম সাম্যবাদী সমাজ থেকে শ্রেণী সমাজে উত্তরণের পর পাক-ভারত উপমহাদেশের সমাজ কি ভাবে একের পর এক স্তর অতিক্রম করে আধুনিক যুগে উপস্থিত হয়েছে তার বিশেষ করে অতীতের বিস্তৃত ইতিহাস আমাদের অজানা। আদিম সমাজে ভাঙ্গনের পর সমাজ-কাঠামো ঠিক কি রূপ নিয়েছিলো এবং সে রূপ বদলে গিয়ে সমাজ কি ভাবে পরবর্তী ধাপ অর্থাৎ সামন্তবাদী ধাপে পা রেখেছিলো, তার রূপরেখা আজও অনাবিষ্কৃত। তবে যেটুকু জানা যায় তা হলো, স্বয়ংসম্পূর্ণ গ্রামের মতোই উপমহাদেশে বিশেষ ধাঁচের সামন্তবাদও অতি প্রাচীন। ঠিক কত প্রাচীন তা বলা সম্ভব নয়। একের পর এক বিভিন্ন রাজবংশ প্রভুত্ব বিস্তার করেছে, শত শত বৎসর অতিক্রান্ত হয়েছে সে সব পর্যায়ে, তবু সামন্ত-তান্ত্রিক সমাজ ব্যবস্থার কোন হের-ফের হয়নি। বড় জোর কখনো যা হয়েছে

www.pathagar.com

তা নেহাতই কাঠামোর অল্পবিস্তর পরিবর্তনের মাঝে সীমাবদ্ধ থেকেছে। মূল কাঠামোয় হাত পড়েনি। এক দিকে স্বয়ংসম্পূর্ণ গ্রাম, আর এক দিকে উপমহাদেশের সামন্তবাদ—আমাদের ইতিহাসের এই দুই অনড় উপাদান পাশাপাশি বয়ে চলেছে দীর্ঘ দিন।

পাশ্চাত্য জগতে 'সামন্তবাদ' কথাটি সাধারণভাবে যে অর্থে ব্যবহৃত হয় আমাদের দেশে সামন্তবাদের রূপ ঠিক তা নয়। দুয়ের মাঝে মৌলিক উৎপাদন সম্পর্কের ক্ষেত্রে কোন পার্থক্য নেই তা ঠিক, তবু অন্য ক্ষেত্রে যে পার্থক্য বিদ্যমান তাও নেহাতই অকিঞ্চিৎকর নয়। আর এ জন্যই অনেকে উপমহাদেশের সামন্তবাদকে সামন্তবাদ আখ্যা দিতে রাজী নন। তাঁরা একে অন্য নামে আখ্যায়িত করতে চান।

উপমহাদেশে ব্যাপারটা কিন্তু ঠিক তা নয়। রাজা এখানে পশ্চিমের মতো ভূস্বামী সৃষ্টি করতে পারেন না। যেটা হস্তান্তরিত করতে পারেন তা হলো খাজনা আদায়ের দায়িত্ব। বস্তুতঃপক্ষে উপমহাদেশে রাজার অধীন সামন্তরা রাজার হয়ে রাজস্ব সংগ্রাহক ছাড়া আর কিছু নয়। রাজার হয়ে তারা রাজস্ব সংগ্রহ করে, নিজেদের জন্য বরাদ্দ অর্থ রেখে বাকীটা রাজকোষে জমা দেয়। আইনতঃ অন্য কিছু হতে পারে না। যদি হয় তা আইনের বরখেলাপ করেই হয়। তবে এ সম্পর্কে বর্তমানে ভিন্নতর চিন্তাও জোরের সাথেই উত্থাপন করা হচ্ছে। ভূমির ব্যক্তিগত মালিকানা, কার্য্য, স্বাধীন সমস্ত ভূস্বামীর অস্তিত্ব সে সম্পর্কে জোর দিয়ে বলা হচ্ছে—তা অতীত বিদ্যমান ছিল।

সম্রাটের অধীন কার্যতঃ স্বাধীন সামন্তরাজদের সাক্ষাৎও আমরা সময় সময় পাই। তবে সাধারণভাবে তা দেখা যায় না। রাজ্যের বাইরে যে সব স্বাধীন রাজা সম্রাটের বশ্যতা স্বীকার করেন তাঁরাই সামন্ত রাজা বা করদ রাজা বলে পরিগণিত হন। সাম্রাজ্যের আওতার মাঝে ঠিক তা চলে না। এখানে সম্রাটই সর্বেসর্বা। অন্যেরা কার্যতঃ রাজস্ব সংগ্রাহক।

যতদিন কেন্দ্রীয় রাজবংশ শক্তিশালী থাকে ততদিন রাজস্ব সংগ্রাহকের পদে রদবদলও সম্ভব হয়ে ওঠে। কেন্দ্রীয় সরকারের আধিপত্যে চিড় ধরার পর ভূতপূর্ব সামন্তরা ক্ষমতা দখল করে বসে। তখনো আগের মতোই ব্যাপার ঘটে। যারা নতুন রাজা হয়ে বসে তারা আগের মতই রাজস্ব

www.pathagar.com

সংগ্রাহক মনোনীত করে। আগের তুলনায় সাম্রাজ্য কিছু ছোট হয়ে আসে, এ ছাড়া আর কোন পরিবর্তন হয় না।

কেন এ রকমটা হয়? এংগেলসের কথা অনুসারে "প্রাচ্যবাসীরা কেন ভূমি-সম্পত্তি বা সামন্তবাদী স্তরে (পাশ্চাত্যের অর্থে) পেঁছায়নি?"

এর কারণ খুঁজে পাওয়া যাবে প্রাচ্যের বিশেষ অবস্থায়, আর এ জন্যেই উপমহাদেশে স্বয়ংসম্পূর্ণ গ্রামের মতোই প্রাচীন এখানকার কেন্দ্রীভূত সাম্রাজ্য। প্রায় সভ্যতার গোড়া থেকেই এক দিকে যেমন চোখে পড়ে স্বয়ংসম্পূর্ণ গ্রামভিত্তিক সমাজ, ঠিক তেমনি চোখে পড়ে সুবিন্যস্ত আমলাতন্ত্রের উপর নির্ভরশীল কেন্দ্রীভূত সাম্রাজ্য। দুয়েরই জন্মলগ্ন প্রায় সমসাময়িক।

উপমহাদেশের ইতিহাসের এই যে আর একটি বৈশিষ্ট্য তার কারণ কি?

এংগেলসের কথানুসারে, "আমার মনে হয় মুখ্য কারণ এখানকার জলবায়ু তথা ভূমির গুণাগুণের মাঝে নিহিত। সাহারা থেকে শুরু করে আরব দেশের ভিতর দিয়ে পারস্য, ভারতবর্ষ ও টারটারির ভিতর দিয়ে বিরাট মরুভূমি এশিয়ার মালভূমি পর্যন্ত বিস্তৃত। এখানে কৃষির প্রথম শর্ত হলো জলসেচ। গ্রাম্য-সমবায়, প্রদেশ বা কেন্দ্রীয় সরকার নির্বিশেষে এই ব্যাপারটি সবার কাছেই সমান চিন্তার ব্যাপার" [এঙ্গেলস্—মার্কসের নিকট চিঠি, ৬ই জুন, ১৮৫০]।

শুধু যেখানে জলের স্বল্পতা সেখানেই নয়, বাঙলাদেশের মতো দেশ যেখানে বর্ষায় জলের প্রাচুর্য বিদ্যমান, সেখানেও কৃষির জন্য সেচ বা-জল নিষ্কাশনের ব্যাপারটা কত গুরুত্বপূর্ণ তা আমাদের বর্তমান অভিজ্ঞতা দিয়েও বুঝতে পারি। আর ভারত উপমহাদেশের মত দেশে এই জলসেচের পুরো দায়িত্ব গ্রাম-সমবায় তো দূরের কথা, কোন ছোট-খাট আঞ্চলিক শাসকের পক্ষেও নেওয়া সম্ভব ছিল না। দায়িত্ব নিতে হতো সম্রাটের মহারাজাধিরাজের অর্থাৎ কেন্দ্রীয় সরকারের। গোটা ব্যাপারটা কেন্দ্রীয় সরকার তদারক ও নিয়ন্ত্রণ করতো সুবিন্যস্ত আমলাতন্ত্রের সাহায্যে।

কৃষি ছিল জীবিকা নির্বাহ তথা উৎপাদনের প্রধান উপায়। আর সেই কৃষির জন্যে সবচেয়ে বেশী যা প্রয়োজনীয়—জলসেচ, তার দায়িত্ব ছিল কেন্দ্রীয় সরকারের, অর্থাৎ সম্রাটের। ফলে সাম্রাজ্যের প্রত্যন্ত প্রান্ত পর্যন্ত

www.pathagar.com

কৃষি তথা জমির উপরও সম্রাটেরই যে অধিকার বর্তাবে এটাই তো স্বাভাবিক।

এখনো আলেকজাণ্ডারের আক্রমণ থেকেই ভারত উপমহাদেশে সুনির্দিষ্ট প্রমাণসিদ্ধ ইতিহাসের সূচনা। মৌর্য সাম্রাজ্যের মত বিস্তীর্ণ সাম্রাজ্যেরও সূচনা এ সময় থেকেই। বিভিন্ন শিলালেখ, বিভিন্ন সময় যে সব পর্যটক এসেছেন তাঁদের বিভিন্ন লেখা থেকে জলসেচের ব্যাপারে রাষ্ট্রীয় উদ্যোগের প্রমাণসিদ্ধ নিদর্শন এ সময় থেকেই পাওয়া যায়। মৌর্যদের কথাই ধরা যাক—জলসেচের দায়িত্বে স্বতন্ত্র আমলা গোষ্ঠীর কথা মেগাস্থিনিস তাঁর ভ্রমণ বৃত্তান্তে উল্লেখ করেছেন। অন্যান্য দায়িত্বের মধ্যে খালসমূহে রীতিমতো জল-সরবরাহ অব্যাহত আছে কিনা তা দেখা তাদের দায়িত্বের অন্তর্ভুক্ত ছিল। শিলালেখে দেখা যায় সাম্রাজ্যের প্রায় প্রত্যন্ত প্রদেশে জলসেচের জন্য চন্দ্রগুপ্ত মৌর্যের আমলে সুদর্শন হ্রদ নামীয় বিখ্যাত হ্রদটি খনন করা হয়েছিল। অশোকের আমলে তা আবার সংস্কার করা হয়। শুধু মৌর্যরা নয়—আরও বিভিন্ন রাজবংশ সম্পর্কে এমনিধারা দৃষ্টান্ত উল্লেখ করা যেতে পারে। পাঠান বা মোগল আমলে তো কথা নেই। বস্তুতঃপক্ষে একেবারে আধুনিককালে ইংরেজ আমলে এসে সরকার এ দায়িত্ব পরিত্যাগ করে। কৃষিক্ষেত্রে তার কুফল ফলতেও দেরী হলো না। পরে কোন কোন অঞ্চলে ইংরেজরাও এ ব্যাপারে দায়িত্ব নিয়েছিল ঠিকই, কিন্তু তা ছিলো নেহাতই আঞ্চলিক। তা ছাড়া রাষ্ট্রের অবশ্যই করণীয় কাজসমূহের অন্যতম রূপে এ দায়িত্ব তারা কোনদিনই গ্রহণ করেনি।

উপমহাদেশের সমাজ কাঠামোর বৈশিষ্ট্যের কথা আলোচনা করতে গিয়ে পাক-ভারত উপমহাদেশের বিশিষ্ট সামন্তবাদী সমাজ (মার্কস-এংগেলস যাকে বলেছেন এশিয়াটিক সোসাইটি)—প্রাচীনত্ব ও বৈশিষ্ট্যের দিকটা দেখা গেল। এই বৈশিষ্ট্য বা উৎপাদনসমূহ অর্থাৎ স্বয়ংসম্পূর্ণ গ্রাম, সামন্ত-বাদের বিশেষ রূপ, কেন্দ্রীয় সরকারের আধিপত্য এই উপমহাদেশের সমাজ কাঠামোর এমন একটা অনড় কঠিন আবরণ সৃষ্টি করেছিল, পরবর্তী যুগে বিভিন্ন সময় কিছু কিছু পরিবর্তন সত্ত্বেও (যথা পাঠান বা বিশেষ করে মোগল আমলে) যা ভেদ করে নতুন কোন সমাজ ব্যবস্থার উদগম সম্ভব হয়নি।

www.pathagar.com

সমাজ ব্যবস্থা, উৎপাদন ব্যবস্থা তথা উৎপাদন যন্ত্র ও শ্রেণী সম্পর্কের এই অপরিবর্তনীয়তা পাক-ভারত উপমহাদেশের ইতিহাসের আর একটি বৈশিষ্ট্য।

ইতিপূর্বে আদিম সাম্যবাদী সমাজের ভাঙ্গনের কথা আলোচনা করতে গিয়ে দেখেছি যে, পাক-ভারত উপমহাদেশের মতো এত বড় একটা বিস্তীর্ণ ভূখণ্ডে সব জায়গায় ঠিক একই সময় এই ভাঙ্গন সূচিত হয়নি। যেখানে আগে সূচিত হয় সেখান থেকে তা পার্শ্ববর্তী অঞ্চলসমূহে জোর করে চাপিয়ে দেয়া হয়েছে। ফলে, প্রাচীন সমাজের অবশেষসমূহ অব্যাহত থেকেছে দীর্ঘকাল। আর হয়তো বা এরই জন্য সৃষ্টি হয়েছে স্বয়ংসম্পূর্ণ গ্রামসমূহ উপমহাদেশের ইতিহাসের সবচেয়ে অনড় উপাদান। এবার উপমহাদেশের সামন্তবাদের বৈশিষ্ট্যসমূহ দেখা গেল। দুয়ের মাঝখানে অর্থাৎ প্রাচীন সমাজের ভাঙ্গন এবং এতদ্দেশীয় বিশেষ ধরনের সামন্ত সমাজের অভ্যুদয়ের মাঝখানে অন্য কোন ধরনের সমাজ ব্যবস্থার অভ্যুদয় এখানে ঘটেছিল কিনা তা পুরোপুরিভাবে আজও নির্ণীত হয়নি। প্রমাণাভাবে সে কথা বাদ রাখাই ভাল। তা বাদ রেখেও যেটুকু আলোচনা করা গেল তা থেকেই দেখা যায়, এখানে আদিম সাম্যবাদী সমাজের ভাঙ্গন যেমন কোন সময়ই সম্পূর্ণ হয়নি তেমনই বিভিন্ন কারণে এখানকার বিশিষ্ট সামন্তবাদ টিকে থেকেছে দীর্ঘকাল। মূল কাঠামো ঠিক রেখে বিভিন্ন সময়ে কিছু কিছু পরিবর্তন হয়েছে ঠিকই, কিন্তু তাতে কোন মৌলিক তারতম্য সূচিত হয়নি। এ থেকে বুঝা যায় শ্রেণী সংগ্রামের অগ্রগতি এখানে শুধু যে জটিল তাই নয়, বিচিত্রও বটে।

কোন কোন ঐতিহাসিক ও পণ্ডিত শ্রেণী সংগ্রামের এই জটিলতা ও একই ধরনের সমাজের দীর্ঘ অপরিবর্তনীয়তাকে উপমহাদেশের বৈশিষ্ট্য এবং ইতিহাসের শাশ্বত উপাদান প্রভৃতি আখ্যায় আখ্যায়িত করে শ্রেণী সংগ্রামকে অস্বীকার করতে চেয়েছেন। বলেছেন—এ তত্ত্ব এখানে প্রযোজ্য নয়। তা না হলে এই অপরিবর্তনীয়তা কেন ?

অপরিবর্তনীয়তা কেন—মোটামুটিভাবে তা আমরা বোঝাতে চেষ্টা করেছি। তার মানে এই নয় যে, শত শত বছর ধরে এই সমাজ ঠিক হুবহু একই জায়গায় আটকে থেকেছে। মৌলিক পরিবর্তন হয়নি ঠিকই, তবু কিছু কিছু যা পরিবর্তন হয়েছে তার পিছনেও মূল শক্তি হিসাবে কাজ

www.pathagar.com

করেছে শ্রেণী সংগ্রাম। এই শ্রেণী সংগ্রাম হয়তো বা সশব্দে ফেটে পড়ে সমাজের আমূল পরিবর্তন সাধন করেনি, তবু এদিক-ওদিক বিস্ফোরণ ঘটেছে বার বার।

শ্রেণী সমাজের সূচনা থেকে এ দেশেও শ্রেণী সংগ্রামের ধারা নিয়ত অব্যাহত থেকেছে। ছেদ পড়েনি কখনো। বাংলাদেশের বৈশিষ্ট্যসহ এখানকার শ্রেণী সংগ্রামের এই রূপটি বের করে আনার দায়িত্ব বাঙালী ঐতিহাসিকের—

ইউরোপীয় সামন্ত সমাজে রাজা রাজ্যের মানুষ সম্পদ সব কিছুর মালিক। সব কিছুর উপরে তাঁর আধিপত্য। রাজা যখন তাঁর অধঃস্থ সামন্তদের উপর রাজত্বের অংশ বিশেষের দায়িত্ব দেন তখন যে জিনিসটি হস্তান্তরিত হয় তা হলো নির্দিষ্ট ভূমির মালিকানা। পাশ্চাত্য জগতে ভূস্বামীরা নিজেদের জমিদারীর অন্তর্ভুক্ত জমির একচ্ছত্র অধিপতি। রাজাকে অল্প-বিস্তর খাজানা দিয়েই খালাস। তারপর যা কিছু প্রয়োজন তার সব কিছুরই দণ্ড-মুণ্ডের মালিকও ভূ-স্বামীরা। তাদের আধিপত্য প্রশ্নাতীত।

ইউরোপীয় সামন্ত সমাজে আঞ্চলিক সামন্ত প্রভুরা নিজেদের জমিদারীতে কার্যতঃ স্ব স্ব প্রধান। আলাদাভাবে খাজনা, শুল্ক ইত্যাদি আদায় করেন, স্বতন্ত্র সৈন্য বাহিনী পোষণ করেন, নিজেদের এলাকায় কার্যতঃ দণ্ড-মুণ্ডের ব্যবস্থা করেন নিজেরা। রাজা যদি কোন বিশেষ কারণে (যথা গোপন ষড়যন্ত্র, রাজার বিরুদ্ধাচরণ ইত্যাদি) তাঁদের ক্ষমতাচ্যুত না করেন তা হলে রাজাকে দেয় বাৎসরিক রাজস্ব ও যুদ্ধের সময় সৈন্য সরবরাহের বিনিময়ে এই অধিকার তাঁরা ভোগ করেন। বংশপরম্পরাক্রমে। অন্যান্য সামন্ত প্রভুর মতো রাজারও নিজের জমিদারী আছে। প্রায় ক্ষেত্রেই তা রাজ্যের মাঝে সর্ববৃহৎ। এই জমিদারীর উপর কর্তৃত্ব করা ছাড়া রাজা অবশ্য রাজ্যের অন্যান্য সামন্ত প্রভুদের উপরও কোন কোন ক্ষেত্রে তাঁর রাজীয় অধিকার বিস্তার করেন, তবে তা খুবই সীমিত। সামন্ত প্রভুদের জমিদারীর ভূমি স্বত্বের উপর তাঁর কোন অধিকার নেই, তিনি শুধু বাৎসরিক রাজস্বের অধিকারী। এ ব্যাপারে বর্তমানে ভিন্নমতও উপস্থাপিত হচ্ছে সে ব্যাপারে আগেই বলেছি।

www.pathagar.com

সাত

রাষ্ট্র

"রাজার ভিত্তি হলো রাজকোষ ও সৈন্যবাহিনী। সৈন্যবাহিনীর হলো রাজকোষ। আবার সৈন্যবাহিনী হলো সমস্ত ধর্মসমূহের [কর্তব্যসমূহের অর্থে] ভিত্তি, যে ভিত্তির উপর দাঁড়িয়ে আছে সমস্ত প্রজামণ্ডলী" —মহাভারত (১২, ১৩০, ৩৫)

কৌম সমাজের ভাঙন সম্পর্কে আলোচনা করতে গিয়ে প্রাসঙ্গিকভাবে আদিম সাম্যবাদী সমাজ সম্পর্কে আলোচনা করেছি। পৃথিবীতে এমন একটা সময় ছিল যখন সমাজের রাজা-রাজত্ব, উচ্চ-নিম্নবিত্তে পার্থক্য, আইন-আদালত উৎপাদনের উপকরণগুলির উপরে ব্যক্তিগত অধিকার, রাজার খাজানা প্রভৃতি কোন কিছুরই অস্তিত্ব ছিল না। সমাজ বিকাশের একটি বিশেষ পর্যায়ে উদ্ভব হয়েছে এ সব কিছুর। সমাজ বড়লোক আর গরীবে ভাগ হয়ে গেছে। যারা বড়লোক তাদের সম্পত্তি, সম্পত্তির অধিকার রক্ষণাবেক্ষণের প্রয়োজনীয়তা সৃষ্টি হয়েছে। এ ভাবেই সৃষ্টি হয়েছে আইন-আদালত, সৈন্যবাহিনী। এক কথায় রাষ্ট্রের জন্ম হয়েছে।

বাংলাদেশেও রাষ্ট্রের জন্ম হয়েছে একই নিয়মে। তবে ঠিক কবে কি ভাবে কোন্ কোন্ ধাপ অতিক্রম করে এখানে পুরাদস্তুর রাষ্ট্রের প্রতিষ্ঠা সম্ভব হয়েছে তা এখানে বলার উপায় নেই। বৈদিক ও ব্রাহ্মণ্য সাহিত্য এবং অন্যান্য সূত্র থেকে উপমহাদেশের অন্যান্য অঞ্চলের ক্ষেত্রে এ সম্পর্কে যতটুকু জানা যায় তা থেকে হয়তো বা কিছুটা আঁচ করা যেতে পারে—তার বেশী কিছু নয়।

রাজতন্ত্র এখানে সুপ্রাচীন। প্রাচীন গ্রীস বা রোমের মত নগরভিত্তিক কথাকথিত প্রজাতন্ত্র ধরনের রাষ্ট্র এখানে ছিল কিনা ঠিক জানা যায় না। তবে এটা ঠিকই রাজার যে অধিকারের পরিচয় পরবর্তীকালে পাওয়া যায় তা কিন্তু একদিনে উদ্ভূত হয়নি। প্রাচীন সমাজ নানা কৌম ভাগ হয়ে বসবাস করতো। বিভিন্ন কৌমে অনিবার্য কারণেই শ্রেণীবিভাগ দেখা দিল। সমাজের বিত্তবান কর্তাব্যক্তিদের মাঝে যিনি প্রধান তিনি রাজা বা

www.pathagar.com

সম্রাট নামে অভিহিত হতে শুরু করলেন। কিন্তু কৌম সমাজের রেশ একদিনে রাতারাতি কেটে যায়নি। তা অব্যাহত ছিল দীর্ঘকাল। ফলে, কৌমের অন্য দশজনের ইচ্ছাকে পুরোপুরি অস্বীকার করা সম্ভব হতো না। এমন কি রাজাকে দেয় রাজস্বও প্রথম দিকে বাধ্যতামূলক হয়ে ওঠেনি। অনুমান করা হয় তা ছিল স্বেচ্ছাপ্রণোদিত। প্রজারা স্বেচ্ছাপ্রাণোদিত হয়ে রাজাকে কর দিত, আর যুদ্ধে বিজিত শত্রুর কাছ থেকে সংগৃহীত হতো অর্থ। এই ছিল রাজার প্রধান আয়। প্রাচীন বৈদিক সাহিত্যে যে রাজ-রাজড়াদের উল্লেখ দেখা যায় তারা প্রায়ই হলেন এ জাতীয় রাজা—আদিম কৌম সমাজ ও পুরোদস্তুর রাজতন্ত্রের মাঝামাঝি অবস্থা। এ সময় বৈদিক সাহিত্যের উল্লেখ থেকেই দেখা যায় অনেক ক্ষেত্রে রাজাদের ভূমি দান করারও অধিকার ছিল না। অর্থাৎ ভূমির উপর তখনো পুরোপুরি ব্যক্তিগত মালিকানা ঠিক প্রতিষ্ঠিত হয়নি। এখানেও এটা একটা অন্তবর্তীকালীন স্তর।

সমাজ যখন বিত্তবান ও বিত্তহীনে ভাগ হয়ে যায় তখন বিত্তবানদের বিত্তসংরক্ষণ ও নিরাপদ করার জন্যেই রাষ্ট্রের উৎপত্তি। কাজেই রাষ্ট্রের রূপ প্রথম থেকেই দমন-পীড়নমূলক। প্রাচীন শাস্ত্রকারদের কাছেও রাষ্ট্রের এই রূপটি অজ্ঞাত ছিল না। আর এ সম্পর্কে বলতে গিয়ে তাঁরা রেখে-ঢেকে কথা বলেন নি—বলেছেন স্পষ্ট করে। দু'একটি দৃষ্টান্ত উল্লেখ করা যেতে পারে। অর্থব বেদে একটি শ্লোকে বলা হচ্ছে, "তুমি সিংহের মতো সব কৌমগুলিকে ভক্ষণ কর। ব্যাঘ্রের মতো শত্রুদের পরাস্ত কর"। রাজাকে এখানে সব কৌমগুলির ভক্ষণকারী বলে উল্লেখ করে সিংহের সাথে তুলনা করা হয়েছে। তুলনাটি নিঃসন্দেহে উল্লেখযোগ্য। বৈশ্যদের সম্পর্কে বলতে গিয়ে ঐতরেয় ব্রাহ্মণের এক জায়গায় বলা হচ্ছে, "তারা অন্যকে বলি (কর) দেবে, তারা অন্যের ভোজ্য, ইচ্ছেমত তাদের উপর নিপীড়ন করা চলে।" শতপথ ব্রাহ্মণে তো একাধিক বার বলা হয়েছে, রাজার জন্যে এই পৃথিবীতে ব্রাহ্মণ ব্যতিরেকে সব কিছুই ভোজ্য, ব্রাহ্মণরা শুধু ভোজ্য নয়, কারণ তার কাছে আছে রাজার জন্যে সোম। মনু তো স্পষ্টভাবেই বলেছেন, জোঁক যেভাবে অল্প অল্প করে রক্ত শুষে নেয় রাজারও সে ভাবেই খাজনা আদায় করা কর্তব্য।

www.pathagar.com

বাংলাদেশে রাজতন্ত্রের নিঃসংশয় প্রমাণ পাওয়া যায় খ্রস্ট-পূর্ব চতুর্থ শতক থেকে—গঙ্গা রাষ্ট্রের বিবরণে। গ্রীক ঐতিহাসিকেরা গঙ্গা রাজ্যের সৈন্যবাহিনী প্রভৃতি সম্পর্কে যে বিবরণ রেখে গেছেন, তা থেকে বোঝা যায়—রাষ্ট্র শক্তি ছিল সুবিন্যাস্ত, সুশৃংশল, সুদৃঢ়। মহাভারতেও এইসব অঞ্চলে বিভিন্ন রাষ্ট্রের উল্লেখ দেখা যায়। কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধে হস্তিরূঢ় বঙ্গরাজ তো কৌরব শক্তির পক্ষেই যোগ দিয়েছিলেন। ভীম দিগ্বিজয়ে বেরিয়ে এই অঞ্চলসমূহের বহু রাজাকে পরাস্ত করেছিলেন। এ সব থেকে মনে হয় গঙ্গারাষ্ট্রের বাইরেও এ সময় আরও রাষ্ট্রের অস্তিত্ব ছিল। বহিঃশত্রুর আক্রমণের বিরুদ্ধে এই রাষ্ট্রগুলি অনেক সময় এক হয়ে দাঁড়াবার চেষ্টা করতো। কূটনৈতিক সম্পর্কও বজায় রাখতো অন্যান্য রাষ্ট্রের সাথে।

মহাস্থানগড়ে প্রাপ্ত লিপি থেকে জানা যায় যে, উত্তর বাংলার প্রায় গোটাটাই অর্থাৎ পুণ্ড্রবর্ধন মৌর্য্য আমলে মৌর্য্য সাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত হয়েছিল। এ অঞ্চলের শাসনকেন্দ্র ছিল পুণ্ডনগল বা পুণ্ড্রনগর—বর্তমান বগুড়া শহরের সন্নিকটে অবস্থিত মহাস্থানে। এখানে প্রাপ্ত লিপিতে 'মহামাত্রের' উল্লেখ দেখে বুঝা যায় একজন প্রাদেশিক শাসনকর্তার নেতৃত্বে শাসনকার্য পরিচালিত হত সে সময়। আরও বুঝা যায়, মৌর্য্য রাষ্ট্রের জটিল ও সুসংবদ্ধ রূপ তখন বাংলাদেশেও বিস্তৃত হয়েছিল। দুর্ভিক্ষ প্রভৃতি আপৎকালে প্রজাসাধারণকে ধন ও অর্থ ঋণ দেবার বিধান অর্থশাস্ত্রে আছে। মৌর্য্য সম্রাটরা এই বিধান মেনে চলতেন। মহাস্থানগড়ের লিপি থেকেও তা দেখা যায়।

গুপ্ত আমলে প্রাচীন বাংলার প্রায় অধিকাংশ গুপ্ত সাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত হয়। এ সময়কার বাংলার রাষ্ট্রীয় কাঠামোর মোটামুটি বিস্তৃত বিবরণ আমরা জানতে পারি।

গুপ্ত সম্রাটরা বাংলাদেশের সবটাই প্রত্যক্ষভাবে শাসন করতেন না। কোন কোন অঞ্চল সামন্ত প্রভুদের দ্বারা শাসিত হত। সামন্ত প্রভুরা ছিলেন কার্যতঃ স্বাধীন। স্বতন্ত্রভাবে তাঁরা শাসন করতেন। শুধু গুপ্ত সম্রাটদের আধিপত্য স্বীকার করে নিলেই হলো। আরো দায়িত্ব ছিল যুদ্ধের সময় এঁদের নিজেদের সৈন্য-সামন্ত নিয়ে সম্রাটের পক্ষে যোগ দিতে হত। এঁদের শাসন কাঠামো ছিল কেন্দ্রীয় রাষ্ট্রযন্ত্রের অনুরূপ। একই ছাঁচে ঢালা।

www.pathagar.com

সামন্ত প্রভুরা মহাসামন্ত, আবার অনেক সময় মহারাজা উপাধিতে আখ্যায়িত হতেন—যেমন মহারাজ মহাসামন্ত বিজয় সেন, মহারাজ রুদ্রদত্ত ইত্যাদি। কোন বিশেষ রাষ্ট্রীয় কাজে যিনি রাষ্ট্র প্রতিনিধি নিযুক্ত হতেন তাকে বলা হতো দূতক। শান্তিরক্ষা ও যুদ্ধ বিগ্রহের জন্য দায়িত্বশীল সর্বোচ্চ রাজকর্মচারীকে বলা হতো মহাপ্রতীহার, রাজকীয় হস্তীসৈন্যের যিনি অধ্যক্ষ তাঁকে বলা হতো মহাপিলুপতি ; পাঁচটি শাসন বিভাগের যিনি প্রধান তিনি পঞ্চাধিকরণোপরিক ; নগরের যিনি অধ্যক্ষ তিনি পুরপালোপরিক। মহাসামন্তরা অনেক সময় এই সব উচ্চপদে নিযুক্ত হতেন। মাহরাজ মহাসামন্তরা বিজয় সেন তো একাই ছিলেন পঞ্চাধিকরণোপরিক, পাট্যপরিক, পুরপালোপরিক। সামন্ত রাজারা নিজের শাসনাধীন এলাকায় কার্যতঃ স্বাধীনভাবে রাজত্ব করতেন ঠিকই, কিন্তু ভূমিদান করার অধিকার তাঁদের ছিল না। সে অধিকার ছিল একমাত্র কেন্দ্রীয় সরকারের। ভূমিদান করতে হলে সামন্ত প্রভুদেরও কেন্দ্রীয় রাষ্ট্রের কাছে আবেদন করতে হত।

সামন্ত রাজাদের শাসিত অঞ্চল বাদ দিয়ে বাংলাদেশের বাকীটকু ছিল কেন্দ্রীয় রাষ্ট্রযন্ত্রের প্রত্যক্ষ শাসনাধীন। এই কেন্দ্রীয় রাষ্ট্র ছিল সুবিন্যস্ত, নির্দিষ্ট শাসনতান্ত্রিক বিভাগে বিভক্ত। বৃহত্তম শাসনতান্ত্রিক বিভাগের নাম ছিল ভুক্তি—অনেকটা আজকের দিনের রাজ-বিভাগ 'ডিভিশনের' মত। প্রতিটি ভুক্তি আবার কয়েকটি বিষয়ে, প্রত্যেক বিষয় কয়েকটি মণ্ডলে, প্রতিটি মণ্ডল কয়েকটি বীথিতে, প্রতিটি বীথি কয়েকটি গ্রামে বিভক্ত ছিল। গ্রামই ছিল সর্বনিম্ন রাজ-বিভাগ।

ভুক্তির শাসনকর্তাকে বলা হতো উপরিক। সম্রাট নিজে উপরিকদের নিয়োগ করতেন। অনেক সময় রাজপুত্র বা রাজ-পরিবারের লোকেরা এই পদে নিযুক্ত হতেন। গুপ্ত শাসনের প্রথম দিকে বাংলায় একটিমাত্র ভুক্তিরই উল্লেখ দেখা যায়। তা হলো পুণ্ড্রবর্ধন ভুক্তি। সে সময় পুণ্ড্রবর্ধন ভুক্তি চব্বিশটি বিষয়ে বিভক্ত ছিল। পরবর্তীকালে বর্ধমান ভুক্তিরও উল্লেখ পাওয়া যায়।

গুপ্ত শাসনের প্রথম দিকে বিষয়ের শাসনকর্তাকে কুমারামাত্য নামে আখ্যায়িত করা হতো, শেষের দিকে বলা হতো আয়ুক্তক।

www.pathagar.com

প্রতিটি ভুক্তি, বিষয় বা বীথিতে শাসন পরিচালনার জন্যে শাসনকেন্দ্রে একটি করে কেন্দ্র বা দফতর থাকতো। এই শাসনকেন্দ্রকে বলা হতো অধিকরণ। বিভিন্ন তাম্রশাসন থেকে আমরা অধিকরণের শুধু একটি মাত্র কাজ অর্থাৎ ভূমিদান বা বিক্রয় সংক্রান্ত কাজের কথা জানতে পারি। তাই বলে অধিকরণসমূহের দায়িত্ব শুধু ভূমিদান বা বিক্রী বা ভূমি স্বত্বের দলিল-পত্র রক্ষণাবেক্ষণ, জমির মাপ-জোক, সীমানার নিকাশ রাখার মাঝেই সীমাবদ্ধ ছিল না। শাসন কাজের অন্যান্য ক্ষেত্রেও তাঁদের দায়িত্ব প্রসারিত ছিল।

দামোদরপুরে প্রাপ্ত তাম্রশাসনসমূহ থেকে জানা যায় যে ৪৪৪ খৃস্টাব্দ থেকে ৫৪৪ খৃস্টাব্দ অর্থাৎ এই এক শ' বছর জুড়ে কোটিবর্ষ বিষয়ে বিষয়ের শাসনকর্তা ছাড়াও অধিকরণের সাথে অবিচ্ছেদ্যভাবে যুক্ত ছিলেন নগরশ্রেষ্ঠী, প্রথম সার্থবাহ, প্রথম কুলিক ও প্রথম কায়স্থ। খুব সম্ভবতঃ নগরশ্রেষ্ঠী ছিলেন নগরের ধনী ব্যাঙ্কার বা বিভিন্ন শিল্প প্রতিষ্ঠানসমূহের প্রতিনিধি। প্রথম সার্থবাহ ছিলেন বিষয়ের বণিকদের প্রতিনিধি। প্রথম কুলিক কারুশিল্পীদের প্রতিষ্ঠানসমূহের এবং প্রথম কায়স্থদের প্রতিনিধি ছিলেন। অবশ্য প্রথম কায়স্থ আধুনিক ধরনের সেক্রেটারী জাতীয় লোক ছিলেন বলে অনেকে অনুমান করেন। রাজ কর্মচারী ছাড়া এই সদস্যরাও অধিকরণের কাজে সমানভাবে অংশ গ্রহণ করতেন। এঁদের সাহায্য করার জন্যে ছিল পুস্তপালের দফতর—যেখানে যাবতীয় দলিল দস্তাবেজ সংরক্ষিত হতো।

দামোদরপুর তাম্রশাসনসমূহ থেকে জানা যায় যে, জমি ক্রয়েচ্ছু ব্যক্তিরা অধিকরণের কাছে জমির ক্রয়ের আবেদন পেশ করতেন। অধিকরণ এই আবেদন পুস্তপালের দফতরে পাঠিয়ে দিত। সেখান থেকে অনুকূল রিপোর্টের পর আবেদন মঞ্জুর হতো। যারা জমি কিনতো তারা স্বত্বের দলিল পেতো। সংস্কৃত নাটক মৃচ্ছকটিক থেকে জানা যায়, অধিকরণ শুধু যে ভূমি ক্রয়-বিক্রয়ের আবেদনই মঞ্জুর করতো তা নয়, অপরাধসমূহের বিচারও করতো তারাই। রাজ কর্মচারী ছাড়া অধিকরণের অন্যান্য সদস্যরা উপরিক দ্বারা মনোনীত হতেন না নিজের নিজের সংস্থাসমূহ দ্বারা নির্বাচিত হতেন তা সঠিকভাবে বলা সম্ভব নয়। তবে এঁরা অধিকরণে নিছক উপদেষ্টা ছিলেন না। রাজ-পুরুষের সাথে এঁরাও ছিলেন দায়িত্বশীল।

www.pathagar.com

বীথি বিভাগের নিজস্ব অধিকরণ ছিল। বীথির রাজপুরুষ ছাড়া আর যাঁরা এই অধিকরণের সাথে যুক্ত ছিলেন তাঁদের বলা হত মহত্তর, অগ্রহারিন খাড়গী ও অন্ততঃ একজন বাহ নায়ক। মহত্তর ছিলেন এলাকার অগ্রগণ্য ব্যক্তি, নিঃসন্দেহে বিত্তবান ভূম্যধিকারী। খড়গী বলতে খুব সম্ভবতঃ খড়গধারী বা শান্তিরক্ষা বিভাগের রাজপুরুষকে বুঝাত। খুব সম্ভবতঃ যোগাযোগ বিভাগের কর্মকর্তাকে বলা হতো বাহ নায়ক। জমি বিক্রী করে বীথি বিভাগের যে অর্থ আসতো, অধিকরণের নির্দেশমত যে কর্মচারী তা বিলি করতেন তাঁকে বলা হতো কুলবারকৃত।

গ্রাম্য শাসনকর্তার নাম ছিল গ্রামিক। অনেক সময় কোনো কোনো গ্রামে শাসনকার্য পরিচালনার জন্য একটি করে অধিকরণ ও পুস্তপালের দফতর থাকতো। এই গ্রাম্য অধিকরণের সদস্য ছিলেন মহত্তর, গ্রামিক, কুটুম্ব প্রভৃতিরা। বিষয় বা বীথির অধিকরণগুলির মতো গ্রাম্য অধিকারণও নিজের এলাকায় একই অধিকার ভোগ করত, একই কাজ পরিচালনা করত।

গুপ্ত সম্রাটদের আমলে বিভিন্ন শাসন বিভাগে শাসন পরিচালনার যে ব্যবস্থার কথা আমরা আলোচনা করলাম তা থেকে সে আমলের রাষ্ট্রযন্ত্র যে কতখানি সংহত ও সুদৃঢ় ছিল তা অনুমান করা চলে। আরও লক্ষ্য করার ব্যাপার শাসন বিভাগের অধিকরণসমূহ গঠিত হতো সম্পূর্ণ বিত্ত-বানদের সমবায়ে। ভুক্তি এবং বিষয়াধিকরণে প্রধানতঃ বণিক, ব্যবসায়ী, কারুশিল্পীদের প্রতিনিধিরা স্থান পেতেন। এই স্তরের অধিকরণসমূহে ভূম্যধিকারীদের উপস্থিতি এ সময় দেখা যায় না। এই স্তরে ব্রাহ্মণদের অনুপস্থিতি লক্ষণীয়। তাই বলে ভূমিবান সমস্ত শ্রেণী ও ব্রাহ্মণরা যে একেবারে উপেক্ষিত ছিলেন তা নয়। তাঁদের উপেক্ষা করা সম্ভব ছিল না। গ্রাম বা বীথির অধিকরণগুলিতে তাঁদের ভূমিকা ছিল রীতিমতো গুরুত্বপূর্ণ।

স্বাধীন বঙ্গ রাষ্ট্র

দক্ষিণ ও পূর্ব-বঙ্গে স্বাধীন রাজবংশ প্রতিষ্ঠিত হয় ষষ্ঠ শতকে। নতুন রাষ্ট্রযন্ত্রের পত্তন হয়। তাই বলে গুপ্ত সম্রাটরা যে ছাঁচে রাষ্ট্রযন্ত্র ঢালাই করেছিলেন তা থেকে আলাদা কিছু নয়, হুবহু সে রকম। রাজ্য

www.pathagar.com

আগের মতোই ভুক্তি, বিষয়, বীথি ইত্যাদিতে বিভক্ত হতো। শাসনকার্য পরিচালনার জন্যে বিভিন্ন রাজ-পুরুষ ছাড়াও প্রতি স্তরে অধিকরণ থাকতো একটি করে। বিষয় অধিকরণের সদস্য রূপে মহত্তর, ব্যাপারীন ও অন্যান্য নেতৃস্থানীয় নাগরিকের নাম দেখা যায়। ব্যাপারীনরা ছিলেন বিষয়ের শিল্প ও ব্যবসায়ী স্বার্থের প্রতিনিধি, মহত্তররা ভূম্যধিকারীদের। নব্যাবকাশিকা ভুক্তির নামও এ সময় থেকেই দেখা যায়।

পাল আমল—পাল ও চন্দ্র বংশ

তৎকালীন প্রায় পুরো বাংলাদেশ ও তার আশ-পাশের ভূভাগে পালরা রাজত্ব করেছে দীর্ঘকাল—চারশ বছর কাল জুড়ে। দীর্ঘ শতবর্ষব্যাপী ; মাৎস্যন্যায়ের পর অষ্টম শতকের মাঝামাঝি পাল বংশ প্রতিষ্ঠালাভ করে। বাংলাদেশে এক দীর্ঘস্থায়ী রাজবংশের সূচনা হয়।

সম্রাটের প্রত্যক্ষ শাসনাধীন ভূভাগে রাজ্য বিভাগ ছিল আগের মতই ভুক্তি, বিষয় মণ্ডল ইত্যাদি। সম্রাটের প্রত্যক্ষ শাসনাধীনে বাংলাদেশে পুণ্ড্রবর্ধন ভুক্তি, বর্ধমানভুক্তি ও দণ্ডভুক্তি এবং আসামে প্রাগ-জ্যোতিষ ভুক্তির উল্লেখ দেখা যায়। ভুক্তি বা বিষয় কেন্দ্রে নিযুক্ত বহু রাজপুরুষেরও নাম পাওয়া যায়। কিন্তু অধিকরণসমূহ কি ভাবে শাসনকার্যের সাথে যুক্ত, আগের মতো বিভিন্ন জন-প্রতিনিধিরা অধিকরণসমূহে আসন গ্রহণ করতেন কিনা তা জানা যায় না। তবে অনুমান করা চলে আগের ব্যবস্থা হয়তো অনেকটা অব্যাহত ছিল।

পাল ও চন্দ্র বংশের আমলে রাজাদের জাঁকজমক আগের তুলনায় বৃদ্ধি পায়। বৃদ্ধি পায় তাদের ক্ষমতা। তার সাথে সামন্ত প্রভুদের ক্ষমতাও পূর্বের তুলনায় বৃদ্ধি পায় ও সংহত হয়।

পাল ও চন্দ্র বংশের রাজারা শুধু মহারাজাধিরাজই নয়, পরমেশ্বর ও পরম ভট্টারক বলেও অভিহিত হতেন। ঈশ্বরের একেবারে খাস অবতার ও পরম গুরু। এ সবই সম্রাটের বর্ধিত ক্ষমতার পরিচায়ক।

এ সময় থেকে মন্ত্রী বা সচিব নামে একজন রাজপুরুষের উল্লেখ দেখা যায়। অনেকটা আজকালকার প্রধানমন্ত্রীর মত। প্রায়ই দেখা যায় একই বংশ থেকে এঁরা এই পদে নিযুক্ত হতেন—এই অর্থে পদটি ছিল অনেকটা

www.pathagar.com

বংশানুক্রমিক। ধর্মপাল দেবের রাজত্বকাল থেকে শুরু করে নারায়ণ পাল দেবের রাজত্ব কাল পর্যন্ত, ব্রাহ্মণ বংশ পাল ও চন্দ্র বংশীয় রাজারা ছিলেন বৌদ্ধ। কিন্তু মন্ত্রীরা ছিলেন ব্রাহ্মণ এবং এঁরা ছিলেন প্রভূত ক্ষমতা-শালী। কথিত আছে মন্ত্রী দর্ভপাণি সাক্ষাৎপ্রার্থী দেবপাল দেবকে দুয়ারে দাঁড় করিয়ে রেখেছিলেন, তবু দেখা দেন নি। এটা অতিশয়োক্তি হতে পারে তবু মন্ত্রী বা সচিবরা যে প্রভূত ক্ষমতাশালী রাজকর্মচারী ছিলেন এ বিষয় সন্দেহ নেই। আর এই পদে ব্রাহ্মণদের নিয়োগ তাদের ক্রমবর্ধমান সামাজিক ও রাষ্ট্রীয় প্রভাবের পরিচায়ক।

রাজার জ্যেষ্ঠ পুত্র যুবরাজ সিংহাসনের ভবিষ্যৎ উত্তরাধিকারী। রাষ্ট্রের বহু গুরুত্বপূর্ণ কাজের দায়িত্ব পড়তো তাঁর উপর। রাজপুত্ররা নানা গুরুত্বপূর্ণ পদে নিযুক্ত হতেন। রাজ্য পরিচালনায় রাজা ভাইদেরও সাহায্য পরামর্শ নিতেন। রাজমাতা ও রাজমহিষীরাও রাজকীয় সম্মানে সম্মানিতা ছিলেন।

পাল আমলে সামন্ত প্রভুরাও পূর্বের তুলনায় ক্ষমতাবান হয়ে উঠে-ছিলেন। গুপ্ত সাম্রাজ্যের আমল থেকেই সামন্ত প্রভুরা ছিলেন সাম্রাজ্যের অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ। স্ব স্ব ভূভাগে কার্যতঃ এঁরা সবাই ছিলেন স্বাধীন। সম্রাটকে শুধু নির্দিষ্ট কর ও যুদ্ধের সময় সৈন্য যোগাতে হত। পাল-চন্দ্র বংশের আমলে একই ব্যবস্থা আরও দৃঢ় হয়। বিস্তীর্ণ সাম্রাজ্যের মাঝে সামন্ত প্রভুদের সংখ্যাও ছিল অনেক। আগের মতই এঁরা মহারাজাধিরাজকে কর দিতেন। মাঝে মাঝে দরবারে এসে তাঁকে প্রণতি জানিয়ে অধীনতা স্বীকার করে যেতেন, আপৎকালে ও যুদ্ধের সময় সৈন্য যোগাতেন। রামপাল তো এই সামন্ত প্রভুদেরই সহায়তায় হৃত রাজ্য পুনরুদ্ধার করে-ছিলেন। হীনবল সম্রাটের সমর্থনে সৈন্য যুগিয়েছিলেন তাঁরা। বিনিময়ে অবশ্য রামপালকে তাঁদের আরও অধিকার স্বীকার করে নিতে হয়েছিল। কেন্দ্রীয় সরকার যতই দুর্বল হয়ে পড়ছিল সামন্ত প্রভুরাও তত ক্ষমতাবান হয়ে উঠছিলেন। অনেক খোলাখুলি স্বাধীনতাই ঘোষণা করে বসতেন। অন্যদের চালচলন ছিল স্বাধীন নরপতির মত। ঢেক্কারীর সামন্ত প্রভু মহামাণ্ডলিক ঈশ্বর ঘোষের তাম্রশাসন থেকে দেখা যায়, মহামাণ্ডলিক হওয়া সত্ত্বেও পাল, চন্দ্র, সেন, বর্মন নরপতিদের মতোই তিনিও একই ধাঁচে ভূমিদান করেছেন—তাম্রশাসনের রচনা ভঙ্গীও একই ধরনের। রাজন,

www.pathagar.com

রাজন্যক, রাজনক, রাণক, সামন্ত, মহাসামন্ত ইত্যাদিরা সবাই ছিলেন নানা স্তরের সামন্ত নরপতি।

রাজ্যে রাজার অধিকার ছিল সর্বব্যাপক। শাসনকার্য পরিচালনার বিভিন্ন বিভাগ তো আছেই তা ছাড়া ধর্মীয় প্রতিষ্ঠানসমূহের ব্যাপারেও বিস্তৃত ছিল তাঁর অধিকার। অনেক ক্ষেত্রেই দেখা যায়, বৌদ্ধ বিহার-সমূহের অধ্যক্ষ নিয়োগ করেছেন সম্রাট। ধর্মীয় প্রতিষ্ঠানসমূহের জন্য ভূ-সম্পত্তি দান বা এই জাতীয় ব্যাপারে যিনি রাজার প্রতিনিধি হয়ে কাজ করতেন তাঁকে বলা হতো দূতক। এঁর মাধ্যমে সম্রাটের কাছে আবেদন জানানো হত। আবার ইনিই সম্রাটের অনুমোদন কার্যকরী করার ব্যবস্থা করতেন। পাল ও চন্দ্রবংশীয় সম্রাটেরা বৌদ্ধ ধর্মাবলম্বী ছিলেন। কিন্তু তাঁদের আমলেই সমাজে ব্রাহ্মণ্য প্রভাব ক্রমেই বৃদ্ধি পাচ্ছিলো। বর্ণ বিভাগ প্রথা যাতে অক্ষুণ্ণ থাকে, কোনভাবে যাতে তার ব্যত্যয় না হয়, সেদিকে সম্রাট তীক্ষ্ণ দৃষ্টি রাখতেন।

শাসনকার্য পরিচালনার ব্যাপারে মূল দায়িত্ব ছিল কেন্দ্রীয় কর্মাধ্যক্ষ-দের উপর। সচিবের কথা এর আগেই আলোচনা করা হয়েছে। তা ছাড়া ছিলেন পররাষ্ট্র সংক্রান্ত যুদ্ধ ও শান্তির ব্যাপারে উচ্চতম রাজকর্মচারী মহাসান্ধিবিগ্রহিক, বিষয়ের সর্বময় কর্তা মহাকুমারামাত্য, যুদ্ধবিগ্রহ সম্পর্কে উচ্চতম কর্মচারী মহাসেনাপতি, বিচার বিভাগের সর্বোচ্চ কর্তা মহাদণ্ড-নায়ক, আয়-ব্যয় বিভাগের কর্তা মহাক্ষপটলিক, অনেকটা সহকারী মন্ত্রী ধরনের রাজামাত্য, রাজার পার্শ্বরক্ষীদের অধ্যক্ষ অঙ্গরক্ষ। রাজার প্রত্যক্ষ কর্তৃত্বাধীনে এই কর্মচারীরা কাজ করতেন—অনেকটা আজকের দিনের মন্ত্রিসভার মত। এঁরা সবাই ছিলেন এক একটি বিভাগের সর্বময় কর্তা, এঁদের দফতর ছিল রাজধানীতে।

উপরোক্ত মন্ত্রীরা ছাড়াও কেন্দ্রীয় রাষ্ট্রযন্ত্রে আরও কয়েকজন পরিচালক ছিলেন—এঁদের বলা হতো অধ্যক্ষ। রাজকীয় নৌ-বাহিনীর দায়িত্বে ছিলেন নৌকাধ্যক্ষ, পদাধিক বাহিনীর বলাধ্যক্ষ। ধর্মানুষ্ঠান পরিচালনা ও নিয়ন্ত্রণের জন্যও কয়েকজন রাজকর্মচারী ছিলেন। এ ছাড়া ছিলেন বেসামরিক রাজকীয় হাতী, ঘোড়া, গরু ইত্যাদির রক্ষণাবেক্ষণের জন্য দায়িত্বশীল অধ্যক্ষ।

www.pathagar.com

এ সময় কেন্দ্রীয় শাসনযন্ত্রের বিভিন্ন বিভাগে নিযুক্ত বহু রাজকর্মচারীর কথা আমরা জানতে পারি। রাজস্ব বিভাগে ভাগ, ভোগ, হিরণ্য কর, উপরিকর প্রভৃতি নানাজাতীয় কর আদায়ের দায়িত্ব ছিল শৌল্কিক, চৌরোদ্ধরণিক, ভোগপতি, ষষ্ঠাধিকৃত, গৌল্মিক প্রভৃতি কর্মচারীদের উপর। এঁরা প্রত্যেকেই বিশিষ্ট একটি কর আদায় করতেন। আয়-ব্যয়ের হিসাব রাখতেন মহাক্ষপটলিক। তাঁর সহায়তা করতেন জ্যেষ্ঠ কায়স্থ। জমি-জিরেত মাপজোখ ইত্যাদি করার দায়িত্বে ছিলেন ক্ষেত্রপ। শান্তি রক্ষা ও পুলিশ বিভাগের দায়িত্বে ছিলেন মহাপ্রতীহার, দাণ্ডিক, দণ্ডপাণিক, দণ্ডশক্তি। খোল ছিলেন এই বিভাগের গুপ্তচর। সামরিক বিভাগের সর্বোচ্চ পদে মহাসেনাপতি, তাঁর নীচে সেনাপতি, বলাধ্যক্ষ, নৌকাধ্যক্ষ। এমনি ধারা প্রতিটি বিভাগই ছিল সুসংগঠিত।

রাজ-বিভাগে ভুক্তির কর্তা ছিলেন উপরিক, বিষয়ের ছিলেন বিষয়পতি, দশগ্রামের কর্তা ছিলেন দশগ্রামিক, গ্রামের স্থানীয় শাসনকার্যের দায়িত্বে যে রাজ-কর্মচারী ছিলেন তাঁকে বলা হতো গ্রামিক। এ ভাবেই কেন্দ্রীয় রাজধানী থেকে শুরু করে সুদূর গ্রাম পর্যন্ত বিস্তৃত ছিল সম্রাটের কর্তৃত্ব।

পাল রাজাদের সৈন্যবাহিনীও ছিল সুসংগঠিত। তাঁরা বিদেশ থেকে ভাড়াটিয়া সৈন্য নিয়োগ করতেন। এই প্রসংগে নানা উপজাতি—যথা মালব, কুলিক, হূন প্রভৃতির উল্লেখ দেখা যায়।

সেন বংশ ও আরও কয়েকটি ছোট ছোট রাজবংশ

সুদীর্ঘ চারশ বছরের রাজত্বকালে পাল রাজারা শাসনযন্ত্রের কাঠামোর পত্তন করেছিলেন এই আমলেও তার বিশেষ কোন পরিবর্তন হয়নি। যেটুকু হয়েছে তাতে দেখা যায় পুরোহিত উচ্চপদস্থ রাজকর্মচারীর মতই বিভিন্ন স্থানে উল্লিখিত হচ্ছেন। সেন আমলের শেষের দিকে পুরোহিতকে মহা পুরোহিত বলা হতো। এ ছাড়াও শান্ত্যাগারিক, শান্ত্যাগারাধিকৃত, শান্তিবারিক প্রভৃতি রাজকর্মচারীরাও ছিলেন পুরোহিত। এঁরা প্রত্যেকেই নির্দিষ্ট আচার পালনের জন্য দায়িত্বশীল ছিলেন। এ সময় থেকে মহামুদ্রাধিকৃত ও মহাসর্বাধিকৃত নামীয় দুজন নতুন রাজকর্মচারীর উল্লেখ দেখা যায়। অবশ্য এই উপাধিতে যাঁরা আখ্যায়িত হতেন তাঁদের দায়িত্ব কি ছিল সে সম্পর্কে নির্দিষ্ট কোন কিছু জানা যায়নি।

www.pathagar.com

রাজ-বিভাগ আগের মতোই ছিল। তবে ভুক্তি, বিষয়, মণ্ডল ছাড়াও এ সময় আরও ছোট ছোট বিভাগের সৃষ্টি হয়েছিল। পাটক, চতুরক, আবৃত্তি ছিল এই জাতীয় নবসৃষ্ট উপ-বিভাগ। এইসব উপবিভাগের শাসনকার্য পরিচালনার জন্যে ছিল প্রতি স্তরে একজন রাজকর্মচারী। সুদূর পল্লীর নিভৃত অঞ্চলেও প্রসারিত ছিল কেন্দ্রীয় সরকারের হাত।

কালে রাষ্ট্রীয় শাসনযন্ত্র কি পরিমাণ সুসংহত ও বিস্তৃত হয়ে উঠেছিল তা দেখা গেল। মৌর্য্য আমলে বাংলা দেশের শাসনযন্ত্রের বিস্তৃত বিবরণ জানা যায় না। তবে গুপ্ত আমল ও তার পরে পাল-সেন-বর্মন প্রভৃতি রাজবংশের আমলে শাসনযন্ত্রের যে বিবরণ আমরা জানতে পারি, তাতে দেখা যায় শাসনযন্ত্র ক্রমেই বিস্তৃত, সুবিন্যস্ত ও সুদৃঢ় হয়ে উঠেছিল। প্রথম দিকে বিভিন্ন অধিকরণ পরিগণনার ক্ষেত্রে ব্যবসায়ী-শিল্পীদের যে আধিপত্য দেখা যায় তা তিরোহিত হয়েছিল পরবর্তী কালে। আরও দেখা যায় ক্রমে বেড়ে গিয়েছিল পুরোহিতদের আধিপত্য। বহিরাগত রাজবংশ সেন, বর্মন, কম্বোজদের শাসন আমলে সমাজ তথা রাষ্ট্রযন্ত্রে ব্রাহ্মণ পুরোহিতদের আধিপত্য উল্লেখযোগ্যভাবে বেড়ে যায়। সামন্ত প্রভুদের ক্ষমতাও ক্রমে বৃদ্ধি পায় এ সময়। এক কথায় বাংলা দেশে স্বাধীন রাজত্ব প্রতিষ্ঠিত হবার পরও গুপ্ত সাম্রাজ্যের অনুকরণেই এখানে শাসনযন্ত্র গড়ে উঠেছিল এবং ক্রমেই তা সুবিন্যস্ত, বিস্তৃত ও সুদৃঢ় হয়েছিল। এই জাতীয় শাসনযন্ত্র যে অত্যাচারী হবে এটাই তো স্বাভাবিক। বস্তুতঃপক্ষে ছিলও তাই। তাই প্রাচীনকালে গ্রাম্য বাঙালী গৃহস্থের কামনা ছিল বিষয়-পতিরা যেন লোভহীন হয়। ভূমিবান, মহত্তর, কুটুম্ব প্রভৃতি ছাড়া লোক-সাধারণের অবস্থা ছিল দারিদ্র্য-লাঞ্ছিত। একটু সুখের মুখ দেখা তাদের ভাগ্যে ঘটে উঠতো না। দিন এনে দিন খেয়ে অনাহার-অর্ধাহারে দিন কাটাতো তারা। সুনিয়ন্ত্রিত, সুবিস্তৃত রাষ্ট্রযন্ত্র তাদের কাছে রীতি-মতো আতংকের ব্যাপার।

www.pathagar.com

আট

ভূমি ও কৃষি ব্যবস্থা

বাঙালী বরাবরই কৃষিজীবী—অর্থাৎ এ দেশে খেয়ে-পরে বাঁচার প্রধান উপকরণ বরাবরই কৃষি। অন্য কোনভাবে বাঙালী যে জীবন ধারণ না করতো তা নয়। দৃষ্টান্ত হিসেবে ব্যবসা-বাণিজ্যের কথা বলা যেতে পারে। বস্তুতঃপক্ষে এক সময়ে তো ব্যবসা-বাণিজ্য বেশ জাঁকালো হয়েই উঠেছিলো। সময়টা ছিল খ্রীস্টীয় অষ্টম শতাব্দীর আগে। স্মরণাতীত কাল থেকেই বাংলাদেশের অধিবাসীরা সমুদ্র পাড়ি দিয়েছে। যোগাযোগ স্থাপন করেছে দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার বিভিন্ন দেশের সাথে। বসতি স্থাপন করেছে সেখানে। ক্রমে সভ্যতার জন্ম হলো। লেন-দেন শুরু হলো এক জনপদের সাথে আর এক জনপদের। সমুদ্র পাড়ি দিয়ে লেন-দেনের সম্পর্ক বিস্তৃত হলো। সুদূর রোম থেকে শুরু করে বর্তমান ভিয়েতনাম—সর্বত্র তার ব্যবসায়ের সম্পর্ক। তাম্রলিপ্তি বন্দর তখন জমজমাট। বাংলাদেশের ইতিহাসে সে এক স্বর্ণযুগ।

কিন্তু এ যুগ স্থায়ী হয়নি বেশীদিন। আমাদের দেশের সমাজ বিকাশের যে বৈশিষ্ট্যের কথা এর আগে আলোচনা করেছি, সেই বৈশিষ্ট্যই অনেকটা অমোঘ নিয়মে কাজ করেছে এখানে। ষষ্ঠ-সপ্তম-অষ্টম শতাব্দীর দিকে এখানে সামন্ততন্ত্রের বুনিয়াদ দৃঢ় হওয়ায় সমাজ আরও বেশী করে কৃষিনির্ভর হয়ে ওঠে। কার্যতঃ ব্যবসা-বাণিজ্যের অধ্যায়ের অবসান ঘটে। কৃষিই প্রায় একমাত্র উপজীবিকা হয়ে দাঁড়ায়।

কৃষি-নির্ভর সমাজের কথা আলোচনা করার আগে তাই সর্বপ্রথম ভূমিব্যবস্থার কথা।

ছোট ছোট বসতি, তার চার পাশে চাষের জমি, গো-চারণক্ষেত্র—সেকালে এই ছিল গ্রাম বাংলার চেহারা। মোটামুটি সর্বত্রই একই ধাঁচ। লোকে সেখানে ঘর-বাড়ী তুলে বসবাস করতো তাকে বলা হতো বাস্ত। চাষের জমিকে বলা হতো ক্ষেত্র। তা ছাড়াও ছিল চাষযোগ্য পতিত জমি—তার নাম ছিল খিলক্ষেত্র। আর যে পতিত জমি ছিল চাষের অযোগ্য তাকে

www.pathagar.com

বলা হতো ঊষর। এ ছাড়াও ছিল গরু-ছাগল চরাবার তৃণক্ষেত্র যাকে গো-চর, গো-পথ, গোমার্গ ইত্যাদি নামে অভিহিত করা হতো। সাধারণতঃ এই জমি থাকতো গ্রামের এক প্রান্তে এবং তা ছিল গ্রামবাসীর সাধারণ সম্পত্তি। রাস্তাঘাট, পুকুর, হাটবাজার বা হট্টিকা, মন্দির ইত্যাদি। এভাবে বিভিন্ন প্রয়োজনে বিভিন্নভাবে জমি ব্যবহার করা হতো এবং সে ভাবেই সরকারী দফতরে চিহ্নিত হতো।

জমির মাপ

পঞ্চম শতকের আগে জমির মাপ কি ছিল তা আমরা এখনো জানি না। গুপ্ত যুগেই প্রথম কুল্যবাপ, দ্রোণবাপ পরিমাণ ভূমি অর্থাৎ ভূমি মাপের দুটি মানদণ্ডের উল্লেখ পাই। যে জমিতে ধান বপন করা হয় তাকে বলা হত বাপ ক্ষেত্র। একটি কুলায় যত ধান বা শস্য ধরে তা যে পরিমাণ জমিতে বোনা যেত সেই পরিমাণ জমিকে বলা হতো এক কুল্যবাপ জমি। দ্রোণবাপও সে পরিমাণ নির্দিষ্ট ধরনের শস্য রাখার পাত্রের সাথে সম্পর্কিত। যতদূর জানা যায় এক কুল্যবাপ পরিমাণ জমি ছিল এক দ্রোণাবাপ জমির আটগুণ।

কুল্যবাপ বা দ্রোণবাপ অথবা কোন কোন এলাকায় প্রচলিত আড়বাপ (এটিও শস্য রাখার পাত্রের সাথে সম্পর্কিত) কোনটিতেই যে খুব সুষ্ঠু ও নিখুঁতভাবে জমি মাপা যেত না, তা মাপার ধরন থেকেই বোঝা যায়। প্রথম দিকে জমির টানাটানি ছিল না। কতটুকু জমিতে কতটুকু বীজধান লাগে তাই দিয়ে অর্থাৎ বীজ ধানের পরিমাণ দিয়ে জমির মাপ ঠিক করলেও খুব বেশী অসুবিধা হতো না। কিন্তু তাতে নিখুঁত মাপের কাজ চলে কি করে। রাজার প্রধান আয় যেখানে কৃষির সাথে সম্পর্কিত সেখানে রাষ্ট্রযন্ত্র জটিল হয়ে ওঠার সাথে সাথে ভূমির নিখুঁত মাপের প্রয়োজনীয়তা দেখা দেয়। বস্তুতঃপক্ষে গুপ্ত যুগে প্রথম থেকেই জমির প্রকৃত মাপকাঠি ছিল। কোন ব্যক্তি বিশেষের হাতের মাপে নলের মাপ হতো। নানা লোকের হাতের মাপে নানা নলের উল্লেখ পাওয়া যায়। কোটালীপাড়ায় প্রাপ্ত তাম্রশাসনে শিবচরণী হাতের উল্লেখ দেখা যায়। রামজীবনী হাতের মাপ তো এই সেদিনও নাটোরে প্রচলিত ছিল। চন্দ্র-বর্মন-সেন আমলে পাটক নামে আর একটি নতুন মাপের উল্লেখ দেখা যায়। এ সব থেকেই

www.pathagar.com

মনে হয় নলের মাপই ছিল মোটামুটি সর্বত্র প্রচলিত। তা ছাড়াও বিভিন্ন অঞ্চলে বিভিন্ন মাপ প্রচলিত ছিল। পূর্ব বাংলার সিলেট অঞ্চলে প্রাচীন যুগের রেশ হিসাবে এখনো হাল ও কেদার এর মাপ প্রচলিত আছে।

সেন আমলেই প্রথম মুদ্রামান ও তুলামানের উল্লেখ পাওয়া যায়। জমির চাহিদা বৃদ্ধির সাথে সাথে ক্রমেই নীচের দিকে মাপ ঠিক করে দেবার প্রয়োজনীয়তা অনুভূত হচ্ছিল। জমির দাম সর্বত্র সমান ছিল না। এখনকার টাকায় এক কুল্যবাপ জমির দাম পঞ্চনগরী বিষয়ে অন্ততঃ ১৯২ টাকা, কোটিবর্ষ বিষয়ে অন্ততঃ ১৮৮ টাকা এবং ফরিদপুর অঞ্চলে কম-পক্ষে ৩৮৫ টাকার কম ছিল না (বাঙালীর ইতিহাস-আদিপর্ব—ডঃ নীহার রায়)। জমির দামের তারতম্য নির্ভর করতো জমির ফলন, চাহিদা ইত্যাদির উপর। যা হোক, জমির যে দামের কথা উল্লেখ করা হলো তা থেকে দেখা যায় তখনকার আমলে টাকার ক্রয়শক্তি বিবেচনায় দাম কিন্তু নেহাত কম ছিল না।

ভূমি-ব্যবস্থা

কৃষি প্রধানদেশ হিসাবেই সভ্যতার পথে প্রাচীন বাঙলার অভিযাত্রা। কাজেই স্বাভাবিকভাবেই এ কথা বলা চলে যে, ভূমি ব্যবস্থাই সমাজ-বিন্যাসের গোড়ার কথা। একেবারে গোড়ার দিকে অষ্ট্রিক ভাষাভাষী কৌমগুলি যখন বাঙলার চাষ-বাস প্রচলন করলো তখনকার ভূমি ব্যবস্থা কি ছিল তা আদিম সাম্যবাদী স্তরে আটকে থাকা অন্যান্য কৌমগুলির সামাজিক-অর্থ-নৈতিক অবস্থা থেকে সহজেই অনুমান করা চলে। সে সময়ে অর্থাৎ অতি প্রাচীনকালে জমি নিয়ে, জমির মালিকানা নিয়ে কোন ল্যাঠা ছিল না যে তা বোঝা যায়। জমির মালিকানা ছিল যৌথ, চাষ-বাস ছিল অনুন্নত। যাদের যে রকম জমির দরকার পড়তো জংগল কেটে ততটুকু জমি হাসিল করে নিতো।

ক্রমে সমাজ বিকাশের সাথে সাথে জটিলতা দেখা দিতে শুরু করে। ভূমির উপরে ব্যক্তিগত মালিকানা প্রথা আত্মপ্রকাশ করে। কৃষি নির্ভর সমাজ, কৃষি যেখানে প্রধান উপজীবীকা সেখানে প্রধানতঃ ভূমি-ব্যবস্থার উপরই নির্ভর করে সেই সমাজের শ্রেণী-বিন্যাস, রাষ্ট্রের রূপ, সমাজ ও

www.pathagar.com

ব্যক্তির পারস্পরিক সম্পর্ক। আর সেজন্যই কৃষি-নির্ভর সমাজ জনসাধারণের ইতিহাস যদি জানতে হয় তাহলে প্রয়োজন ভূমি ব্যবস্থার ইতিহাসের পরিচয়।

কিন্তু অসুবিধের ব্যাপার হলো প্রাচীন বাঙলার ভূমি ব্যবস্থা সম্পর্কে যথাযথ জ্ঞান অর্জন প্রায় দুঃসাধ্য ব্যাপার। কৌটিল্যের অর্থশাস্ত্র, প্রাচীন স্মৃতিশাস্ত্র, রামায়ণ মহাভারত থেকে কিছু অনুমান হয়তো করা চলে। কিন্তু মুস্কিল হলো অর্থশাস্ত্র জাতীয় গ্রন্থে প্রধানতঃ প্রচলিত বিধি-ব্যবস্থার উপর ভিত্তি করে কি হওয়া উচিত সে সম্পর্কে বলা হয়েছে। বাস্তবে সে জাতীয় বিধিব্যবস্থা পুরোপুরিভাবে প্রচলিত ছিল কি-না তা বলা কঠিন। রামায়ণ মহাভারতের সাক্ষ্য প্রমাণাদির উপর নির্ভর করে বাংলাদেশের ভূমি-ব্যবস্থা সম্পর্কে অনুমান অনুচিত। কারণ সমগ্র ভারতবর্ষে একই ধরনের ভূমি-ব্যবস্থা প্রচলিত ছিল, এই দাবী অবিশ্বাস্য। তাছাড়া অর্থশাস্ত্রে যে ব্যবস্থা সম্পর্কে বলা হয়েছে পরবর্তীকালে সেই ব্যবস্থার কিছু পরিবর্তন হয়নি এ কথাও জোর করে বলা চলে না। খ্রীস্ট-পূর্ব চতুর্থ বা তৃতীয় শতকে যে ব্যবস্থা ছিল খ্রীস্টীয় তৃতীয় শতকে সেই ব্যবস্থা অব্যাহত ছিল এ দাবী করাও সম্ভব নয়। আর এসব কারণেই অর্থশাস্ত্র জাতীয় গ্রন্থের উপর নির্ভর করে প্রাচীন বাংলার ভূমিব্যবস্থা সম্পর্কে সিদ্ধান্তে আসা সমীচীন কিনা তা বিবেচনা করা দরকার।

তবু অর্থশাস্ত্রের সাক্ষ্য পর্যালোচনা করা প্রয়োজন। অর্থশাস্ত্রের আলোচনা থেকে যতটুকু জানা যায় তাতে দেখা যায় যে, যারা দান হিসাবে জমি পেত তারা ছাড়া আর সবাইকে কর দিতে হতো। তাছাড়া রাজার প্রত্যক্ষ মালিকানায় জমি থাকতো প্রচুর। এই জমির খাজনা দেয়ার প্রশ্ন উঠে না। এই রাজকীয় জমির তদারক ও আয়-ব্যয়ের হিসাব ঠিক করার দায়িত্ব ছিল একজন রাজকর্মচারীর উপর। এই কর্মচারী দাস, কয়েদী ও স্বাধীন ক্ষেত-মজুরদের দিয়ে রাজকীয় জমি চাষের ব্যবস্থা করতো। যে জমিতে তা সম্ভব হতো না সেই জমি পত্তন দিয়ে দেয়া হতো। যার কাছে পত্তন দেয়া হতো, সে যদি গরু মোষ ও চাষের যন্ত্রপাতির যোগান দিতো তাহলে সে পেতো ফসলের অর্ধেক। আর রাষ্ট্র যদি চাষের যন্ত্রপাতির যোগান দিতো তা হলে কৃষক পেতো মোট ফসলের

www.pathagar.com

চার ভাগের এক ভাগ কি পাঁচ ভাগের এক ভাগ। আজকের দিনেও সে ভাবে চাষ প্রথা প্রচলিত আছে, তার সাথে সাদৃশ্য লক্ষণীয়। রাষ্ট্র যেখানে জল সেচের ব্যবস্থা করে দিতো, সেখানে এই কৃষকদের সেজন্যে কর দিতে হতো। কোন কারণে কারো পক্ষে জমি চাষ করা সম্ভব না হলেও করের রেয়াৎ ছিল না। অবশ্য তাদের এ ক্ষেত্রে পুরো কর দিতে হতো না। তবে রাজকীয় জমিতে যারা চাষ করে তারা ছাড়া অন্যান্য কৃষকের কাজের হারে কর আদায় করা হতো। ফসল না হলেও তাদের সে হারেই খাজনা দিতে হতো। রাজার খাস জমি থেকে যে আয় হতো তাকে বলা হতো—সীতা।

সে সময়ে কৃষকদের কি কি কর দিতে হতো সে সম্পর্কে পরে বিস্তৃতভাবে আলোচনা করবো। অর্থশাস্ত্রের কথা প্রসংগে উক্ত গ্রন্থের সাক্ষ্য উল্লেখ করতে গিয়ে উপরে অনুচ্ছেদের কথাগুলো বলা হয়েছে। যদিও সেগুলো এ জায়গায় ঠিক প্রাসংগিক নয়। কারণ, ভূমি ব্যবস্থা সম্পর্কে আলোচনা শুরু করার আগে সে আলোচনার ভিত্তি করে নেয়া উচিত।

বাংলা ভূমি ব্যবস্থা সম্পর্কে আলোচনার সবচেয়ে নির্ভরযোগ্য উপাদান আজ পর্যন্ত আবিষ্কৃত ভূমি দান বিক্রয় সম্বন্ধীয় তাম্রপট্টোলী। এটা সত্য যে ভূমি ব্যবস্থা সম্পর্কে পুরোপুরিভাবে জানতে হলে যে সব তথ্য জানা দরকার, যে সব তথ্যের সম্পূর্ণ পরিচয় জানা একান্তভাবে প্রয়োজন ; তার সব কিছুই এই তাম্রপট্টোলীগুলিতে জানা যায় না। কিন্তু যেটুকু পাওয়া যায় সেটুকু নির্ভরযোগ্য। আর এটুকুর উপর ভিত্তি করে সমাজ বিকাশের ধারার সাথে সংগতিপূর্ণ যুক্তিসিদ্ধ অনুমানও করা চলে। কাজেই ভূমি ব্যবস্থা সম্পর্কে আলোচনা করতে গেলে এই তাম্রপট্টোলীগুলির উপরই নির্ভর করা উচিত। ভারতের অন্যান্য অঞ্চলে বিশেষতঃ উত্তর ভারতে যে ভূমি ব্যবস্থা বিদ্যমান ছিল, স্মৃতিশাস্ত্র পুরাণ প্রভৃতিতে ভূমি ব্যবস্থার ধরনের যেটুকু পরিচয় পাওয়া যায় তার সাথে মিলিয়ে বাংলাদেশের অবস্থা অনুমান করা আরেক কারণে অনুচিত। মনে রাখা দরকার স্মৃতি পুরাণ প্রভৃতি গ্রন্থগুলি ব্রাহ্মণ্য আদর্শের দ্বারা শাসিত সমাজের সৃষ্টি। তার সাথে মনে রাখা প্রয়োজন, শ্রেণী সমাজ পূর্ব সমাজের অগণিত লোক বাংলায় বসবাস করতেন। সে সমাজের রীতি-নীতি

www.pathagar.com

প্রভৃতির প্রভাব এর রেশ পরবর্তীকাল পর্যন্ত টিকে ছিল। ধর্ম, ধ্যান-ধারণা, সমাজ ব্যবস্থা প্রভৃতি সবকিছুতেই এই প্রভাব পরিষ্কার, কাজেই ভূমি ব্যবস্থাতে এ প্রভাব কার্যকর ছিল না এ কথা জোর করে বলা সম্ভব নয়। এ কারণেও ভূমি ব্যবস্থা সম্পর্কে অনুসন্ধানের জন্য তাম্রপট্টোলীগুলির উপর নির্ভর করা উচিত।

যে তাম্রপট্টোলীগুলি পাওয়া গেছে তাতে দেখা যায় যে, যিনি ভূমি কিনতে চাইছেন, তিনি রাজসরকারের কাছে নিজের ইচ্ছে জ্ঞাপন করে আবেদন জানাচ্ছেন। ক্রয়েচ্ছু ব্যক্তি সাধারণ গৃহস্থ বা রাজসরকারের সাথে যুক্ত কর্মচারী যেই হোন না কেন, প্রত্যেককেই জমি কিনতে হলে রাজ-সরকারের কাছে আবেদন জানাতে হতো ; কেন এই ভূমি কিনতে চাইছেন সে উদ্দেশ্যও আবেদনের সাথে জানাতে হতো।

যে ক'টি তাম্রপট্টোলী পাওয়া গেছে তাতে দেখা যায় যে, প্রায় সব ভূমি-ক্রয়ের প্রেরণা যে জমি কেনা হবে তা দেবকার্য বা ধর্মাচারণের জন্যে দানের ইচ্ছে। এই জাতীয় আবেদন যখন রাজসরকারে পেঁছুতো তখন তা পাঠিয়ে দেয়া হতো পুস্তপালের দপ্তরে পুস্তপালের দপ্তর আধুনিক কালের জমির রেকর্ড রুমের মত যেখানে প্রতি খণ্ড জমির বিস্তারিত তথ্যাদি রক্ষিত হতো। যে জমি কেনার জন্য আবেদন জানানো হয়েছে সেই জমি অন্য কারও ভোগ্য কিনা' তা আর কারও অধিকারে আছে কিনা অন্য কেউ সে জমি কেনার জন্যে আবেদন জানিয়েছেন কিনা, জমির দাম ঠিক ঠিক ভাবে নির্ধারিত হয়েছে কিনা ; তাতে রাজসরকারের কোন স্বার্থ আছে কিনা ইত্যাদি সম্পর্কে পুস্তপালের দপ্তরে বিবেচনা করা হতো এবং বিবেচনার পর সম্মতি দেয়া হতো। পুস্তপালের সম্মতি পাবার পর রাজসরকারের পক্ষ থেকে স্থানীয় সরকার যারা জমি কিনতে চান তাঁদের নিকট জমি বিক্রির অনুমতি দিতেন এবং সেই গ্রামের প্রধান প্রধান ব্যক্তি, রাজপুরুষ প্রমুখের সামনে জমির সীমা নির্দেশ করে বা অন্য জমি থেকে আলাদা করে যারা জমি কিনছেন তাঁদের কাছে তা হস্তান্তরিত করে দিতেন। তারপর থাকতো ক্রেতা বা বিক্রেতার পক্ষ থেকে ক্রীত বা বিক্রত ভূমি দানের বিবৃতি। যিনি কিনছেন তিনি তাকে কি উদ্দেশ্যে কোন শর্তে জমি দান করছেন তা বলা হতো।

www.pathagar.com

পঞ্চম শতক থেকে অষ্টম শতকের যে সব তাম্রপট্টোলী পাওয়া গেছে তাতে উপরোক্ত পর্যায়গুলি লক্ষ্য করা যায়। তবে প্রতিটি তাম্রশাসনে যে প্রত্যেক পর্যায়ের উল্লেখ আছে তা নয় বা এ সময়ে কিছুটা অন্য ধরনের তাম্রপট্টোলী যে না পাওয়া গেছে তা-ও নয়।

অনুমান করা হয় বৃহস্পতি-ষষ্ঠ বা সপ্তম শতকের লোক। বৃহস্পতি বলছেন যখন উপযুক্ত মূল্য দিয়ে কোনব্যক্তি কোন বাস্ত ক্ষেত্র বা অন্য কোন ধরনের জমি কেনেন তখন জমির দাম সমেত সবকিছু উল্লেখ করে একটি শাসনে লিপিবদ্ধ করে নেন। এই শাসন হলো জমি কেনার শাসন। কৌটিল্যের অর্থশাস্ত্রের সাক্ষ্য অনুসারে জানা যায় যে, সর্বধরনের জমি পুকুর, ক্ষেত, হ্রদ প্রভৃতি বিক্রি হতো এবং তার একটা সুনির্দিষ্ট পদ্ধতি ছিল। কৌটিল্যের বক্তব্য অনুসারে জমির কেনা-বেচা কুটুম্ব প্রতিবেশী ও সম্পন্ন ব্যক্তিদের সামনে হওয়া উচিত। সবার ভিতর থেকে যিনি বেশী দাম দিয়ে জমি কিনে নিবেন তাঁর কাছেই জমি বিক্রি করতে হবে। ব্যক্তিগত ব্যবহারের জন্য যে সব জমি কেনা হতো সেখানে জমির দামের উপর একটা নির্দিষ্ট কর রাজসরকারে দিতে হতো। আমরা যে সব তাম্রপট্টোলীর উল্লেখ করলাম সেগুলিতে অবশ্য এ জাতীয় করের কোন উল্লেখ নেই। কারণ, কোন জমিই ব্যক্তিগত প্রয়োজনে কেউ কিনছেন না, সবগুলিই কেনা হচ্ছে ধর্মাচরণের উদ্দেশ্যে দানের জন্য। আর এখান থেকেই একটা প্রশ্ন দেখা দেয় খুব স্বাভাবিকভাবে। দেখা যাচ্ছে যে, কোন ক্ষেত্রে কোন গৃহস্থ কোন জমি বিক্রি করছেন না। প্রতিক্ষেত্রে বিক্রি করছেন রাজা বা রাষ্ট্র। আর এ থেকে স্বাভাবিকভাবেই প্রশ্ন জাগে তাহলে কি প্রাচীন বাঙলায় গৃহস্থের জমি বিক্রির কোন অধিকার ছিল না? প্রাচীন বাঙলায় কি কোন সময়ই কোন গৃহস্থ জমি বিক্রি করেন নি? অথচ কৌটিল্যের সাক্ষ্যের কথা এই অনুচ্ছেদই বলা হলো তাতে দেখা যায় যে, একজন গৃহস্থ জমি বিক্রি করতে পারবেন শুধু রাজাকে বা রাষ্ট্রকে বিক্রীত মূল্যের উপর কিছু কর দিতে হতো। নাসিকের (মহারাষ্ট্র) একটি বৌদ্ধ গুহায় উৎকীর্ণ এক লিপি থেকে জানা যায় যে, খ্রীস্টীয় দ্বিতীয় শতকের প্রথমার্ধে দীনীকপুত্র উষরদাত্ত জনৈক ব্রাহ্মণের কাছ থেকে হাজার কার্ষাপণ মুদ্রায় কিছু জমি কিনে উত্তরবৌদ্ধ ভিক্ষু সংঘকে দান করেছিলেন। এখানে জমি কেনা হচ্ছে একজন ব্যক্তিগত মালিকের কাছ থেকে, রাষ্ট্রের

www.pathagar.com

বা রাজার কাছ থেকে নয়। বাংলায় এরূপ লেন-দেন ছিল কি-না এ-প্রশ্ন স্বাভাবিকভাবে দেখা যায়।

অষ্টম থেকে ত্রয়োদশ শতক পর্যন্ত যে পট্টোলীগুলি পাওয়া গেছে তার সবগুলিই ভূমি দানের শাসন, কোনটিই জমি কেনা-বেচার শাসন নয়। কোন কোন শাসনে কোন ব্যক্তি রাজার কাছে ভূমি দানের আবেদন জানাচ্ছে এরূপ উল্লেখ আছে। তবে বেশীর ভাগ শাসন থেকে মনে হয়, রাজা যেন স্বেচ্ছায় ভূমি দান করেছেন। এই দান অবশ্য কোন ধর্ম সংঘকে অথবা ব্যক্তিগতভাবে কোন ব্রাহ্মণকে। সেন আমলের সবগুলি শাসনেই দান গ্রহীতা হয়েছেন ব্যক্তিগতভাবে কোন ব্রাহ্মণ।

অষ্টম শতকের আগের তাম্রশাসনগুলি ও পরবর্তীকালের ত্রয়োদশ শতক পর্যন্ত—শাসনগুলি আলোচনা করলে দেখা যায় যে, অষ্টম শতকের আগে ধর্ম প্রতিষ্ঠানের ব্যয় নির্বাহের জন্য গৃহস্থরা ব্যক্তিগতভাবে দান করছেন। কোনো কোনো ক্ষেত্রে রাজা নিজেও যে দান না করছেন তা নয়, তবে তা ক্রেতার পক্ষ থেকে। আর তার ফলে দানের জন্য অর্জিত পণ্যের ষষ্ঠ ভাগ অর্থাৎ উৎপাদিত ফসলের যে ভাগ রাজস্ব হিসাবে দেয়া হতো তা লাভ করতেন, পরে দেখা যাচ্ছে ধর্ম প্রতিষ্ঠানের ব্যয়-ভার বহনের দায়িত্ব বহন করছেন রাজা। এই পরিবর্তন কেন—এ প্রশ্ন স্বাভাবিকভাবেই দেখা দেয়।

এ জাতীয় সব প্রশ্নের জবাব যে তথ্য আজ পর্যন্ত আমাদের হাতে এসেছে তার ভিত্তিতে দেখা সম্ভব নয়। তবু যতটুকু তথ্য হাতে আছে তা থেকে ভূমির প্রকৃত স্বত্বাধিকারীকে, ভূমিতে রাজা-প্রজার অধিকার, খাস প্রজা, নিঃস্ব প্রজা প্রভৃতি সম্পর্কে আলোচনা করতে চেষ্টা করবো। অষ্টম শতকের আগে সাধারণতঃ তিন প্রকার ভূমির উল্লেখ দেখি—খিলক্ষেত্র, ক্ষেত্র ও বাস্তু। যে ভূমি চাষোপযোগী কিন্তু চাষ হয় না তা খিলক্ষেত্র। জমি পতিত অর্থে খিল শব্দটি এখানে ব্যবহৃত হয়। আর যে শুধু পতিতই নয়, চাষেরও অনুপযুক্ত সে জমিকে শুধু খিল বলা হতো। যে জমি কর্ষণযোগ্য ও চাষর মধ্যে আছে সে জমিকে বলা হতো ক্ষেত্র। আর যে জমিতে লোক ঘর-বাড়ী তৈরী করতো তাকে বলা হতো বাস্তু। এ ধরনের জমি ছাড়া আরও নানা ধরনের জমির উল্লেখ লিপি-

www.pathagar.com

গুলিতে পাওয়া যায়। দৃষ্টান্ত হিসাবে গো-চর, গোমার্গ, গর্ত, উষর প্রভৃতি ধরনের ভূমির কথা উল্লেখ করা যেতে পারে।

এ সময়ে এ জমি কি ভাবে মাপা হতো তাও লিপিগুলির সাক্ষ্য থেকে জানা যায়। এ সময়ে ভূমির সব মানই হচ্ছে শস্যমান। যে পরিমাণ জমিতে এক কুল্যশস্য বপন করা যায় তাহা এক কুল্যবাপ জমি। অনেকে কুল্য বলতে বাংলাদেশের কুলা বুঝাতে চেয়েছেন। তাঁদের মতে এক এক কুলায় যতটুকু বীজ ধরে তার সবটুকু যে পরিমাণ জমিতে বপন করা যায় তাই এক কুল্যবাপ।

দ্রোণ বলতে বুঝাতো কলস। বাংলাদেশের পল্লীগ্রামে এই দ্রোণ বর্তমানে দোনে রূপান্তরিত হয়েছে। এক দ্রোণ শস্য যে পরিমাণ জমিতে লাগান যেত তা ছিল এক দ্রোণবাপ জমি। তেমনি এক আঢ়া শস্য যে পরিমাণ জমিতে বপন করা হতো তাই ছিল আঢ়বাপ ভূমি। আঢ়া শব্দটি এখনো প্রচলিত। কুল্যবাপ, দ্রোণবাপ ও আঢ়বাপের মধ্যে সম্পর্ক ছিল নিম্নরূপ :—

৪ আঢ়বাপ= ১ দ্রোণবাপ

৮ দ্রোণবাপ= ১ কুল্যবাপ।

অবশ্য কুল্যবাপের মাপ নিয়ে মতান্তর আছে। মেদিনী কোষের মতে ১ দ্রোণ=১ কুল্য। জমি মাপ হতো নলের সাহায্যে। বিভিন্ন তাম্রশাসনে নলের বিভিন্ন মাপ উল্লেখ করা হয়েছে।

আজকাল প্রচলিত জমির মাপ অনুসারে ১ কুল্যবাপ জমির পরিমাণ কি তা নির্ণয় করারও চেষ্টা হয়েছে। কাছাড়ের ইতিবৃত্ত লেখক উপেন্দ্রচন্দ্রগুহ মহাশয় বলেন যে, ঐ জেলায় এক কুল্যবাপ জমি ১৪ বিঘার সমান। দীনেশচন্দ্র সরকার মহাশয় অনেক অনুমানসিদ্ধ প্রমাণের সাহায্যে দেখাইতে চেষ্টা করিয়াছেন যে, এক কুল্যবাপ ভূমি অন্ততঃপক্ষে ৪০-৪২ একর অর্থাৎ প্রায় ১২৫ বিঘার কম ছিল না। এ সম্বন্ধে নিশ্চয় করিয়া কিছুই বলিবার উপায় নাই তবে লীলাবতির আর্যার সাক্ষ্য যদি প্রামাণিক হয় এবং কুড়বা যদি বিঘার সমার্থক হয় তাহা হইলে ১ কুল্যবাপ ৫১২ বিঘা হওয়া উচিত। কিন্তু কুড়বা ও বিঘা সমার্থক কিনা এ বিষয়ে সন্দেহ আছে। (ডঃ নীহার রায় প্রণীত বাংগালীর ইতিহাস হইতে উদ্ধৃত পৃঃ ২৩২)।

www.pathagar.com

তাম্রপট্টোলীগুলি বিশ্লেষণ করলে যে যুগের কথা আলোচনা হচ্ছে সে যুগে জমির দাম কি ছিল সে সম্পর্কে কিছু তথ্য পাওয়া যায়। দামোদরপুর পট্টোলীগুলির কতকগুলি থেকে জানা যায় যে, শতাধিক বৎসর জুড়ে পুণ্ড্রবর্ধন ভুক্তির কোটী বিষয়ে ১ কুল্যবাপ জমির দাম ছিল ৩ দীনার। ফরিদপুর অঞ্চলে প্রাপ্ত পট্টোলীগুলি বিশ্লেষণ করলে জানা যায় যে, প্রায় পঞ্চাশ বছর জুড়ে এ অঞ্চলে ১ কুল্যবাপ জমির দাম ছিল ৪ দীনার। দিনাজপুর ও বগুড়া জিলার সীমান্তে অবস্থিত পঞ্চনগরী বিষয়ে ১ কুল্যবাপ জমির দাম ছিল ২ দীনার।

জমির চাহিদা বৃদ্ধির সাথে সাথে জমির দাম বৃদ্ধি পাওয়া স্বাভাবিক। পাল আমলে ও সেন আমলে জমির চহিদা বাড়ছিল। কিন্তু এ সময়ে জমির দাম কি ছিল তার সরাসরি কোন প্রমাণ নেই। তবে চাহিদা বৃদ্ধির সাথে সাথে দাম বাড়বে এটা স্বাভাবিক ; কিন্তু পাল আমলের সব জমির দাম ধীরে ধীরে বাড়লেও দেখা যায় যে, কোটিবর্ষ বিষয়ে একশ বছর জুড়ে জমির দাম স্থিতিশীল ছিল। কাজেই জমির দাম বাড়লেও বৃদ্ধির হার ছিল খুবই ধীর এটা বলা যায়।

জনসংখ্যা বৃদ্ধির সাথে সাথে জমির চাহিদা বাড়বে এটা স্বাভাবিক। যে তাম্রশাসনগুলি আমাদের হাতে এসেছে তা খ্রীস্টীয় পঞ্চম শতক থেকে অবশ্য মহাস্থান লিপির কথা বাদ দিয়েই কথাটা বলা হলো। পাহাড়পুর লিপিতে দেখা যাচ্ছে জনৈক নাথশর্মা একটি জৈন বিহারের জন্য ১ কুল্যবাপ ৪ দ্রোণ জমি দান করছেন। এই জমি কিন্তু নাথশর্মা ১টি গ্রামে সংগ্রহ করতে পারেন নি। ৪টি গ্রাম থেকে তা সংগ্রহ করতে হয়েছিল। এ থেকে দেখা যায় জমির চাহিদা তখন যথেষ্ট বৃদ্ধি পেয়েছে। তা না হলে এক গ্রাম থেকে উক্ত জমি সংগ্রহ হবে না কেন? আরও পরবর্তীকালে রাজা বিশ্বরূপ সেনের তাম্রশাসন থেকে জানতে পারি যে, রাজা বিশ্বরূপ সেন হলায়ুধ শর্মাকে পণ্ডিত সম্পর্কে ৩৩৬ উম্মাস জমি দান করছেন। এই জমি ছয়টি গ্রামে ছড়ানো ছিল।

ক্রমে জমির চাহিদা যে বাড়ছিল তা উপরোক্ত লিপি থেকেও বোঝা যায়। রাজা বিশ্বরূপসেন পণ্ডিত হলায়ুধ শর্মাকে যে পরিমাণ জমি দান করেছিলেন তা একজনের ভরণ-পোষণের জন্যে প্রয়োজনীয় ভূমির চেয়ে যে বেশী সে কথা বুঝতে অসুবিধে হয় না। এই পরিমাণ জমি নিয়ে

www.pathagar.com

হলায়ুধ শর্মা ছোট-খাট ভূম্যাধিকারীতে যে পরিণত হয়েছিলেন সে ব্যাপারে সন্দেহ নেই। দান গ্রহীতা এ ক্ষেত্রে রাজসরকারে কোন করই দিতেন না, অপরদিকে প্রজাদের কাছ থেকে সবরকম করই তিনি নিতেন। প্রয়োজনাতিরিক্ত ভূমির মালিক হবার দিকে ঝোঁক যে ক্রমেই বাড়ছিল, ভূমির স্বত্বাধিকারও যে ক্রমে কেন্দ্রীভূত হচ্ছিল তার সুস্পষ্ট আভাস পাওয়া যায় এ সব থেকে।

লিপিগুলি থেকে কর কত প্রকার ছিল তা পুরোপুরিভাবে জানার উপায় নাই। তবে উৎপণ্য শস্যের ছয়ভাগের একভাগ ছিল রাষ্ট্রের প্রাপ্য। তাম্রপট্টোলীগুলির সাক্ষ্য থেকে জানা যায় যে, খেয়া পারাপার ঘাট, হাট-বাজার, অরণ্য প্রভৃতির জন্য কর দিতে হতো। লবণের জন্যেও কর দিতে হতো প্রজাদের। কৌটিল্যের মতে লবণের উপরে ছিল রাষ্ট্রের এক-চেটিয়া অধিকার। কাজেই যাঁরা তা ভোগ করবেন তার জন্য কর দিতে হবে এটা স্বাভাবিক।

লিপিগুলির সাক্ষ্য থেকে যতদূর জানা যায় তাতে সুনির্দিষ্টভাবে একথা বলা চলে যে রাষ্ট্র নিশ্চিতভাবে ভূমির চারপ্রকার উপস্বত্বের অধিকারী ছিলেন তা হলো ভাগ, ভোগ, কর, হিরণ্য। ভাগ বলতে বুঝায় রাষ্ট্রের প্রাপ্য নির্দিষ্ট পরিমাণ শস্যের ভাগ। এইভাগ ছিল এক ষষ্ঠাংশ। যতটুকু সাক্ষ্য প্রমাণ পাওয়া গেছে তা থেকে এ ব্যাপারে সুনির্দিষ্টভাবেই বলা যায়। চাষের জমি বুঝে অনেক সময় যে বেশীও দিতে হতো না তা নয়। অর্থশাস্ত্রে উৎপন্ন ফসলের চার ভাগের-একভাগ বা তিন ভাগের একভাগ দেবারও কথা আছে। শুক্রনীতি একটি মধ্যযুগীয় গ্রন্থ। সেখানে উৎপন্ন ফসলের ছয়ভাগ 'অংশ' 'ভাগ' হিসাবে দেবার কথা ছাড়াও সবচেয়ে ভাল জমিতে অর্ধেক আয়ের বিধানও দেয়া হয়েছে। 'ভাগ' ছিল কৃষকদের দেয় নিয়মিত কর। আর এই ভাগ ছিল উৎপাদিত ফসলের এক ষষ্ঠাংশ বা উর্বরতা বুঝে তার চেয়েও বেশী। 'ভাগ' যে কৃষকদের দেয় নিয়মিত কর ছিল সে কথা ইতিপূর্বেই উল্লেখ করা হয়েছে।

এ ছাড়া রাজার ভোগের জন্য ফল-ফুল-কাঠ ইত্যাদি দিতে হতো। এই করের নাম ভোগ। ভাগ ও ভোগ দুইই ছিল উৎপন্ন দ্রব্যের অংশে দেয় কর। এ ছাড়াও মুদ্রায় যে রাজস্ব দেয়া হতো তার নাম 'কর'। এই 'কর' ছিল সাধারণতঃ তিন প্রকার :—(ক) রাজার পাওনা ফসলের

www.pathagar.com

নির্দিষ্ট অংশ ছাড়াও নির্ধারিত সময়ে দেয় মুদ্রা কর ; (খ) আবাদ ফসলে দেয় কর ; (গ) বণিকব্যবসায়ীদের লাভের উপর দেয় কর।

আক্ষরিক অর্থে হিরণ্য শব্দের অর্থ সোনা। এই হিরণ্য বলতে রাজস্বের কোন ধরন বুঝাতো তা বলা কঠিন। তবে কারও কারও মতে রাজা সব শস্যেরভাগ গ্রহণ করতেন না। তার বদলে গ্রহণ করতেন মুদ্রা। আর সেই মুদ্রাই হলো হিরণ্য।

এই সব নিয়মিত কর ছাড়াও আরোও নানা ধরনের করের কথা আমরা জানতে পারি। রাষ্ট্র চোর-ডাকাতের হাত থেকে প্রজাদের জানমাল রক্ষার দায়িত্ব নিবে সেই জন্যে কর। দশ রকমের অপরাধের বিচারে যে জরিমানা হত সেটাও কার্যতঃ ছিল এক ধরনের রাজস্ব। তার উপরে ছিল উপরি কর—জমির অস্থায়ী প্রজাদের কাছ থেকে এই কর আদায় হত। স্থায়ী প্রজাদের কাছ থেকে আদায়কৃত করকে বলা হত উদরংগ। উপরি কর এবং উদরংগ দুই ছিল খাস জমির সাথে সংশ্লিষ্ট। অনেক সময় প্রতি কৃষকের উপর আলাদা আলাদাভাবে কর ধার্য না করে গোটা গ্রামের উপর এক সাথে কর ধার্য করা হত। এই করকে বলা হত পিণ্ড কর। রাজপুরুষরা নানাকাজে যখন কোনখানে ছাউনি ফেলতেন তখন তাদের খরচ জোগাতে হত সেই এলাকার প্রজাদের। এই জন্য যে কর দিতে হত তাকে প্রাচীন শাস্ত্রগ্রন্থাদিতে বলা হয়েছে পীড়া। রাজকীয় জমিতে বিনা পারিশ্রমিকে কাজ করতে হত সময় সময়। যুদ্ধ প্রভৃতি সময়ে বাধ্যতামূলক শ্রমেরও বিধান ছিল। এমনিভাবে প্রজাদের উপর সে সময়ে বিদ্যমান ছিল করের প্রচণ্ড বোঝা। অনেক সময় এই বোঝা দুঃসহ হয়ে উঠত। কেউ কেউ মনে করেন যে, অতিরিক্ত কর ধার্য করার জন্যেই নাকি শেষ পর্যন্ত মৌর্য বংশের পতন ঘটে।

যে সব তাম্রশাসন আমাদের হাতে এসেছে তার সবগুলিই কোন ধর্ম প্রতিষ্ঠান অথবা কোন গ্রাম্য পণ্ডিত বা শাস্ত্রজ্ঞ ব্যক্তিকে ভূমিদান সংক্রান্ত দলিল। এই সম্পর্কে ইতিপূর্বে বলা হয়েছে। এছাড়াও আর এক ধরনের জমি দানের উল্লেখ পাওয়া যায় প্রাচীন শাস্ত্রাদিতে। সরকারী কর্মচারীদের ব্যয় নির্বাহের জন্যে নির্দিষ্ট পরিমাণ ভূমি দেওয়া হত। মনু সংহিতা ও মহাভারতে এ সম্পর্কে বলা হয়েছে (ক) দশ গ্রামের অধিপতি পাবে এক কুল্যবাপ ভূমি ; (খ) বিশ গ্রামের অধিপতি পাবে পাঁচ কুলবাপ

www.pathagar.com

ভূমি ; (গ) একশ গ্রামের অধিপতি পাবে একটি গ্রাম ; (ঘ) হাজার গ্রামের অধিপতি পাবে একটি শহর। ভূমিদান সম্পর্কে হিউয়েনসানও বলেছেন—"রাষ্ট্রের মন্ত্রী ও কর্মচারীদের প্রত্যেকের জন্য আছে বরাদ্দকৃত ভূমি, তাদের জন্য বরাদ্দ শহর থেকে তাদের ব্যয়নির্বাহ হয়"। মৌর্য বা গুপ্ত আমলে বাংলায় এ নিয়ম প্রচলিত ছিল। এটা সহজেই অনুমান করা চলে।

ভূমি ব্যবস্থা সম্পর্কে যেটুকু আলোচনা করা হল তা থেকে স্বাভাবিক-ভাবেই যে প্রশ্নের উদ্রেক হয় তা হলো—সেই যুগের ভূমির প্রকৃত মালিক কে ছিলেন—রাজা, না জনসাধারণ। তা ছাড়াও যে প্রশ্নটি সম্পর্কে সুনির্দিষ্টভাবে উত্তর জানার প্রয়োজন তা হল—ভূমির স্বত্বাধিকারী কে।

সমাজ বিকাশের ধারা অনুসরণ করলে এ কথা বুঝতে অসুবিধা হয় না যে, একসময়ে ভূমির মালিকানা ছিল সমস্ত জনসাধারণের। গ্রামে তখন ছিল স্বরাজ্য। যে সময়ের কথা আমরা আলোচনা করছি সে সময়েও ভূমির উপরে জনসাধারণের যৌথ মালিকানার কিছু স্মৃতি টিকে ছিল। পথ, ঘাট, গোবাট, গোচর প্রভৃতি সমস্ত গ্রামের যৌথ সম্পত্তি বলে বিবেচিত হত। স্বর্গীয় অক্ষয় কুমার মৈত্রেয় তাঁর 'গৌড় লেখমালা' শীর্ষক পুস্তকের অবতরণিকায় বলেছেন "কাহারও প্রার্থনা ক্রমেই হউক অথবা স্বতপ্রবৃত্ত হইয়াই হউক, রাজা কাহাকেও জমিদান করিতে প্রবৃত্ত হইলেই, প্রকৃতিপুঞ্জকে সম্বোধন করিয়া মতমস্ত ব্যবধান বলিয়া সম্মতি গ্রহণ করিতেন"। একসময়ে জমির উপরে প্রজাদের যে স্বত্বাধিকার ছিল, উপরোক্ত রীতি তারই স্মারক বলে মনে হয়।

সমাজের বিবর্তনের সাথে সাথে সমাজে শ্রেণীবিভাগ দেখা দিল। রাষ্ট্রযন্ত্র বিকশিত হল। ক্রমে এই ধারণার সৃষ্টি হল যে রাজা এবং রাষ্ট্রই সমাজ ব্যবস্থার ধারক ও নিয়ামক। আর সেই যুগে সমাজ ব্যবস্থার ভিত্তি ছিল ভূমি-ব্যবস্থা। কাজেই ক্রমে এই ধারণা প্রসারলাভ করলো যে রাজা বা রাষ্ট্র শুধু ভূমি ব্যবস্থার নিয়ামক নয়, দেশের সমস্ত ভূ-সম্পত্তির মালিক। এ ধারণা প্রসারের পিছনে একটি কারণ ছিল রাষ্ট্রীয় খরচে সেচকার্য। সেচের দায়িত্ব ছিল রাজার। বাঙালী রাজাও সেচকার্যের দায়িত্ব যে গ্রহণ করতেন তার প্রমাণ পাওয়া যায়। গংগা-যমুনা-সরস্বতি সংগমে বল্লালসেন একটি বাঁধ নির্মাণ করেন। রামপাল সম্পর্কে বলা হয় যে,

www.pathagar.com

চাষবাসের প্রয়োজন নির্বাহের জন্য অনেকগুলো বড় বড় দীঘি কাটিয়েছিলেন। সেচকার্যে রাজার এ দায়িত্বের জন্যই দেশের সমস্ত ভূ-সম্পত্তির মালিকানা রাজার এই চেতনাক্রমে দানা বেধে উঠতে থাকে।

তা হলে ব্যাপারটা দাঁড়ালো এই, রাজ্যের সকল ভূমির মূলে মালিক ছিলেন রাজা বা রাষ্ট্র। যখন কাউকে নিষ্কর করে ভূমি দান করতেন তখনও ভূমির উপরে তার মূল অধিকার চলে যেত না।

যদিও ভূমির মূল অধিকার ছিল রাজার তথাপি সে সময়ে জমির উপর ব্যক্তিগত অধিকারও ছিল। ফরিদপুর জেলার গোপচন্দ্রের তাম্রশাসনে জানা যায় যে, বৎস পালস্বামী নামে এক ব্রাহ্মণ এক কুল্যবাপ জমি কিনেছিলেন। এই লিপির সব জায়গা পাঠোদ্ধার করা যায় নি। তবে যেটুকু বোঝা গেছে এ থেকে এটা নিঃসংশয়ে বলা চলে যে, এই জমি একাধিক ব্যক্তির ব্যক্তিগত সম্পত্তি ছিল। কিন্তু এই সম্পত্তি কেনার জন্যেও ক্রেতাকে স্থানীয় রাজ সরকারে আবেদন জানাতে হয়েছিল। এ থেকে বোঝা যায় যে, জমির উপরে একদিকে যেমন ব্যক্তিগত অধিকার ছিল অন্যদিকে রাষ্ট্র ছিল ভূমির মূলে মালিক। আসরফপুর তাম্রশাসন থেকে আমরা জানতে পারি যে, রাজা দেব খড়্গ একটি বৌদ্ধবিহারে প্রথম দফায় নয় পাটক দশ দ্রোণ এবং দ্বিতীয় দফায় ছয়পাটক দশ দ্রোণ জমি দান করেছিলেন। এই জমির বেশীর ভাগ ছিল বিভিন্ন ব্যক্তির ব্যক্তিগত অধিকারে। ব্যাপারটা আজকের দিনে অবাক মনে হতে পারে। সে সময়ে রাজা বা রাষ্ট্র জমির প্রকৃত মালিক ছিলেন বলেই এভাবে অন্যের অধিকারের জমি রাজার পক্ষে দান করা সম্ভব হয়েছিল।

এই লিপি থেকে আর কিছু তথ্য জানা যায়। যেমন, এখানে আছে যে এক পাটক জমি ভোগ করতেন শর্বন্তি নামে এক ব্যক্তি। কিন্তু তা চাষ করতেন মহত্তর শিখর নামে কৃষকেরা। তার মানে এই জমির স্বত্বাধিকারী ছিল শর্বন্তি। যে কৃষকেরা জমি চাষ করতো তাদের জমির উপরে কোন স্বত্ব ছিল না। কৃষকেরা কি শর্তে জমি চাষ করতো তাদের অবস্থা আজকের দিনে ভাগ চাষীদের মত ছিল কি-না তা বলার উপায় নেই। তবে এ থেকে বোঝা যায় সে সময় জমির মধ্য স্বত্বাধিকারীর নীচেও প্রজার অন্ততঃ একটি স্তর ছিল। এই লিপি থেকে আরো জানা যায় যে, সে সময়ে মহিলারাও জমির মালিক হতে পারতেন। এই লিপি থেকে

www.pathagar.com

জানা যায় হাফপাটক জমির শুভংসুকা নামে এক মহিলার ভোগ দখলে ছিল। এই লিপি থেকে আরো জানা যায় যে, একাধিক ব্যক্তি ব্যক্তিগত-ভাবে একই ভূখণ্ডের অধিকারী হতে পারতেন।

পাল ও সেন আমলে যে তাম্রশাসনগুলি পাওয়া গেছে তার বেশীর ভাগই হল গ্রাম দানের দলিল। রাজা যখন এভাবে গ্রামদান করতেন তখন সেই গ্রামে গ্রামবাসীদের যে ব্যক্তিগত সম্পত্তি থাকতো তা সমেতই দান করতেন। তার মানে ব্যক্তিগত ভূ-সম্পত্তি মালিকরা ঐ সময়ে রাষ্ট্রকে দেয় করসমূহ রাষ্ট্রকে না দিয়ে দানগ্রহিতাকে দিতেন। এভাবে ভূমিতে রাজা ও প্রজার মাঝে মধ্যস্বত্বাধিকারী তৈরী হচ্ছিল। রাজা বা রাষ্ট্র ইচ্ছা করলে প্রজার উচ্ছেদ সাধন করতে পারতেন। ভূমিতে অধিকারবিহীন প্রজার অস্তিত্ব সে যুগেও বিদ্যমান ছিল। এরা ছিল জমিতে অধিকার-বিহীন চাষী প্রজা। এদের অবস্থা যে ঠিক কি ছিল তা জানার উপায় নেই। তবে অনুমান করা চলে যে, তা মোটেই ভাল ছিল না। জমির উপরে ব্যক্তিগত অধিকার সে সময়ে স্বীকৃত ছিল। ব্যক্তিগত অধিকারের জমি হস্তান্তরিত হত। জমির উপরে এজমালীর স্বত্ব স্বীকৃত হত, মেয়েরা জমির মালিক হতে পারতেন, মধ্যস্বত্ব অস্বীকৃত ছিল না।

এ সব থেকে বুঝা যায় যে, সমাজে নীচুতলার মানুষ চাষী প্রজার অবস্থা সে কালে মোটেই ভাল ছিল না। বিভিন্ন প্রকার করের বোঝাত ছিলই তার উপরে ছিল সে কালের সর্বশক্তিমান সম্রাট। দণ্ডমুণ্ডের কর্তা সম্রাটের অধীনে এদের অবস্থা যে কি ছিল তা সহজেই অনুমান করা যেতে পারে। পাছে চাষাবাসের কাজে বাধ্য হয় সে জন্য চাষী প্রজাদের নির্দোষ আমোদ্-প্রমোদ পর্যন্ত নিষিদ্ধ করার বিধান দেওয়া হয়েছিল অর্থশাস্ত্রে। এই ছিল সে কালের অবস্থা।

www.pathagar.com

নয়

ঐশ্বর্য

সকাল থেকে শুরু করে রাত্তিরে শুতে যাওয়া পর্যন্ত কত জিনিসেরই না প্রয়োজন পড়ে আমাদের। খাওয়া-পরা-থাকার প্রাথমিক প্রয়োজন তো আছেই— তা ছাড়া আরও কত ধরনের প্রয়োজন। আর এই প্রয়োজন বা চাহিদা মেটাবার জন্যেও কত ধরনের জিনিসেরই না প্রয়োজন পড়ে। সূর্যের আলো বা বাতাসের মত প্রাকৃতিক জিনিসের কথা হচ্ছে না (অবশ্য আধুনিক পুঁজিবাদী সভ্যতার দৌলতে এগুলিও সবার কাছে সমান সুলভ নয়)। এ ছাড়াও আমাদের যে সব জিনিসের দরকার হয়, একটু লক্ষ্য করলেই দেখা যাবে, তাদের কোনটিই মানুষের শ্রম ছাড়া তৈরী হয়নি। প্রকৃতিদত্ত জিনিসকে মানুষ নিপুণ হাতে, নতুন করে চাহিদা মেটাবার উপযোগী করে গড়ে তোলে। যা ছিল প্রকৃতিদত্ত তাই ঐশ্বর্য হয়ে ওঠে। মানুষের অসংখ্য চাহিদা মেটাবার জন্য যা প্রয়োজন তাই ঐশ্বর্য।

একজন মানুষের প্রয়োজন মেটাবার জন্যে যা দরকার তা তারও একার পক্ষে তৈরী করা সম্ভব নয়। তার জন্য দরকার আরও দশ-জনের সহযোগিতা। বলতে গেলে গোটা সমাজ বা তার চাইতেও ব্যাপক-সংখ্যক মানুষ তাতে অংশ গ্রহণ করে। আবার যুগে যুগে চাহিদা মেটাবার উপকরণসমূহ তৈরী করার পদ্ধতি বদলায়। ফলে, সমাজও তার সাথে সাথে আনুষঙ্গিক আর সব কিছু বদলে যায়। এক কথায় ইতিহাস মোড় ফেরে। ইতিহাস আলোচনা করতে গেলে তাই ঐশ্বর্য কোত্থেকে আসে তার খোঁজ-খবর নেওয়া দরকার।

অন্যসব দেশের মত বাংলাদেশেও একেবারে আদ্যিকালে ঐশ্বর্যের উৎস ছিল শিকার। পরবর্তীকালে কৌম-সমাজের একটা স্তরে এসে কৃষির সূচনা হয়। তার আরও পরে এসে শুরু হয় ছোট ছোট গৃহ শিল্প। ঐশ্বর্য উৎপাদনের এটাই ছিল প্রথম স্তর। দ্বিতীয় স্তরে অপেক্ষাকৃত উন্নত কৃষি ও গৃহশিল্প ঐশ্বর্য উৎপাদনের অন্যতম প্রধান উপায়। এ

www.pathagar.com

সময় ঐশ্বর্য উৎপাদনের ক্ষেত্রে প্রধান না হলেও গুরুত্বপূর্ণ ছিল ব্যবসা-বাণিজ্য। অষ্টম শতকের পর থেকে ব্যবসা-বাণিজ্যের উল্লেখ তেমন দেখা যায় না। এ সময় থেকে বলতে গেলে কৃষিই ঐশ্বর্য উৎপাদনের একমাত্র উৎস হয়ে দাঁড়িয়েছে। বাঙালী জীবন এ সময় থেকে একান্তভাবেই ভূমি-নির্ভর। বাংলার ইতিহাসে ঐশ্বর্য উৎপাদনের এটি তৃতীয় স্তর।

কৃষি

কৌম যুগের আদিম কৃষির স্তর পার হয়ে এ দেশে অপেক্ষাকৃত উন্নত-কৃষি শুরু হয়েছে বহু আগে। খ্রীস্টজন্মের বেশ কয়েক শ' বছর আগে তো এ বিষয়ে প্রত্যক্ষ প্রমাণই পাওয়া গেছে।

কৃষি বরাবরই বাংলাদেশে ঐশ্বর্য উৎপাদনের প্রধান উৎস। অষ্টম শতক থেকে এর গুরুত্ব আরও বৃদ্ধি পায়। তখন থেকে বলতে গেলে এটাই হলো প্রধানতম উৎস। অষ্টম শতক থেকে নানা সূত্রে কর্ষক, ক্ষেত্রকর ইত্যাদি শব্দের উল্লেখও দেখা যায় বার বার। আগের তুলনায় এ সময় এই উল্লেখ অনেক বেশী। এ থেকে সমাজে কৃষির বর্ধিত গুরুত্বের কথা অনুমান করা যায়। কোথাও জমি দান-বিক্রি করতে হলে অন্যান্য প্রতিষ্ঠাবান লোকদের সাথে কৃষকদেরও সে সম্পর্কে জানাতে হত। সমাজে তখনো কৃষকরা যে একেবারে অপাংক্তেয় হয়ে যায়নি এটাই তার প্রমাণ। পঞ্চম, ষষ্ঠ, সপ্তম শতকের তাম্রপট্টোলীগুলি থেকে দেখা যায় লোক ক্রমেই বেশী করে জমি চাইছে—জমি কিনছে বেশী বেশী করে। চাষবাস যে বেড়ে চলেছে এটা তারই প্রমাণ। লোকে পতিত জমি হাসিল করছে, জঙ্গল কেটে জমি আবাদ করছে এ সময়। ত্রিপুরায় প্রাপ্ত একটি তাম্র-পাট্টোলী এ বিষয়ে একটি চমৎকার উদাহরণ। রাজা একদল ব্রাহ্মণকে বসবাস ও চাষবাসের জন্য জঙ্গলাকীর্ণ জমি দিচ্ছেন। সে জমির বিবরণ দিতে গিয়ে তাম্রপট্টোলীতে বলা হয়েছে, "সেখানে হরিণ, মোষ, শূকর, বাঘ, সাপ প্রভৃতি ইচ্ছেমত সব রকম গার্হস্থ্য সুখ উপভোগ করে। অনেকটা আজকের যুগে সুন্দরবন হাসিল করে বসবাস করার মতো। ষষ্ঠ, সপ্তম, অষ্টম শতক থেকে চাষবাস ক্রমেই যে বেড়ে যাচ্ছিলো তা আরও একটি ঘটনা থেকে বোঝা যায়। গোড়ার দিকে জমি ছিল অঢেল। চাহিদাও এত ছিল না। তাই জমির মাপজোখের খুব নিখুঁত ব্যবস্থা

www.pathagar.com

বোধ হয় তখনো হয়ে ওঠেনি। একদিকে চাষের যত প্রসার হতে লাগল, জমির উপর ব্যক্তিগত দখল যত দৃঢ় হতে লাগল, ততই একখণ্ড জমি থেকে আর এক খণ্ড জমিকে আলাদা করার ব্যবস্থাও ততবেশী করে পাকা-পোক্ত করা হলো। এ সময় প্রাপ্ত তাম্রশাসনগুলি থেকে দেখা যায় তুষ ও অঙ্গার দিয়ে একটা ক্ষেত থেকে অন্য ক্ষেতকে আলাদা করার ব্যবস্থা করা হচ্ছে।

পঞ্চম, ষষ্ঠ, সপ্তম শতক বাংলাদেশে কৃষির সম্প্রসারণের যুগ। ব্যবসা-বাণিজ্যের সম্প্রসারণের ফলে এ সময় সাধারণ লোকের হাতেও পয়সা আসছিল। অপরপক্ষে রাজঅনুগ্রহে ব্রাহ্মণদের মাঝেও অনেকে প্রচুর ভূ-সম্পত্তির মালিক হয়ে বসছিল এ সময়। রাজসরকার থেকে তাদের যে পতিত জমি দেওয়া হচ্ছিলো সেগুলো তারা কর্ষণোপযোগী করে তুলছিল। বহু ধর্মীয় প্রতিষ্ঠানও এ সময় প্রভূত সম্পত্তি মালিক হয়ে বসেছিল।

আগ যাই থেকে থাকুক না কেন, সপ্তম শতকে কৃষি যে দেশবাসীর প্রধান উপজীবিকা হয়ে দাঁড়িয়েছিল এ ব্যাপারে সন্দেহ নেই। ইউ এনথ্-সাঙ-এর বিবরণ থেকে এ সম্পর্কে কিছুটা জানা যায়। তাঁর লেখা থেকে জানা যায়, প্রদেশের সব অঞ্চলেই রীতিমত চাষবাস হতো—ফল-ফুল-ফসল পাওয়া যেত অপর্যাপ্ত। রামচরিতে বরেন্দ্রীর বর্ণনা থেকেও শস্য-সমৃদ্ধ গ্রামাঞ্চলের পরিচয় মেলে।

প্রাচীনকালে কোন্ কোন্ ফসল ও ফল-মূল এদেশে উৎপাদিত হতো তার সঠিক বিবরণ জানার উপায় নেই। তবে বিভিন্ন সূত্রে যতটুকু জানা যায় তাতে একটা কথা জোর করেই বলা চলে যে, এ দেশে প্রধান খাদ্য (Staple food-crop) হিসাবে ধানের চাষ অতি প্রাচীনকাল থেকে প্রচলিত। মহাস্থানে প্রাপ্ত শিলালিপিতে পুণ্ড্রনগরে রাজকীয় ধানের গোলার উল্লেখ আছে। দুঃস্থ প্রজা ও ভিক্ষুকদের ধান কর্জ দেবার জন্য মহামাত্রকে আদেশ দিচ্ছেন সম্রাট। তিনি বলছেন—প্রজারা যখন বিপদ কাটিয়ে উঠবে তখন রাজভাণ্ডার ধান দিয়ে ভরে দেবে। রাম চরিতের বর্ণনা থেকে জানা যায় বিভিন্ন ধরনের ধান জন্মাতো বরেন্দ্রীতে। অসংখ্য গ্রামে প্রচুর পরিমাণে উৎকৃষ্ট ধান জন্মাতো। এ কথা জানা যায় সেন রাজা-দের লিপিতে। এ সব থেকে বোঝা যায় সাধারণ মানুষের, কৃষকের প্রধান অবলম্বনই ছিল ধান।

www.pathagar.com

ত্রয়োদশ শতাব্দীর কোনো এক কবির কবিতায় কৃষিসমৃদ্ধ গ্রাম বাঙলার মনোরম চিত্রটি চমৎকারভাবে ফুটে উঠেছে। তিনি বলেছেন ঃ

...চাষীর ঘরে নতুন কাটা শালী ধানের কি বাহার! গাঁয়ের শেষে ক্ষেত জুড়ে প্রচুর যব, নীল পদ্মের মত স্নিগ্ধ-সবুজ তাদের শীষগুলো ঘরে ফিরে নতুন খড় পেয়ে গরু, বলদ, ছাগলের আনন্দ ধরে না। আখ-মাড়াই কলের ঘণ্টার শব্দে গ্রামগুলো দিনভর মুখর ; গুড়ের গন্ধ সারা গাঁয়ে ভুরভুর করছে।...

ধানের মতো আখের চাষও বাঙলাদেশে অতি প্রাচীন। গ্রীক ইতিহাসবেত্তারা আখের খবর জানতেন। তাঁদের মাঝে যাঁরা ভারতবর্ষ সম্পর্কে লিখেছেন তাঁরা বাঙলাদেশের সেই অদ্ভুত সরু সরু কোমল নল যা থেকে এক ধরনের মধু পাওয়া যায় তার কথা উল্লেখ করেছেন বার বার। শুশ্রুত পৌণ্ড্রক নামক একজাতীয় আখের কথা উল্লেখ করেছেন। পুণ্ড্র দেশে এই আখের জন্ম বলে এর নাম পৌণ্ড্রক। পুণ্ড্র স্থান-নামটি কৌম-নাম থেকে উদ্ভূত। পুণ্ড্র নামে কৌম এই অঞ্চলে বসবাস করতো বলেই এই এলাকার নামও পুণ্ড্র। তারাই আখের চাষ করতো। সে জন্য আখেরও একই নাম। আজও পৌণ্ডিয়া পৌণ্ডা, পুণ্ডি নামীয় আখের চাষ হয় গোটা উপমহাদেশ জুড়ে।

সপ্তম শতকে জয়গানের লিপিতে কর্ণসুবর্ণের ঔদস্বরিক বিষয়ে সর্ষপ. যানকে (অর্থাৎ সর্ষে ক্ষেতের পাশ দিয়ে রাস্তার) কথাটির উল্লেখ থেকে বোঝা যায় যে, ঐ অঞ্চলে সর্ষের চাষ ব্যাপকভাবে প্রচলিত ছিল সে সময়।

অষ্টম শতক থেকে ত্রয়োদশ শতকের মাঝে যে সব লিপি পাওয়া গেছে তাতে ধান, আখ প্রভৃতি ছাড়াও আরও নানা ধরনের ফল-মূলের উল্লেখ দেখা যায়। সুপারী, নারকেল পাওয়া যেতো প্রায় সর্বত্র। বিশেষ করে পাওয়া যেত নিম্ন বঙ্গের জলাভূমি অঞ্চলে, বিক্রমপুর ভাগে, ঢাকায় পদ্মার তীরে তীরে। পান এবং কলা দুটোই বাঙালীর প্রিয় খাদ্য। দুটোরই প্রচলন সেই আদি অষ্ট্রেলীয় আমল থেকে। দুটোই বাঙলাদেশের প্রায় সর্বত্র পাওয়া যেত। সেন আমলে পান ছিল রাজস্বের একটি গুরুত্বপূর্ণ উৎস। কলাও প্রচুর পাওয়া যেত। পাহাড়পুরের পোড়া মাটির ফলকে, বিভিন্ন মূর্তির গায়ে উৎকীর্ণ কলা গাছের ছবি থেকে সে কথা বোঝা যায়। আম, ডালিম, খেজুর, বীজফল, পর্কটি প্রভৃতি

www.pathagar.com

ফলেরও উল্লেখ পাওয়া যায় বার বার। গোবিন্দপুর লিপিতে দেখা যায় হাওড়া জেলার ঐ অঞ্চলে ডালিমের ক্ষেত ছিল সে সময়। ধর্মপালদের লিপিতে বীজফল ও পর্কটির উল্লেখ দেখা যায়, ধর্মাদিত্যের কোটালিপাড়া লিপিতে পাওয়া যায় পর্কটির উল্লেখ।

বরেন্দ্রভূমির বিস্তীর্ণ অঞ্চলে এলাচের চাষ হতো সে সময়। এ ছাড়াও লবঙ্গ, তেজপাতাও পাওয়া যেত।

বাঙলাদেশ নদীবহুল। এই সব নদী-নালা-খাল-বিলে মাছ পাওয়া যায় প্রচুর। সে কালেও এর কোন ব্যতিক্রম দেখা যায়নি। তার উপরে ছিল বাঁশ, যা বেঁচে সে সময়ও দুটো পয়সা আসতো লোকের হাতে। আজকের মতোই ঘরও তৈরী হতো বাঁশের বেড়া দিয়ে।

ভাত-মাছ, তার উপর ঘি-দুধ। ভোজন-বিলাসী বাঙালীর আর কি চাই। বিদ্যাপতির মতে, বাঙলাদেশের সেরা জিনিস ছিল ঘি। প্রচুর ঘি পাওয়া যেত। বাঙালী ভোজন-বিলাসী বলে খ্যাত। নানারকম মশলা দিয়ে নানা জাতের খাদ্য তৈরী করার এ রকম ফলাও ব্যবস্থা উপমহাদেশের অন্য কোনও অঞ্চলে দেখা যায়নি। খাদ্যদ্রব্য মশলা প্রভৃতির প্রাচুর্যই বোধ হয় বাঙালীকে ভোজনবিলাসী করে তুলেছিল সেদিন। তার পরিচয় ছড়িয়ে আছে সে সময়কার বা আরো পরবর্তী সময়ের সাহিত্যের পাতায় পাতায়।

খনিজ

কৃষি-সমৃদ্ধির তুলনায় বাঙলাদেশ খনিজ-সম্পদে তেমন সমৃদ্ধ ছিল না। তবু ভাবলে অবাক হতে হয় যে, আজকের উত্তর বাঙলায় এককালে হীরা পাওয়া যেত। হীরার খনি ছিল। তার সাথে কয়লার খনি ছিল কি-না জানা যায় না। তবে উত্তর বাঙলায় হীরার খনির কথাটা পাওয়া যায় কৌটিল্যের অর্থ শাস্ত্রে। কৌটিল্য ত্রিপুরে অর্থাৎ ত্রিপুরায়ও হীরার খনির কথা উল্লেখ করেছেন। আইন-ই-আকবরীতে গড়মান্দারনে হীরার খনির কথা উল্লিখিত হয়েছে। কৌটিল্য বাঙলাদেশে আরও খনিজ-দ্রব্যের কথা উল্লেখ করেছেন। তাঁর কথা থেকেই জানা যায়, গৌড়ে রূপা পাওয়া যেত। রূপার খনি ছিল সেখানে। সে সময় বাঙলাদেশে কিছু সোনাও

www.pathagar.com

পাওয়া যেত। সেই সোনা না কি নদী বেয়ে বাঙলাদেশে আসত। সোনারং, সোনার গাঁ, সুবর্ণ বীথি, সোনাপুর নামগুলো বোধ হয় নদীবাহিত এই সোনার স্মৃতিই বহন করছে। বর্তমান পশ্চিম বাঙলার সুবর্ণরেখা নদীটির নামের পেছনেও বোধ হয় লুকিয়ে আছে একই ইতিহাস।

শিল্প

অপেক্ষাকৃত প্রাচীনকালে ঢাকাই মসলিনের খ্যাতি সর্বজনবিদিত। বাঙলার বস্ত্রশিল্পের খ্যাতি কিন্তু আরও প্রাচীন। কৌটিল্যের অর্থশাস্ত্রের রচনাকালে বস্ত্রশিল্পে বাঙলার প্রসিদ্ধি সুপ্রতিষ্ঠিত। একই গ্রন্থে বাঙলায় তৈরী চার রকমের কাপড়ের উল্লেখ আছে—ক্ষৌম, দুকুল, পত্রোর্ণ (আধুনিক কালের মুগা ও এণ্ডি জাতীয়) ও কার্পাসিক। ক্ষৌম ছিল মোটা জাতের কাপড়। তৈরী হত প্রধানতঃ পুণ্ড্রবর্দ্ধনে। নরোম, মিহি কাপড় ছিল দুকূল। বঙ্গের দুকূল ছিল যেমন নরোম তেমনি সাদা পুণ্ড্রের দুকূল কালো, দেখতে মণির মত পেলব। কামরূপের সুবর্ণকুড়িয়াতে যে দুকূল তৈরী হত তা ছিল প্রভাত সূর্যের মত উজ্জ্বল। পত্রোর্ণ জাতীয় কাপড় তৈরী হত মগধ, পুণ্ড্র ও সুবর্ণকুড়িয়াতে। এই অঞ্চলগুলি আজকালও মুগা ও এণ্ডির জন্য বিখ্যাত। কার্পাসিক বা কার্পাস তুলোর কাপড়ও তৈরী হত প্রচুর পরিমাণে। কৌটিল্য বঙ্গ ও আরও দু'জায়গার কার্পাস বস্ত্রের শ্রেষ্ঠত্বের কথা বলে গেছেন। পঞ্চদশ শতকে চীনা পরিব্রাজক মাহুয়ান পাঁচ-ছ রকমের কার্পাস বস্ত্রের কথা উল্লেখ করেছেন। কার্পাস তুলোর তৈরী কাপড়ের ব্যবহার ছিল সবচেয়ে বেশী। সাধারণ মানুষের কাছেও তা ছিল আদরের। বোধ হয় সে জন্যই চর্যাগীতিতেও কার্পাস গাছের কথা পাওয়া যায়। আরও পাওয়া যায় তুলো ধুনবার একটি চিত্র।

বস্ত্রশিল্পে বাঙলাদেশের সমৃদ্ধির কথা সে কালেই দেশ-বিদেশে ছড়িয়ে পড়েছিল।

পরবর্তী কালে একেবারে একটানা ঊনবিংশ শতাব্দীর গোড়ার দিক পর্যন্ত বাঙলার বস্ত্রশিল্পের এই সুনাম অব্যাহত ছিল। খ্রীস্টীয় প্রথম শতাব্দীতে লেখা পেরিপ্লাস গ্রন্থে বলা হয়েছে, সর্বোৎকৃষ্ট মসলিন রপ্তানি হতো বাঙলাদেশ থেকে। গ্রীক ঐতিহাসিকেরাও বার বার বাঙলার এই সম্পদ

www.pathagar.com

সম্পর্কে উল্লেখ করেছেন। এ সম্পর্কে বলতে গিয়ে পঞ্চম শতাব্দীতে আরব বণিক সোলায়মান বলেছেন, "এ দেশে তৈরী এই জিনিস আর কোথাও পাওয়া যায় না। এত মিহি ছিল এই কাপড় যে তৈরী একটি পোশাক একটি আংটির ভিতর দিয়ে গলে যেত।" সোলায়মান আরো বলেছেন—অন্য কিছু নয়, এই কাপড় ছিল তুলোর তৈরী। ত্রয়োদশ শতাব্দীতে মার্কোপোলো যখন এদিকে আসেন তখনো বাঙলাদেশ থেকে প্রচুর বস্ত্র রপ্তানি হতো।

এ যুগে বাঙলার আর একটি প্রসিদ্ধ শিল্প হল চিনি। পৌণ্ড্রক আখ থেকে প্রচুর পরিমাণে চিনি তৈরী হতো—এ কথা সুশ্রুত বলে গেছেন বহু আগে। ত্রয়োদশ শতকেও অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ রপ্তানিদ্রব্য হিসেবে চিনির উল্লেখ করেছেন মার্কোপোলো। ষোড়শ শতকে পর্তুগীজ পর্যটক বারাবোসা যখন আসেন তখনো দক্ষিণ ভারতের সঙ্গে সমানে পাল্লা দিচ্ছে বাঙলার চিনি। ভারতের বিভিন্ন অংশে, আরব-পারস্য-সিংহলে চিনি রপ্তানি হতো সে সময়।

লোনা পানি থেকে লবণ তৈরী ছিল আর একটি গুরুত্বপূর্ণ শিল্প। একটা সময়ে দেখা যায় রাজারা ভূমি দান করতে গিয়ে লবণ তৈরীর অধিকার-সহ দানপত্র সম্পাদন করেছেন। একাদশ শতকে মহারাজ শ্রীচন্দ্রের রামপাল তাম্রশাসনে, দ্বাদশ শতকের মহারাজ ভোজ বর্মনের বেলাব শাসনের দান-পত্রের শর্তাবলীতে এই জাতীয় অধিকার প্রদানের উল্লেখ দেখা যায়। সমুদ্রের তীরে বা যে জায়গায় জোয়ারের জলের সাথে লোনা পানি ভেসে আসত, বোধ হয় সে সব জায়গায় গর্ত করে পানি ধরে রেখে পরে রোদ্দুরের তাপে বা জ্বাল দিয়ে লবণ তৈরী করা হতো।

মৃৎশিল্পেরও যথেষ্ট প্রসার ঘটেছিল সে সময়। পাহাড়পুরের ধ্বংস-স্তূপ থেকে বিহারের অধিবাসীরা দৈনন্দিন প্রয়োজনে সে কালে যে সব জিনিস ব্যবহার করতো (যথা কারুকাজ করা লোটা, দোয়াত, রান্নার বাসন-পত্র, পিরিচ, ইত্যাদি) তার বহু নিদর্শন আবিষ্কৃত হয়েছে। বগুড়ার মহাস্থান, ঢাকার সাভার, পাহাড়পুর ও অন্যান্য জায়গা থেকে পাওয়া গেছে নানা ধরনের কারুকাজ করা মৃৎফলক। এ থেকে সে কালে মৃৎশিল্পের প্রসার ও উৎকর্ষের কথা বুঝা যায়। এই শিল্পের কেন্দ্র ছিল গ্রাম। সে সময়কার গ্রাম সম্পর্কে বিভিন্ন উল্লেখ থেকে এটা জানা যায়।

www.pathagar.com

লৌহ ও অন্যান্য ধাতব শিল্পেরও প্রসার ঘটেছিল সে কালে। কৃষি-প্রধান অর্থনীতিতে কৃষি কর্মে পদে পদে লোহার দরকার হতো। লাঙলের ফলা, দা, কাস্তে, কুড়াল ইত্যাদি তৈরী হতো। তা ছাড়া তৈরী হতো লোহার জলপাত্র, তীর, বর্শাফলক, তরোয়াল। বঙ্গে তৈরী ধারালো তরোয়ালের সুনাম ছিল সে কালে। বার বার আঘাতেও ক্ষতি হতো না বলে ছিল সবার কাছে আদৃত। পাহাড়পুরের ধ্বংসস্তূপ থেকে লোহার তৈরী তীর ও বর্শাফলক পাওয়া গেছে। অন্যান্য ধাতব শিল্পের মাঝে ছিল সোনা-রূপা-মণি-মুক্তার কাজ। বিত্তবানেরা নানা ধরনের গয়না-গাটি ব্যবহার করতো। সন্ধ্যাকর নন্দীর রামচরিত কাব্যে মণিময় ঘুঙুর, হীরা-মুক্তা-চুনী-পান্না বসানো বিচিত্রবর্ণ অলঙ্কার মুক্তাখচিত কণ্ঠহার প্রভৃতির বর্ণনা আছে। এ ছাড়া সমাজে ধনীরা সোনা-রূপার থালা-বাসন ব্যবহার করতো। এ ছাড়া ছিল কাঁসার কাজ। গুপ্ত আমলে বা তার পরে তৈরী ব্রোঞ্জ বা অষ্টধাতুর গড়া অনেকগুলি মূর্তি বাঙলার বিভিন্ন অঞ্চলে আবিষ্কৃত হয়েছে। এ থেকে ধাতব শিল্পের এ সব শাখারও উন্নতি ও প্রসারের কথা বোঝা যায়।

স্থাপত্য শিল্প, তক্ষণ শিল্পেরও উৎকর্ষ ও প্রসার ঘটেছিল উল্লেখ-যোগ্যভাবে। পাথরের তৈরী যে সব মূর্তি প্রভৃতি আবিষ্কৃত হয়েছে তার অনুপম সৌন্দর্য বাঙলার ভাস্করদের উৎকর্ষের সাক্ষ্য। কালো পাথরের তৈরী মূর্তিগুলি আজও বিস্ময় উদ্রেক করে। এই পাথর আনা হতো রাজমহল পাহাড় থেকে। নদী পথে তা দেশের বিভিন্ন জায়গায় চালান দেওয়া হতো। পাথর কুঁদে মূর্তি প্রভৃতি তৈরী করার মতোই উন্নতি লাভ করেছিল তক্ষণ শিল্প। এ যুগের তক্ষণ শিল্পের নিদর্শন আজ খুব বেশী একটা টিকে নেই। তবে যে কটি টিকে আছে সে কটি থেকেই এই শিল্পের উৎকর্ষ অনুমান করা চলে। এ সব ছাড়া কাঠের আরও নানা ধরনের জিনিস তৈরী হতো সে সময়। ঘর-গৃহস্থালীর জিনিসপত্র নৌকা, সমুদ্রগামী জাহাজ, চাকায় টানা গাড়ী ইত্যাদি সমস্তই তৈরী হতো কাঠ দিয়ে। বাঙলাদেশের জাহাজ তো রীতিমতো প্রসিদ্ধ ছিল।

হাতীর দাঁত দিয়েও নানা ধরনের জিনিস তৈরী হতো। গোবিন্দ কেশবের ভাটরা গ্রামের তাম্রশাসনে এক দন্তকারের (যে হাতীর দাঁতের জিনিস তৈরী করে) উল্লেখ থেকে এই শিল্পের আভাস পাওয়া যায়।

www.pathagar.com

কেশব সেনের ইদিলপুর শাসনে হাতীর দাঁতে তৈরী ডাঁটওয়ালা পাল্কীর উল্লেখ আছে। এগুলি ছাড়াও শাঁখারী, রাজমিস্ত্রী, শুঁড়ি প্রভৃতি বিভিন্ন বৃত্তিতে নিযুক্ত লোকের উল্লেখ থেকে তেমন গুরুত্বপূর্ণ না হলেও শিল্পের আরও বিভিন্ন শাখার অস্তিত্বের প্রমাণ পাওয়া যায়।

বিভিন্ন শিল্পে নিয়োজিত এই শিল্পীদের সংগঠন ঠিক কি ধরনের ছিল তা আজও স্পষ্টভাবে জানা যায়নি। তবে বিভিন্ন লিপিতে দু'একটি টুকরো-টাকরা উক্তি থেকে মনে হয় বিভিন্ন শিল্পে নিযুক্ত শিল্পীদের আলাদা সংগঠন ছিল। ঠিক আজকের যুগের ট্রেড ইউনিয়ন নয়। কারণ এক দল উৎপাদনের যন্ত্রপাতির মালিক, অন্য দল শুধু শ্রমশক্তি বিক্রেতা—এ ভাবে সমাজ তখনো ভাগ হয়ে যায়নি। পঞ্চম, ষষ্ঠ শতকের লিপিসমূহে বিভিন্ন শিল্প ব্যবসার বিভিন্ন শাখার সংস্থাসমূহের উল্লেখ দেখা যায়। এই জাতীয় সংস্থাসমূহের প্রধানরা সে সময় রীতিমতো সম্মানিত ব্যক্তি ছিলেন। তাঁরা স্থানীয় রাজপুরুষদের সাথে শাসনকার্যে অংশ গ্রহণ করতেন। কারু-শিল্পীদের প্রধানকে বলা হতো প্রথম কুলিক। তিনি ছিলেন নগর শ্রেষ্ঠী, প্রথম সার্থবাহের মতোই সম্মানিত। পরবর্তীকালে বাঙালীর সমাজ যখন জমির বাঁধনে পুরোপুরি বাঁধা পড়লো তখন সমাজে কারুশিল্পীদের স্থান নীচে নেমে গেছে অনেক। তার আগে অর্থাৎ অষ্টম শতক পর্যন্ত এঁরা ছিলেন সমাজের গণ্যমান্যদের অন্যতম। গোটা অর্থনীতিতে এঁদের আপেক্ষিক গুরুত্বই সমাজে সেদিন এঁদের জন্যে সম্মানের আসন নির্দিষ্ট করেছিল। দেওপাড়ায় বিজয় সেনের যে শিলা-লিপি পাওয়া গেছে তাতে এই লিপির খোদাইকার হিসেবে রণক শূলপানির নাম উল্লিখিত হয়েছে। এই রণক শূলপানি যে সে লোক ছিলেন না—তিনি ছিলেন বরেন্দ্র শিল্পী গোষ্ঠী চূড়ামণি। বিশ্লেষণের বাহার ও উপাধি থেকে সমাজে কারুশিল্পীদের গুরুত্ব আঁচ করা চলে।

ব্যবসা-বাণিজ্য

অর্থশাস্ত্রে ব্যবসায়ীদের কাছে থেকে যে সব কর আদায়ের বিধান দেওয়া হয়েছে তা থেকে বোঝা যায় যে, সে কালে দেশের মধ্যে ব্যবসার প্রসার ঘটেছিল যথেষ্ট। বাঙলাদেশে এ সম্পর্কে খুব সুনির্দিষ্ট প্রমাণ না পাওয়া গেলেও সমৃদ্ধ বহির্বাণিজ্যই দেশের ভেতরে সমৃদ্ধ ব্যবসার অস্তি-

www.pathagar.com

ত্বের প্রমাণ। রাজস্ব সংগ্রাহকদের ভেতরে হট্টপতি, শৌল্কিক প্রভৃতি কর্মচারীদের উল্লেখও এ কথা প্রমাণ করে। কোটালিপাড়ায় প্রাপ্ত শাসন-সমূহ থেকে জানা যায় সেকালে নব্যাবকাশিকা ছিল ব্যবসায়ীদের একটি গুরুত্বপূর্ণ ঘাঁটি। দামোদরপুর শাসনসমূহও উত্তর বাঙলার কোটিবর্ষ সম্পর্কে একই সাক্ষ্য দেয়। পুণ্ড্রবর্দ্ধন শহরের বাজার ছিল বিখ্যাত। রাস্তার দু পাশে সারি সারি দোকানে কেনা-বেচা চলতো।

নদীবহুল বাঙলাদেশে নদী পথেই বেশীর ভাগ মাল যাতায়াত করতো। তা ছাড়াও ছিল বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ রাজপথ। ফা-ইয়েন ও হিউ এন-থ্-সাঙ-এর ভ্রমণ বৃত্তান্ত থেকে বিভিন্ন রাজপথের বিবরণ পাওয়া যায়। দেশের বড় বড় শহরগুলি ছিল পরস্পরের সাথে যুক্ত। স্থলপথে এক শহর থেকে অন্য শহরে যাতায়াত হতো। এই পথ বেয়ে যাতায়াত করতো বণিকেরা। বাণিজ্যের পসরা বহন করে নিয়ে যেতো এক শহর থেকে আর এক শহরে।

অতি প্রাচীন কালের কিংবদন্তীর কথা বাদ দিলেও বাঙলাদেশের সমৃদ্ধ বহির্বাণিজ্যের প্রমাণ পাওয়া যায় খ্রীস্ট-পূর্ব পঞ্চম-চতুর্থ শতক থেকে। গ্রীক ঐতিহাসিকেরা এ সম্পর্কে বিভিন্ন বিবরণ লিপিবদ্ধ করে গেছেন। তাঁদেরই অন্যতম ষ্ট্র্যাবোর লেখা থেকে জানা যায়, গঙ্গা বেয়ে সমুদ্রগামী জাহাজ এসে নোঙর করতো পাটলিপুত্রে। জাতকের গল্পসমূহ থেকে জানা যায় সুদূর সিংহল বা সুবর্ণভূমির উদ্দেশ্যে পাড়ি জমাবার জন্য বণিকরা জাহাজে চড়তো কাশী বা চম্পা (বর্তমান ভাগলপুর) নগরে। পেরিপ্লাস গ্রন্থ থেকে জানা যায়, খ্রীস্টীয় প্রথম শতকে বাঙলার সাথে দক্ষিণ ভারত ও সিংহলের বাণিজ্য সম্পর্ক ছিল গভীর। গঙ্গানগর (খুব সম্ভবতঃ গ্রীক ঐতিহাসিকেরা গঙ্গানগর বলতে তাম্র লিপ্তিকেই বোঝাতেন) থেকে জাহাজ ভরতি পসরা নিয়ে বণিকরা পাড়ি জমাতেন। খ্রীস্টীয় প্রথম শতাব্দীতে লেখা মিলিন্দ পঞ্হ গ্রন্থ থেকেও বিশ্বের বিভিন্ন অংশের সাথে বঙ্গের সমৃদ্ধ বাণিজ্যের উল্লেখ পাওয়া যায়।

খ্রীস্টীয় প্রথম শতাব্দীতে উল্লিখিত গঙ্গানগরই ইতিহাসখ্যাত তাম্র-লিপ্তি বন্দর কিনা এ সম্পর্কে সুনির্দিষ্টভাবে কিছু বলা না গেলেও তাম্র-লিপ্তি বন্দরের পরবর্তী ইতিহাস সুপরিজ্ঞাত। তাম্রলিপ্তি বন্দর ছিল বাঙলার বহির্বাণিজ্যের কেন্দ্রস্থল। রপ্তানি দ্রব্য বোঝাই করে এখান থেকেই জাহাজ পাড়ি দিত দূরদূরান্তরে। আরাকান উপকূল ঘেঁষে ব্রহ্মদেশ ও আরও

www.pathagar.com

দূরে পাড়ি জমাত। তাম্রলিপ্তি থেকে সুবর্ণ ভূমির সাথে যোগাযোগ এই পথে রক্ষিত হত। দূর প্রাচ্যের সাথে যোগাযোগ রক্ষার পথ ছিল। ভিন্ন। সোজা বঙ্গোপসাগর পাড়ি দিয়ে মালয় উপদ্বীপ ঘুরে এই যোগাযোগ রক্ষিত হত। খ্রীস্টীয় দ্বিতীয় শতকে টলেমি এই পথের সাথে পরিচিত ছিলেন। চীনা পরিব্রাজক ইৎ-নিঙও এই পথ ধরে এখানে এসেছিলেন। আরও একটি দিকে বাঙালী বণিকরা যাতায়াত করতেন। কলিঙ্গ দক্ষিণ ভারতের উপকূল বেয়ে তারা পাড়ি দিতেন সিংহলে, পশ্চিম ভারতীয় উপকূলে। দেশে ফেরার পথে সিংহলে যাবার জন্যে ফা-ইয়েনও তাম্রলিপ্তি থেকেই জাহাজে চেপেছিলেন।

সমুদ্র পথ ছাড়াও ছিল স্থলপথ। পুণ্ড্রবর্দ্ধনের সাথে যোগাযোগ ছিল কামরূপের। কামরূপের মিহি কাপড়, চন্দন ও অগুরু এই পথ বেয়ে উত্তর ভারতের বাণিজ্য কেন্দ্রগুলিতে ছড়িয়ে পড়তো। এই পথ বেয়েই পরিব্রাজক হিউএন-থ্সাঙ গিয়েছিলেন কামরূপ পরিক্রমায়। এই রাজপথ করতোয়া পার হয়ে পুণ্ড্রবর্দ্ধনের উপর দিয়ে কামরূপ অতিক্রম করে দুর্গম পার্বত্য প্রদেশ ভেদ করে দক্ষিণ চীন পর্যন্ত বিস্তৃত ছিল। চীনের পণ্যসম্ভার এই পথ দিয়ে নেমে আসতো উপমহাদেশের বুকে। কামরূপ, পুণ্ড্রবর্দ্ধন, মগধ—গোটা উত্তর ভারত অতিক্রম করে ছড়িয়ে পড়তো সুদূর আফগানিস্তানে। খ্রীস্ট-পূর্ব দ্বিতীয় শতক থেকে খ্রীস্টীয় নবম শতক পর্যন্ত এই পথে বাণিজ্য সম্ভার যে চলাচল করতো তার প্রমাণ আছে। কামরূপে প্রবেশের আগে এই পথের সাথেই যুক্ত হয়েছিল আর একটি দীর্ঘ রাজপথ, যে পথে পাড়ি জমানো যেত সেই সুদূর টঙকিং প্রদেশে।

বাঙলাদেশের বিভিন্ন অঞ্চল থেকে পশ্চিমে অর্থাৎ উত্তরা পথের দিকে যাতায়াতের জন্য ছিল অনেকগুলি রাজপথ। ৬৭৩ খ্রস্টাব্দে তাম্রলিপ্তি বন্দরে অবতরণের পর ইৎ-সিঙ যখন সেখান থেকে বুদ্ধগয়ার দিকে যাত্রা করেন, তখন একই পথে বেশ কয়েকশো' বণিককে তাম্রলিপ্তি থেকে বুদ্ধগয়ার দিকে যেতে দেখেছিলেন তিনি। এ থেকে এই রাস্তাগুলির বাণিজ্যিক গুরুত্ব সম্পর্কে আঁচ করা যায়। উত্তরাপথের সাথে যোগাযোগের এই রাস্তাগুলি যেমন ছিল পণ্যসম্ভার ও বণিকদের যাতায়াতের পথ, তেমনি এই রাস্তা বেয়েই সৈন্যদলও যাতায়াত করতো। বিদেশ থেকে

www.pathagar.com

সৈন্যরা এসে ঝাঁপিয়ে পড়তো বাঙলার উপর, বাঙলা থেকেও সৈন্যরা পররাজ্য আক্রমণ করতে যেত।

সিকিম ও চুম্বী উপতক্যা বেয়ে হিমালয়ের বিভিন্ন গিরিপথ অতিক্রম করে তিব্বতের সাথে যে পথে যোগাযোগ রাখা হত বাণিজ্যিক গুরুত্বের বিচারে সেগুলিও ছিল গুরুত্বপূর্ণ। এই পথ বেয়ে চীন থেকে আসতো চীনাংশুক। বাঙলাদেশ থেকে আবার অন্যান্য জায়গায় রপ্তানি হতো। খ্রীস্টীয় প্রথম শতকে 'পেরিপ্লাস' গ্রন্থে এ বিষয়টি উল্লিখিত হয়েছে। পরবর্তীকালে বৌদ্ধ ধর্মযাজক প্রচারকদের যাতায়াতের পথ হিসাবেও এই পথ গুরুত্ব ও প্রসিদ্ধিলাভ করেছিল।

কলিঙ্গ উপকূল বেয়ে ছিল দক্ষিণাপথের সাথে যোগাযোগের রাস্তা। জলপথ ও স্থলপথে একটা সময়ে বাঙালী বণিকরা পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে বাণিজ্য করতে যেতেন। ঘরকুণো বলে যাদের সম্পর্কে এত বদনাম তাঁরাই উত্তাল সমুদ্র পাড়ি দিতেন, বসতি স্থাপন করতেন দূর-দূরান্তরে। বস্তুতপক্ষে এককালে নৌ-সাধনোদ্যত বাঙালী বলে যাদের খ্যাতি ছিল তারাই কালে মাটির টানে কঠিনভাবে বাঁধা পড়ে গেলেও আজও যে চট্টগ্রাম, শ্রীহট্ট, নোয়াখালী অঞ্চলের বাসিন্দারা জাহাজী হয়ে সুদূরের পথে পাড়ি জমায় তার পিছনে বাঙালী জীবনের একটি সুপ্রাচীন অভ্যাস (অষ্ট্রিক নরগোষ্ঠীর অবদান) সক্রিয় কিনা তা ভেবে দেখার মতো। মধ্যযুগের বাঙলা কাব্যে বাঙালী বণিকদের বিপদসঙ্কুল অভিযাত্রার কাহিনীতে এই স্মৃতিটি রক্ষিত হয়েছে।

বাঙালী বণিকরা জাহাজ বোঝাই করে নিয়ে যেত বস্ত্র, পিপুল, তেজ-পাতা, পান, সুপারি, নারিকেল, লবণ জাতীয় পণ্য। বিনিময়ে আনত মণি-মাণিক্য-শঙ্খ। মোটা লাভ ছিল এই ব্যবসায়। খ্রীস্টীয় প্রথম শতকে রোমে আধসের পিপুলের দাম ছিল পনেরোটি স্বর্ণমুদ্রা। লাভজনক ব্যবসা থেকে সে যুগে বাঙালী বণিকদের হাতে প্রচুর বৈদেশিক মুদ্রা জমা হয়েছিল। রোমক স্বর্ণমুদ্রা দিনার ও রৌপ্য মুদ্রা দ্রক্ম বাঙলাদেশে প্রচলিতও হয়েছিল এ ভাবে। বস্তুতঃপক্ষে দাম কথাটাও এসেছে দ্রক্ম থেকে।

মালয়ের একটি প্রাচীন বৌদ্ধ মন্দিরের ধ্বংসস্তূপ থেকে পঞ্চম শতকের একটি লিপিতে রক্তমৃত্তিকাবাসী মহানাবিক বুদ্ধগুপ্তের নাম পাওয়া

www.pathagar.com

যায়। রক্তমৃত্তিকা হয় কর্ণসুবর্ণে না হয় চট্টগ্রামে। এ থেকে অন্ততঃ মালয়ের সাথে যে বাঙলার বাণিজ্যিক যোগাযোগ ছিল এ কথাটা বোঝা যায়। চম্পা প্রভৃতি রাজ্যে বাঙালীর বসতি স্থাপন, এমনকি রাজবংশ প্রতিষ্ঠা সম্পর্কে তো বহু কিংবদন্তি প্রচলিত। সবটা না হলেও এর কিছুটা যে সত্য ছিল তা তো ইতিহাসের প্রমাণ থেকেই জানা যায়।

মুদ্রা

বাণিজ্যের সাথে মুদ্রার সম্পর্ক। একেবারে গোড়ায় জিনিসের সাথে জিনিসের বিনিময় হতো। লেন-দেনের মাধ্যমরূপে ক্রমে মুদ্রার উদ্ভব হলো। বাঙলাদেশে ধাতব মুদ্রা কবে প্রচলিত হয় তা আজও অজ্ঞাত। তবে খৃস্ট জন্মের বেশ কয়েকশ' বছর আগে তা যে বাঙলাদেশে প্রচলিত ছিল এ বিষয়ে সন্দেহ নেই। মহাস্থানে প্রাপ্ত লিপিতে গণ্ডক এবং খুব সম্ভবতঃ কার্কনিক নামের মুদ্রার উল্লেখ আছে। গণ্ডক ছিল নিম্নমানের মুদ্রা—চার কড়ির সমান। 'পেরিপ্লাস' গ্রন্থ থেকে জানা যায় যে, খৃস্টীয় প্রথম শতকে গঙ্গা-বন্দরে ক্যালতিস নামের একজাতীয় স্বর্ণমুদ্রা প্রচলিত ছিল। তারও আগে, খৃস্ট-জন্মের পূর্বে নানা ধরনের চিহ্ন আঁকা এক জাতীয় তামা ও রূপার মুদ্রাব্যাপকভাবে প্রচলিত ছিল। ২৪ পরগণার বেড়াচাঁপা, রাজশাহীর মান্দা, তমলুক অঞ্চলের নদী সংলগ্ন উঁচু জায়গায়, ঢাকার উয়ারি, ময়মনসিংহের ভৈরববাজার প্রভৃতি জায়গায় এই জাতীয় মুদ্রার বহু নিদর্শন পাওয়া গেছে। ভারতবর্ষের অন্যান্য জায়গায়ও এই জাতীয় মুদ্রা আবিষ্কৃত হয়েছে। এ থেকে অনুমান করা চলে যে, উপমহাদেশের অন্যান্য অংশের সাথে তখনই বাঙলার বাণিজ্যিক যোগাযোগ ছিল। বাঙলাদেশেও এই জাতীয় মুদ্রা যে ব্যাপকভাবে প্রচলিত ছিল তা আবিষ্কার দেখেই বোঝা যায়।

বাঙলাদেশে কুষাণ বংশের অতি অল্প ক'টি স্বর্ণমুদ্রা পাওয়া গেছে। বাণিজ্যিক লেন-দেনের ফলে হয়তো চালু হয়েছিল এগুলো।

এ দেশে স্বর্ণমুদ্রার ব্যাপক প্রচলন হয় গুপ্ত আমলে। গুপ্ত সম্রাটরা সোনা-রূপো দুয়েরই প্রচলন করেছিলেন। এর সাথে তামার মুদ্রা, কড়ি দুই-ই প্রচলিত ছিল। এ সময় জমি কেনা-বেচায় সোনা বা রূপোর মুদ্রা,

www.pathagar.com

দিনার ও রূপক ব্যবহৃত হতো। লিপিসমূহ থেকে জানা যায় ৩ কুল্যবাপ জমির দাম ছিল ৬ দিনার, ২ দ্রোণবাপ ভূমির মূল্য ছিল ৮ রূপক।

গুপ্ত সাম্রাজ্যের শেষের দিকে মুদ্রার সোনা-রূপোয় ক্রমেই খাদ মেশানো হচ্ছিল। সাম্রাজ্যের আর্থিক সংকট বৃদ্ধির সাথে সাথে মুদ্রারও সংকট দেখা দিচ্ছিলো ধীরে ধীরে। একদিকে গুপ্ত সাম্রাজ্যের অবসান, অপর দিকে পাল সাম্রাজ্যের প্রতিষ্ঠা—দুয়ের মাঝে অন্তর্বর্তীকালীন সময়টুকু বাঙলার ইতিহাসে এক টালমাটাল যুগ। মাঝে শশাংক কিছুটা স্থায়িত্ব ফিরিয়ে আনতে চেষ্টা করেছিলেন—লাভ হয়নি।

এই টালমাটাল যুগ থেকেই বাঙলার ব্যবসা-বাণিজ্যেরও অবনতির সূত্রপাত। এই সময় শশাংক ও সমাচারদেবের লাঞ্ছনাঙ্কিত কয়েকটি স্বর্ণ-মুদ্রা পাওয়া গেছে, কিন্তু এই আমলের রূপোর কোন টাকা পাওয়া যায়নি।

কার্যতঃ সপ্তম শতকের পর থেকেই বাঙলাদেশ থেকেই স্বর্ণমুদ্রা উধাও হয়ে গেছে। তখন কড়ি লেন-দেনের একমাত্র নির্ভরযোগ্য মাধ্যম হয়ে দাঁড়িয়েছে। যেখানে স্বর্ণমুদ্রার ব্যাপক প্রচলন ছিল সেখানে মুদ্রার এই অবস্থা সত্যিই বিস্ময়কর।

পাল সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠার পর রূপোর টাকা নতুন করে চালু করা হয়। পাহাড়পুরের ধ্বংসস্তূপে এই সময়কার কিছু মুদ্রা আবিষ্কৃত হয়েছে। তার এক দিকে একটি ষাঁড়, অপর দিকে একটি মাছ। তাম্র মুদ্রাও এ সময় প্রচলিত হয়েছিল। তারও কিছু কিছু নিদর্শন পাওয়া গেছে। তবে রূপা বা তামা যাই হোক না কেন আগের তুলনায় এই মুদ্রা ছিল নিকৃষ্টতর। দীর্ঘকালস্থায়ী পাল সাম্রাজ্যের আমলে বাঙলাদেশ মুদ্রার এই পরিণতি ইতিহাসের একটি উল্লেখযোগ্য ঘটনা।

সেন আমলে অবস্থার আরও অবনতি হয়। এমন কি রূপা-তামার মুদ্রাও উধাও হয়ে গেছে এ সময়; কড়িই বিনিময়ের একমাত্র মাধ্যম হয়ে দাঁড়ায়।

গুপ্ত আমল থেকে সেন আমল—এই কয়েকশো বছরের মাঝে মুদ্রার এই পরিণতি কেন ঘটলো তার পুরোপুরি কারণ আজও অজ্ঞাত। যেটুকু সাধারণতঃ উল্লিখিত হয় তার প্রায় সবটুকু অনুমান।

শশাঙ্কের পর পুরো একশো বছর বাঙলার ইতিহাসে এক অরাজক যুগ। পাল-সাম্রাজ্যের প্রতিষ্ঠা তার পর। এ সময় আগের তুলনায় দেশের

www.pathagar.com

অর্থনীতিতে পরিবর্তন দেখা দিয়েছে। অষ্টম শতকের গোড়া থেকেই এই অঞ্চলের বহির্বাণিজ্য বাঙালী বণিকদের হস্তচ্যুত হয়েছে। পূর্ব ভূমধ্যসাগর থেকে শুরু করে চীন পর্যন্ত সর্বত্রই বাণিজ্য তখন আরব ও পারসিক বণিকদের হাতে। সমুদ্রে তাদেরই জয়জয়কার। অপরদিকে রোম সাম্রাজ্যের ধ্বংসের পরে এ দেশের সূক্ষ্ম শিল্পজাত পণ্যের চাহিদাও কমে গেছে। সব মিলিয়ে বাঙলার সমৃদ্ধি বহির্বাণিজ্যের তখন ত্রিশংকু অবস্থা। পাল আমলে স্থলপথে বাণিজ্য সম্প্রসারণের কিছু চেষ্টা হলো বটে, কিন্তু সে হলো প্রদীপ নেভার আগে জ্বলে ওঠার মতো।

আগে ব্যবসা-বাণিজ্য যখন সম্প্রসারিত হচ্ছিল তখন শুধু ব্যবসায়ীরাই নয়, যারা শিল্পজাত দ্রব্য তৈরী করতো, যারা সে জন্যে কাঁচামাল যোগাত তাদের হাতে অর্থাৎ শিল্পী ও কৃষকদের হাতেও দুটো পয়সা এসেছিল। সেজন্যে পঞ্চম ও ষষ্ঠ শতকে দেখা যায় গ্রামের সাধারণ গৃহস্থরাও স্বর্ণমুদ্রার বিনিময়ে জমি কেনা-বেচা করছে। ব্যবসা-বাণিজ্যে মন্দা দেখা দেওয়ায় তাদের হাতে অর্থাগমের এই পথ স্বাভাবিকভাবেই রুদ্ধ হয়ে যায়। ফলে শিল্পেরও অবনতি ঘটে। কৃষির উপর নির্ভরতা বৃদ্ধি পায়।

সামন্ত প্রভুরাও এ সময় শক্তি সঞ্চয় করে। আগের তুলনায় তাদের সংখ্যা বৃদ্ধি পায়। রাজকীয় দান-ধ্যানের বদৌলতে এ সময় আরও একদল ব্রাহ্মণ ভূস্বামী পোক্তভাবে আসন গেড়েছে। কার্যতঃ কৃষি তখন বাঙালীর একমাত্র উপজীব্য।

পাল আমলে নানা কারণেই প্রচলিত অর্থনীতির ভিত্ পর্যন্ত নড়ে উঠেছিল। পোক্তভাবে আসন গেড়েছিলো সামন্ত প্রভুরা। দৃঢ় হয়েছিল গ্রাম-বাঙলার অনড় গণ্ডীবদ্ধ জীবন। দৈনন্দিত জীবনের যা প্রয়োজন তা গ্রামেই পাওয়া যায়। বাইরে যাবার দরকার পড়ে না। সমাজ জীবনও আটকে থাকা সমাজের এই সংকীর্ণ ও গণ্ডীবদ্ধ জীবন-যাত্রার জের আজও আমরা বয়ে চলেছি। এই জীবনে কবে যে প্রাণপ্রবাহ সঞ্চারিত হবে, কে জানে।

www.pathagar.com

দশ

বর্ণভেদ

আর্য আগমনের পূর্বে বাঙলায় ছিল অষ্টিক ও দ্রাবিড় ভাষাভাষীদের বাস। এদের প্রতি আর্যদের ছিল প্রচণ্ড ঘৃণা। আরণ্যক গ্রন্থের 'বয়াংসি বঙ্গা বগধাশ্চের পাদা' এই পদে বংগ, মগধ, চের ও পাণ্ড্য কৌমের কথা উল্লেখ করে তাদের বয়াংসি বা পক্ষীসদৃশ বলে আখ্যায়িত করা হয়েছে। এই পদের এই পাঠ নিয়ে অবশ্য মতভেদের অবকাশ আছে। ঐতরেয় ব্রাহ্মণ গ্রন্থে পুণ্ড্র জনপদের লোকদের বলা হয়েছে দস্যু। এই ঐতরেয় ব্রাহ্মণেরই আরেকটি গল্প-বিশ্বামিত্র একসময় একজন পোষ্য-পুত্র গ্রহণ করেছিলেন। তাঁর এমনিতে ছিল পঞ্চাশ পুত্র। এঁরা স্বাভাবিকভাবেই আরেকজনের আগমন পছন্দ করতে পারলেন না। এতে বিশ্বামিত্র ক্রুদ্ধ হলেন ও অভিসম্পাত দিলেন তাঁর পঞ্চাশ পুত্রের সন্তানেরা আর্যাবর্তে থাকতে পারবে না। উত্তরাধিকার লাভ করবে পৃথিবীর প্রান্ততম সীমায়। আর তা না হলে তারা পাবে সর্বনিম্ন বর্ণ। বিশ্বামিত্রের এই অভিশপ্ত পৌত্রেরাই পুণ্ড্র, শবর, পুলিন্দ প্রভৃতি কোমের জন্মদাতা। বৌধায়নের ধর্মসূত্রে পুণ্ড্র, বংগ, কলিংগ প্রভৃতি কোমের অবস্থান নির্দেশ করা হয়েছে আর্যবহির্ভূত অঞ্চলের প্রত্যন্ত সীমায়। বলা হয়েছে এইসব অঞ্চলে অল্পদিনের জন্য প্রবাসে গেলেও ফিরে এসে তাকে প্রায়শ্চিত্ত করতে হতো। আর্যমঞ্জুশ্রীকল্প বৌদ্ধগ্রন্থ। এই গ্রন্থে গৌড়, পুণ্ড্র, সমতট, হরিকেলের ভাষাকে বলা হয়েছে অনূঢ় ভাষা। এই গ্রন্থ অনেক পরের রচনা। কিন্তু তৎসত্ত্বেও এই অঞ্চলের, লোকের প্রতি আর্যসংস্কৃতির ধারক-বাহকরা কিরূপ উন্নাসিক মনোভাব পোষণ করতেন তা এ থেকে জানা যায়।

কিন্তু বিজেতাসুলভ এই দর্পিত মানসিকতা বেশীদিন টিকতে পারেনি। অস্বীকার করা সম্ভব হয়নি এই 'ম্লেচ্ছ' 'অসুর' 'পক্ষীসদৃশ' লোকদের। নানা বিরোধ সংঘর্ষের ভিতর দিয়ে মেলামেশার প্রক্রিয়া চলছিল। মহাভারতে কৃষ্ণ, কর্ণ ও ভীমের দিগ্বিজয়ের কথা এ প্রসঙ্গে উল্লেখ করা যেতে পারে।

www.pathagar.com

এই প্রক্রিয়ার ভিতর দিয়ে এককালের এই দস্যু কোমগুলি একটু একটু করে স্থান করে নিচ্ছিলো আর্যসমাজের আড্ডার মধ্যে। অবশ্য এই স্বীকৃতি একদিনে হয়নি, এ কথা সহজেই বোঝা যায়। প্রথমে রাজনৈতিক পরাভব, পরে ক্রমে সামাজিক-সাংস্কৃতিক সংমিশ্রণ। মানব ধর্মশাস্ত্রে আর্য-বর্ণের সীমা নির্দেশ করা হয়েছে পশ্চিম-সমুদ্র থেকে পূর্ব-সমুদ্র তীর পর্যন্ত। অর্থাৎ বাঙলার কিয়দংশ হলেও আর্যবর্ণের অংশীভুক্ত এ কথা এখানে স্বীকার করে নেয়া হয়েছে। মহাভারতের সভাপর্বেই বঙ্গ ও পুণ্ড্রদের যথার্থ ক্ষত্রীয় বলে স্বীকৃতি দেয়া হয়েছে। মহাভারতে উত্তর বাঙলার করতোয়া তীর বা ভাগীরথীর সাগরসংগম তীর্থ হিসেবে স্বীকৃত। এ সব থেকে বাঙলা ও বাঙালীর আর্যকরণ যে ক্রমশঃ অগ্রসর হচ্ছে সে কথা বোঝা যায়। এ ব্যাপারে আরও তথ্য উল্লেখ করা যেতে পারে।

এভাবে কালক্রমে নিজেদের বৈশিষ্ট্যগুলি নিয়েই আর্যপূর্ব কৌম-গুলি ক্রমে আর্যভাষীদের সমাজে গৃহীত হলো। ফলে, একদিকে তারা যেমন আর্যভাষীদের সমাজ সংগঠন, ভাষা, ধর্ম প্রভৃতি দ্বারা প্রভাবিত হলো, তেমনি আর্যভাষীদের উপরেও ছাপ পড়লো তাদের। কৌম সমাজ যে নিঃশেষে আর্যসমাজের মধ্যে হারিয়ে গেল তা নয়। বিভিন্ন কৌম নিজেদের কিছু কিছু বিশেষত্ব নিয়েই টিকে রইলো।

বর্ণভেদ প্রথার কথা আমরা জানি। শাস্ত্রকারদের মতে বর্ণ চারটি—ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রীয়, বৈশ্য, শূদ্র। বাঙলায় আর্য বিশেষতঃ ব্রাহ্মণ্য প্রভাব অনেক কিছুর মতোই বর্ণভেদ প্রথাও বদলিয়ে দিলো এ দেশের বুকে। কথা যদি শুধু এটুকু হতো তাহলে খুব আলোচনার ব্যাপার ছিলো না। আর্যরা গোটা ভারতে প্রভাব বিস্তার করেছে, আর আর্যকৃত সমাজে স্বীকৃত হয়েছে বর্ণাশ্রমের আদর্শ। বাঙলার সমাজেও তাই হলো, কিন্তু বর্ণভেদ প্রথার নামে যে প্রথা বাঙলায় চালু হলো সেখানে শুধু চতুর্বর্ণ নয়, দেখা দিলো নানারকম জাত। কথায় বলে—বাঙালী-হিন্দুদের ছত্রিশ জাত। আর বর্ণভেদ প্রথার নামে এই বিচিত্র জাতভেদ বা বর্ণভেদ প্রথা এ দেশে বিকশিত হলো তা আজও প্রশ্নের উদ্রেক করে। এ প্রশ্নের চূড়ান্ত মীমাংসা আজ পর্যন্ত হয়নি।

আর্যপূর্ব বিভিন্ন কৌম নিজেদের বিভিন্ন বিশিষ্টতা নিয়েই ক্রমে যে আর্য সমাজের অঙ্গীভূত হচ্ছিলো সে কথা আগেই বলেছি। আর এই

www.pathagar.com

বিশিষ্টতার মাঝে একটি বৈশিষ্ট্য হলো বিভিন্ন কৌমের মাঝে আন্তবিবাহের প্রশ্নে নিষেধাজ্ঞা। হিন্দু সমাজের ছত্রিশ জাতের সাথে পারস্পরিক বিয়ের প্রশ্নে নিষেধাজ্ঞা এই প্রসঙ্গে স্মর্তব্য। এ ব্যাপারে কৌম সমাজের বৈশিষ্ট্য আর এ দেশে জাতিভেদ প্রথার এই বিশিষ্টতার সাদৃশ্য লক্ষণীয়। এ জাতীয় বিভিন্ন সাদৃশ্য বিচার করে অনুমান করা হয় উপমহাদেশের হিন্দু সমাজের মাঝে বিদ্যমান বর্ণভেদ প্রথার উৎস হলো প্রাচীন কৌম সমাজ। বাঙলায়ও বিচিত্র বর্ণভেদ প্রথার উৎস একই জায়গায়। বিভিন্ন আর্যপূর্ব কৌম যখন আর্যব্রাহ্মণ্য ধর্ম গ্রহণ করে তখন নিজেদের বৈশিষ্ট্য-গুলোকে বহুলপরিমাণে অক্ষুণ্ণ রেখেই তা করতে চেষ্টা করে। আর্য-ব্রাহ্মণ্য সমাজের কর্ণধারদের পক্ষেও তা পুরোপুরি অস্বীকার করা সম্ভব হয় না।

বাঙলায় প্রাপ্ত বিভিন্ন লিপি ও স্মৃতিগ্রন্থে আমরা কতকগুলি পার্বত্য বা ভিন্নদেশী কৌমের নামের তালিকা দেখতে পাই। যেমন ভিল্ল, মেদ, আভীর, কোল, পৌণ্ড্রক (বা পোদ) পুলিন্দ প্রভৃতি। ব্রহ্ম বৈষ্ট পুরাণের লক্ষ্য অনুসারে ভিল্লরা সৎশূদ্র। পৌণ্ড্রকরা পরিগণিত হতেন অসৎশূদ্র পর্যায়ে। আভীরদের নাম ভারত ইতিহাসে সুবিদিত। এই আভীররা বিদেশাগত কোম। বৃহদ্ধর্মপুরাণ অনুসারে এই কোম মধ্যমসংকর পর্যায়-ভুক্ত। এ জাতীয় দৃষ্টান্ত আরও উল্লেখ করা যেতে পারে। আর এ সব দৃষ্টান্ত থেকে এটা বুঝা যায় যে, বিভিন্ন কোমকে নিজের মাঝে স্থান দিয়ে হিন্দু বর্ণ সমাজ ক্রমে প্রসারলাভ করেছিল। আর এ থেকে অনুমান করা কঠিন নয় যে, ব্যর্থ হড্ডি (হাঁড়ি), ডোম, জোলা, বাগতীত (বাগদি), চণ্ডাল, মল্ল, ভোলাবাহী (দুলে), ট্রজীবী (পাটনী) প্রভৃতিরাও ছিল আদিবাসী কোম। ক্রমে হিন্দু ব্রাহ্মণ্য সমাজের অন্তর্ভুক্ত হয়ে এরা সমাজের নিম্নতম স্তরে স্থান করে নিচ্ছিল। বাঙলার হিন্দু সমাজের ছত্রিশ জাতের উৎস এখানেই।

মহাস্থান লিপি থেকে আমরা বুঝতে পারি মৌর্য আমলেই বাঙলায় আর্য প্রভাব ক্রমে বিস্তৃত হচ্ছিল। ব্যবসা-বাণিজ্য, রাষ্ট্রকর্ম প্রভৃতি উপলক্ষে উত্তর ভারত থেকে আর্যভাষীরা এ সময় বাঙলায় এসে বসবাস শুরু করেন। কিন্তু তা সত্ত্বেও গুপ্ত যুগের আগে আর্যপ্রভাব বাঙলায় দানা বেঁধে উঠেছিল বলে মনে হয় না।

www.pathagar.com

গুপ্তযুগে আর্য প্রভাবে যে সারা বাঙলায় ক্রমে ছড়িয়ে পড়েছে সে কথা আমরা জানতে পারি। বারকমণ্ডল অর্থাৎ ফরিদপুর জেলার প্রাপ্তলিপি থেকে জানা যায় সে অঞ্চলের শাসনকর্তা ছিলেন একজন ব্রাহ্মণ বৎসপাল স্বামী। দান গ্রহীতারও চন্দ্রস্বামী নামে আরেকজন ব্রাহ্মণ। ত্রিপুরার লোকনাথ লিপি থেকে জানতে পারি যে, জনৈক ব্রাহ্মণ মহাসামন্ত প্রদোষ-শর্মণ অনন্তনারায়ণ মন্দির প্রতিষ্ঠা এবং ২১১ জন চাতুর্বিদ্য ব্রাহ্মণের বসতি স্থাপন করার জন্য ভূমিদান করেছিলেন। এই পট্টলীতে শর্মা ও স্বামী পদবীযুক্ত অনেক গৃহস্থের নাম পাওয়া যায়। যথা অহিশর্মা, গুপ্তশর্মা, ব্রাহ্মস্বামী প্রভৃতি। এ থেকে বোঝা যায় ব্রাহ্মণরা গ্রামেও বসতি স্থাপন করছিলেন সে সময়। শুধু যে ব্রাহ্মণরাই এ সময় জমিলাভ করছেন তা নয়, জৈন্য ও বৌদ্ধ আচার্যও তাঁদের প্রতিষ্ঠানগুলোও এ সময় জমিলাভ করেছেন। এ সময়েই ব্রাহ্মণদের অন্যান্য পদবীরও সাক্ষাৎ পাই আমরা—যথা চট্ট, ভট্ট, বন্দ্য। এ ছাড়াও এ সময় যে সব তাম্রশাসন পাওয়া গেছে সে গুলির মধ্যে গ্রামবাসী, নগরবাসী শ্রেষ্ঠী, সার্থবাহ প্রভৃতি বিভিন্ন স্তরের লোকের নামের সাক্ষাৎ পাই আমরা। আর নামের তালিকা থেকে আমরা জানতে পারি যে গুপ্ত, নাগ, দাস, আদিত্য, নন্দী, মিত্র, শীল, ধর, কর, দত্ত, রক্ষিত, ভদ্রদেব প্রভৃতি পদবীর ব্যবহার এ সময় থেকেই শুরু হয়েছিল। দৃষ্টান্ত হিসাবে কিছু নাম উল্লেখ করা যেতে পারে। যথা—জয় নন্দী, দিবাকর নন্দী, রামদাস, হরিদাস, শশি নন্দী, শিব নন্দী, দুর্গা দত্ত, হিম দত্ত, স্থায়ন পাল, সত্যচন্দ্র, প্রভুচন্দ্র প্রভৃতি। উল্লিখিত ব্যক্তিরা ব্রাহ্মণ ছিলেন বলে মনে হয় না। মনে হয় এ নামের সবগুলিই ব্রাহ্মণেতর বর্ণের লোক। যতদূর দেখা যায় তাতে ব্রাহ্মণেরা এ সময় শর্মা, স্বামী বা চট্ট, ভট্ট, বন্দ্য এই অন্ত্য নামে পরিচিত হতেন একথা বলা চলে।

চতুর্বর্ণাশ্রম অনুসারে চার বর্ণের সাক্ষাৎ বাঙলায় পাওয়া যায় না। সাধারণতঃ রাজরাজণ্যরা ক্ষত্রিয়ত্বের দাবীদার। কিন্তু এ যুগে বাঙলার কোন রাজা বা রাজণ্যের পক্ষ থেকে ক্ষত্রিয়দের দাবী করা হয়নি। সাধারণতঃ বর্মা বা বর্মনদি নাম ক্ষত্রিয়ত্বজ্ঞাপক। কিন্তু বাঙলায় বর্মা অভ্যপম হিসাবে যে সব রাজার নাম আমরা পাই তাদের কেউই ক্ষত্রিয়ত্বের দাবী করেন নি। এযুগে আমরা বিভিন্ন স্থানে নগরশ্রেষ্ঠী, সার্থবাহ প্রভৃতি

www.pathagar.com

ব্যাপারি ব্যবসায়ীদের উল্লেখ দেখতে পাই। কিন্তু এঁদের মাঝে কেউই এ সময় তো নয়ই, পরবর্তীকালেও বৈশ্যত্বের দাবীদার নন। প্রকৃতপক্ষে আলাদা সুনির্দিষ্ট বর্ণ হিসাবে ক্ষত্রিয় বা বৈশ্যদের সাক্ষাৎ কোন সময়ই বাঙলায় পাওয়া যায় না। এর কারণ অবশ্য আজ পর্যন্ত সুনির্দিষ্টভাবে নির্ণীত হয়নি। রমাপ্রসাদ চন্দের মতে বাঙলার বর্ণসমাজ এ্যালপীয় আর্য সমাজব্যবস্থানুযায়ী গঠিত। সে জন্যেই বাঙলার বর্ণপ্রথার এই বৈশিষ্ট্য।

কিন্তু বর্ণভেদ প্রথার যত বৈশিষ্ট্যই বাঙলায় থাকুক না কেন, বর্ণাশ্রম প্রথার আদর্শ ক্রমে বাঙলায় দৃঢ়ভিত্তি অর্জন করছিল একথা স্পষ্টভাবেই বলা চলে। পাল রাজারা ছিলেন বৌদ্ধ-পরম সুগত। তাঁরাই ছিলেন ওদন্তপুরী, সোমপুর, বিক্রমশীল মহাবিহারের প্রতিষ্ঠাতা। নালন্দা মহাবিহারের তাঁরা ছিলেন পোষক। কিন্তু তবু তাঁদের সময় ব্রাহ্মণদের মর্যাদা, প্রতিপত্তি প্রভৃতি থেকে এ কথা বোঝা যায় যে, সামাজিক আদর্শ হিসাবে চতুর্বর্ণপ্রথা ক্রমশঃ সমাজে দৃঢ়মূল হচ্ছিলো। চন্দ্র কম্বোজ রাষ্ট্র সম্পর্কেও একথা দৃঢ়ভাবে বলা চলে। রাষ্ট্র যদিও বৌদ্ধ তবুও এ সময় বর্ণাশ্রম রক্ষণ ও পালনের দায়িত্ব ছিল রাষ্ট্রের। কিন্তু বাঙলা তখনো নিজের স্মৃতিশাস্ত্র গড়ে তোলেনি। তার জন্যই হোক বা অন্য কোন কারণেই হোক বর্ণবিন্যাস এ সময় পর্যন্ত এতটুকু দৃঢ় হয়ে ওঠেনি যেমনটি হয় সেন বর্মন যুগে।

সেন বর্মন যুগে বাঙলার নিজস্ব স্মৃতিশাস্ত্র-গড়ে উঠলো। স্মৃতি শাসন কার্যকর করার জন্যে রাষ্ট্র এ সময় সচেতন উদ্যোগ নেয়। ইতিপূর্বে পাল কম্বোজ যুগে বর্ণাশ্রম প্রথা ক্রমশঃ প্রসারলাভ করছে। বিভিন্ন আর্যপূর্ব কোম ক্রমে সেই সমাজের অন্তর্ভুক্ত হচ্ছে। অর্থনৈতিক আধিপত্য তাদের ক্রমে বাধ্য করছে ব্রাহ্মণ্য সমাজ ব্যবস্থা, তার সংস্কার প্রভৃতি মেনে নিতে। এভাবে বর্ণাশ্রম প্রথার সীমা ক্রমে প্রসারিত হতে শুরু করলো ঠিকই, কিন্তু পুরোপুরি তার রীতি-নীতি প্রচলন সহজ হলো না। পাল আমলে রাষ্ট্র সে ব্যাপারে কোন উদ্যোগও নেয়নি। কিন্তু সেন-বর্মন আমলে অবস্থাটা অন্যরকম দাঁড়ালো।

পাল ও কম্বোজ উভয় রাষ্ট্র ও বংশ ছিল বাঙালী ও বৌদ্ধ। তাদের উৎখাত করে স্থান দখল করলো সেন বর্মণ বংশ। এরা উভয়ই ছিল

www.pathagar.com

বহিরাগত এবং নৈষ্ঠিক ও গোঁড়া ব্রাহ্মণ্য ধর্মের পোষক। বাঙলার ইতিহাসে এই পরিবর্তনের তাৎপর্য খুবই গভীর।

রাষ্ট্র ও রাজবংশ এ সময় থেকে সচেতনভাবে ব্রাহ্মণ্য সংস্কারসমূহ প্রচলনের চেষ্টা করছেন। এই সময় রচিত হয়েছে বাঙালী স্মার্তকারদের স্মৃতিশাস্ত্রসমূহ। জীমূতবাহন, শূলপাণি, রঘুনন্দন এই সময়ের লোক। জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে কি করণীয় তা এঁদের রচিত গ্রন্থাদিতে বিস্তারিতভাবে বলা হয়েছে। দন্তধাবন, আচমন, স্নান, আহার-বিহারের বিচিত্র বিধি-নিষেধ থেকে ভর করে সম্পত্তি বিভাগ পর্যন্ত জীবনের প্রতি ক্ষেত্র সম্পর্কে বিস্তারিত নির্দেশ দেয়া হয়েছে এসব গ্রন্থে। রাষ্ট্রের প্রত্যক্ষ পৃষ্ঠপোষকতায় ব্রাহ্মণদের উদ্যোগে এই জাতীয় জীবনবোধ প্রচারিত হলো ব্যাপকভাবে। এ সময়ের তাম্রশাসনগুলি থেকে দেখা যায়, রাষ্ট্র ব্যাপকভাবে ব্রাহ্মণদের ভূমি দান করছেন। দুর্গম সুন্দরবন অঞ্চলেও দেখা যাচ্ছে রাজা ভূমি দান করছেন ব্রাহ্মণদের। অর্থাৎ রাজা ও রাষ্ট্র সচেতনভাবে চেষ্টা করছেন যাতে ব্রাহ্মণ্য সমাজের আধিপত্য বিস্তৃত হয় রাষ্ট্রের প্রতিটি অঞ্চলে। এভাবে যে বর্ণ-বিন্যস্ত সমাজব্যবস্থা আজও বাঙালী হিন্দুদের মাঝে প্রচলিত তার ভিত্তি স্থাপিত হয় এ সময়। এ সময়ের আগে বাঙলার সামাজিক আদর্শের সাথে এ যুগের পার্থক্য সহজেই চোখে পড়ে। হাজার বছর ধরে বাঙলায় যে ধারা চলছিল তা ভেঙ্গে নতুন করে ঢেলে সাজানো হয় এ সময়। পাল আমলেও রাষ্ট্র বর্ণাশ্রম প্রথাকে রক্ষা করতো। কিন্তু তখন পর্যন্ত রাষ্ট্রের সামাজিক আদর্শে ছিল এক ঔদার্য। রাজবংশ বৌদ্ধ হবার জন্যেই হোক অথবা কোন অর্থনৈতিক কারণেই হোক, পাল কম্বোজ আমলে এই ঔদার্য লক্ষণীয়। কিন্তু সেন, বর্মন আমলে অবস্থাটা ঠিক তার বিপরীত।

বর্ণাশ্রম প্রথার শীর্ষে ছিল ব্রাহ্মণদের অবস্থান। পঞ্চম শতক থেকে উত্তর-ভারতের ব্রাহ্মণরা বাঙলায় এসে বসবাস শুরু করেন। শুধু উত্তর-ভারত নয়, ভারতের অন্যান্য অঞ্চল থেকেও তাঁরা এসে ধীরে ধীরে ভিড় জমাতে শুরু করলেন। ধর্মানুষ্ঠান, অন্যের ধর্মানুষ্ঠানে পৌরোহিত্য ও শাস্ত্রাধ্যয়নই ছিল তাঁদের কাজ। তাঁদের মাঝে একাংশ রাজানুগ্রহে বা বিত্তবানদের আনুকূল্যে প্রচুর অর্থ ও ভূমিরও অধিকারী হতেন। অনেকে এভাবে ভূম্যধিকারী হয়ে দাঁড়িয়েছিলেন। ছোট-বড় রাজকার্যেও ব্রাহ্মণ-

www.pathagar.com

দের উপস্থিতি লক্ষ্য করার মতো। ব্রাহ্মণ রাজবংশের সংবাদও আমরা পাই। ভট্ট ভবদেবের মতে ব্রাহ্মণদের পক্ষে শূদ্রবর্ণের অধ্যাপনা, তাদের পূজানুষ্ঠানে পৌরোহিত্য, চিকিৎসা ও জ্যোতির্বিদ্যার চর্চা ও অন্যান্য শিল্পচর্চা ছিল নিষিদ্ধ। লক্ষ্য করার মতো ব্রাহ্মণদের জন্যে কৃষিবৃত্তি বা যুদ্ধবৃত্তি নিষিদ্ধ ছিল না। কিন্তু বর্ণবিশেষের অধ্যাপনা বা পৌরোহিত্য নিষিদ্ধ ছিল। ব্রাহ্মণদের মাঝেও নানারূপ বিভাগ ছিল। তাদের গাঞী বিভাগ ও ভৌগোলিক বিভাগের কথা আমরা জানি। ব্রাহ্মণদের ভিতর বারেন্দ্র, রাঢ়ী বা বৈদিক ব্রাহ্মণদের কথাও অজানা নয়। এ ছাড়াও ব্রাহ্মণদের মাঝে নানারূপ বিভাগ বিদ্যমান ছিল।

কথায় বলা হয় বাঙালী হিন্দুদের ভিতর ছত্রিশ জাত। বর্ণাশ্রম প্রথার চতুর্বর্ণ বাংলায় কোনদিনই প্রচলিত ছিল না। ব্রাহ্মণ ছাড়া আর সবাই ছিলেন শূদ্র। শূদ্রের মাঝেও বিভাগ ছিল। তাছাড়া ছিলেন অন্ত্যজরা—যাঁদের অবস্থিতি ছিল শূদ্রের নীচে। ব্রহ্মবৈবর্ত পুরাণ অনুসারে শূদ্রের মাঝে দুই ভাগ সৎশূদ্র ও অসৎশূদ্র। সৎশূদ্রের তালিকায় ছিলেন—করণ, অম্বষ্ঠ, বৈদ্য, গোপ, নাপিত, ভিল্ল, মোদক, কুবর, তাম্বুলী বা তামলী, স্বর্ণকার ও বণিকরা, মালাকার, কর্মকার, শংখকার, কুবিন্দক বা তন্তুবায়, কুম্ভকার, কংসকার, সূত্রধর, চিত্রকর বা পটুয়া।

অসৎশূদ্রেরা ছিলেন পতিত। এঁদের ভিতরে ছিলেন—স্বর্ণকার, সুবর্ণ, বণিক, সূত্রধার, চিত্রকার, অট্টালিকাকার, কোটক (ঘরবাড়ি তৈরী করা যাঁদের পেশা), তীবর, তৈলকার, লেট, মল্ল, চর্মকার, শুঁড়ি পৌণ্ড্রক মাংসচ্ছেদ রাজপুত্র (বা পরবর্তীকালের রাউত), কৈবর্ত, রজক, কৌয়ালী, গঙ্গাপুত্র, যুঙ্গি, আপ্তরী।

অসৎশূদ্রের তালিকায় স্বর্ণকার ও চিত্রকারদের অন্তর্ভুক্তিতে প্রশ্ন উঠতে পারে। কারণ, তাদের নাম সৎশূদ্রের তালিকায়ও অন্তর্ভুক্ত হয়েছে। বৃহদ্ধর্ম পুরাণ অনুসারেই এরা ব্রাহ্মণদের অভিশাপে পতিত হয়েছিলেন। সে-জন্যেই তাদের নাম অসৎশূদ্রের তালিকায় অন্তর্ভুক্ত হয়েছে।

উপবর্ণ বিভাগের তালিকা এখানেই শেষ নয়। অসৎশূদ্রের পরেও ছিল অন্ত্যজদের তালিকা। এদের অবস্থান ছিল সমাজের সর্বনিম্নে। এঁরা ছিলেন অস্পৃশ্য। বৃহদ্ধর্ম পুরাণ অনুসারে এদের তালিকায়

www.pathagar.com

ছিলেন—ব্যাধ, ভড়, কাপালী, কোল, কোঞ্চ, হড্ডি, ডোম, জোলা, বাগদী, শবাক, ব্যালগ্রাহী, চণ্ডাল।

ব্রাহ্মণদের পরেই ছিল করণ-কায়স্থদের স্থান। করণ ও কায়স্থ বলতে একই উপবর্ণকে বোঝাতো কিনা এ নিয়ে প্রশ্নের অবকাশ অবশ্য আছে। নবম, দশম, একাদশ শতকে বাঙলায় করণ-কায়স্থেরা পৃথক উপবর্ণ হিসাবে প্রতিষ্ঠিত হয়ে গিয়েছেন। বুদ্ধগয়ায় প্রাপ্ত এই আমলের একটি লিপিতে বলা হয়েছে বাস্তব্য কায়স্থরা করণ-বৃত্তি অনুসরণ করতেন। বিভিন্ন লিপির লেখক হিসেবে এঁদের নাম আমরা পাই। শাকম্ভরীর চাহমনাধীপ দুর্লভরাজের কিনসারিয়া লিপির লেখক ছিলেন গৌড়দেশবাসী মহাদেব। আর এই মহাদেবের পরিচয় হলো 'গৌড় কায়স্থ বংশ' উদ্ভূত। বীসলদেবের দিল্লী-শিবালিক স্তম্ভ-লিপির লেখক ছিলেন শ্রীপতি। আর এই শ্রীপতি ছিলেন গৌড়ীয় কায়স্থ। অবশ্য গোড়ায় পঞ্চম থেকে অষ্টম শতকের মধ্যে করণ-কায়স্থের একটি স্বতন্ত্র বর্ণ বা উপ-বর্ণ হিসেবে গড়ে ওঠেনি—দুটি শব্দই ছিল বৃত্তিবাচক। গুপ্ত আমলে স্থানীয় শাসন পরিচালনার জন্য অধিকরণসমূহের মাঝে জ্যেষ্ঠ-কায়স্থ বা প্রথম-কায়স্থের নাম দেখা যায়। এঁরা ছিলেন হিসেব রক্ষায় পারদর্শী। করণ কথাটির অর্থ হলো খোদাই যন্ত্র। গোড়ায় এই খোদাই যন্ত্র দিয়েই লেখার কাজ হতো। যারা এভাবে লিখতেন তাদেরও বলা হতো করণ। পরবর্তীকালে মসীজীবী-রাও করণ নামে অভিহিত হতেন। কালক্রমে করণ ও কায়স্থ দুটি আলাদা আলাদা শব্দ ব্যবহৃত না হয়ে একটি শব্দই ব্যবহৃত হতে থাকে। তখন এই একটি শব্দ দ্বারা দুটি বৃত্তিই অভিব্যক্ত হতো। ক্রমে বৃত্তিবাচক শব্দ থেকে এটি একটি নির্দিষ্ট বর্ণবাচক শব্দে রূপান্তরিত হয়। নবম শতক থেকে কায়স্থরা একটি নির্দিষ্ট বর্ণ হিসেবে পরিগণিত হতে থাকেন।

ব্রাহ্মণদের মতো রাষ্ট্রযন্ত্রের সাথে কায়স্থদের সম্পর্কও ছিল ঘনিষ্ঠ। অনেকেই উচ্চপদে নিযুক্ত হতেন। অনেকেই কালক্রমে সামন্তপ্রভু হয়ে বসেছিলেন।

ব্রাহ্মণ কায়স্থদের মতোই রাষ্ট্রযন্ত্রের সাথে ঘনিষ্ঠভাবে সম্পৃক্ত ছিল অম্বষ্ঠ বৈদ্যেরা। প্রাচীন স্মৃতি গ্রন্থে বর্ণ হিসেবে বৈদ্যের উল্লেখ দেখতে পাওয়া যায় না। অর্বাচীন স্মৃতি গ্রন্থসমূহে যাঁরা চিকিৎসা করতেন তাঁদের বলা হয়েছে বৈদ্য। বৃহদ্ধর্ম পুরাণে অম্বষ্ঠ ও বৈদ্যকে

www.pathagar.com

সমার্থক বলে বলা হয়েছে। কিন্তু ব্রহ্মবৈবর্ত পুরাণে উভয়কে পৃথক বর্ণ বলে ইঙ্গিত করা হয়েছে। অবশ্য কালক্রমে বাঙলায় অম্বষ্ঠ ও বৈদ্যের অভিন্নতা স্বীকৃত হয়ে গিয়েছিল। কিন্তু বাঙলার বাইরে এই অভিন্নতা সর্বত্র স্বীকৃত নয়।

বর্ণবিভাগ প্রথায় কৈবর্তদের স্থান অনেক নীচে হলেও বাঙলার ইতিহাসে এরা বেশ গুরুত্ব অর্জন করেছিল এক সময়। যতদূর মনে হয় এরা ছিল কোন আর্যপূর্ব কৌম। কালক্রমে এরা সমাজের নিম্নস্তরে স্থানলাভ করেছিল। মনুস্মৃতিতে নিষাদ পিতা ও আয়োগব মাতার সন্তানকে বলা হয়েছে মার্গব বা দাস ; এদেরই অন্য নাম কৈবর্ত। মনুর মতে এদের উপজীবিকা ছিল নৌকার মাঝিগিরি। বৌদ্ধ জাতকেও মৎস্য-জীবীদের বলা হচ্ছে কেবত্ত বা কৈবর্ত। অমর কোষেও দাস ও ধীবরদের কৈবর্ত বলা হয়েছে। এ পর্যায় পর্যন্ত মাহিষ্যদের সাথে কৈবর্তদের যোগাযোগের কোন সাক্ষ্য নেই। কিন্তু পরবর্তীকালে কৈবর্ত ও মাহিষ্যদের অভিন্নতা স্বীকৃত হয়েছে। বর্তমানে বাঙলাদেশের হালুয়া দাস এবং হুগলী-মেদেনীপুরের চাষী কৈবর্তরা নিজেদের মাহিষ্য বলে পরিচয় দিয়ে থাকেন। আবার বাঙলাদেশের ধীবর বা জালিকরাও কৈবর্ত। এ থেকে বোঝা যায় যে, কালক্রমে কৈবর্তদের মাঝে দুইটি বিভাগ রচিত হয়—একটি মৎস্যজীবীই থেকে যায়, আর একটি কৃষি বা হালিক বৃত্তি গ্রহণ করে মাহিষ্যদের সাথে এক হয়ে যায়।

কৈবর্তদের বৃত্তি যাই হোক না কেন, পাল আমলে তারা যথেষ্ট শক্তি-শালী হয়ে উঠেছিল। সিংহাসন দখল করার আগেই কৈবর্ত নায়ক দিব্বোক যথেষ্ট পরাক্রান্ত ও ক্ষমতাবান হয়ে উঠেছিলেন। দ্বিতীয় মহী-পালের রাজত্বে তিনি ছিলেন অন্যতম প্রধান সামন্ত। পরে তিনি বিদ্রোহ করেন এবং বরেন্দ্রীর সিংহাসন দখল করেন। পর পর আরও দুইজন কৈবর্ত নৃপতি রুদোক ও ভীম বরেন্দ্রী শাসন করেছেন। উত্তর বাঙলার ভীমের জাঙাল এখনো সেই যুগের সাক্ষ্য বহন করে। কৈবর্তরা এই সময় শুধু যে রাজনৈতিকভাবেই পরাক্রান্ত হয়ে উঠেছিলেন তা নয়, তাঁদের মাঝে সংস্কৃত চর্চারও যে এ-সময় প্রসার হয়েছিল তার প্রমাণও পাওয়া যায়। একাদশ-দ্বাদশ শতকে কৈবর্তরা বাঙলায় কেবট্ট বলে পরিচিত ছিলেন।

www.pathagar.com

সদুক্তি কর্ণামৃত নামক কাব্যসংকলনে আমরা কেবট্ট পপীপ অর্থাৎ কৈবর্ত কবি পপীপের একটি গঙ্গাস্তব দেখতে পাই।

সমাজের একেবারে নীচের দিকে যাঁরা ছিলেন তাঁদের বলা হতো অন্ত্যজ। এঁরা ছিলেন বর্ণাশ্রম বহির্ভূত। বৃহদ্ধর্ম পুরাণ অনুসারে এই অন্ত্যজদের তালিকা আগেই উদ্ধৃত হয়েছে। এ ছাড়া ছিল ম্লেচ্ছরা। এরা ছিলেন আরও বেশী ঘৃণার পাত্র। পুলিন্দ, পুক্কস, খস, সুহ্ম, কম্বোজ, শবর প্রভৃতি ম্লেচ্ছদেরই নানা উপবিভাগ। ম্লেচ্ছদের তালিকা থেকে তাদের প্রতিটি বিভাগের স্বতন্ত্র কৌম সত্তার ব্যাপারটি স্পষ্ট হয়ে উঠে। ম্লেচ্ছদের যে তালিকা দেওয়া হয়েছে তাতে উল্লিখিত প্রতিটি নামই পরিচিত কৌম নাম।

নবম, দশম, ও একাদশ শতকে রচিত বৌদ্ধ দোঁহাগুলিতে কৌম বা ডোম্বদের উল্লেখ দেখা যায় বার বার। ডোমরা ছিল অচ্ছুৎ। নগরের বাইরে কুঁড়ে বানিয়ে বসবাস করতো এরা—বাঁশের ঝুড়ি তৈরী করে বিক্রী করতো। ডোম মেয়ে-পুরুষেরা ছিলেন নাচ-গানে পটু। সিদ্ধাচার্যরা এ বিষয়ে বার বার তাদের দোঁহাতে উল্লেখ করেছেন। শবরেরা ছিল পর্বতচারী কৌম। তাদের মেয়েরা গলায় দিতেন গুঞ্জাফলের মালা। পুলিন্দেরা বাস করতো বাঙলার সীমান্তবর্তী অঞ্চলে। পাহাড়পুরের ধ্বংসস্তূপের মাঝে অরণ্যচারী এই কৌমসমূহের স্ত্রী-পুরুষের প্রতিকৃতি পাওয়া গেছে। তা থেকে দেখা যায় গাছের পাতাই ছিল একমাত্র পরিধেয়।

বর্ণভেদ প্রথা সম্পর্কে যেটুকু আলোচনা হলো তা থেকে দেখা যায়—সপ্তম, অষ্টম, নবম শতক বা তার কিছু আগে থেকে বাঙলায় ব্রাহ্মণ্য সমাজাদর্শের প্রভাব ক্রমেই গভীরতর হচ্ছিল। পাল-চন্দ্র বংশীয় রাজারা ছিলেন বৌদ্ধ। তবু তাদের সমাজাদর্শ ছিল ব্রাহ্মণ্য আদর্শের অনুসারী। এ সময় গৃহী বৌদ্ধরাও পারিবারিক ও সামাজিক ক্রিয়াকর্মে বর্ণভেদ প্রথা মেনে চলতেন। বস্তুতঃপক্ষে সপ্তম, অষ্টম শতক থেকেই বাঙলাদেশে লক্ষণীয় গতিতে বৌদ্ধধর্মের পতন শুরু হয়ে যায়। রাজারা এ সময় ব্রাহ্মণদের ভূমি দান করছেন। রাজ্য জুড়ে বসতি স্থাপন করছেন ব্রাহ্মণরা। অনেকেই ভূস্বামী হয়ে বসছেন। অপর দিকে বৌদ্ধ মঠ-বিহারগুলি শোচনীয় হয়ে উঠছে ক্রমেই। পাল আমলে এই ছিল মোটামুটি অবস্থা।

www.pathagar.com

পাল ও চন্দ্র বংশের পর সেন ও বর্মন বংশ। এঁদের আমলে ব্রাহ্মণ্য সংস্কারের দড়াদড়ি দিয়ে সমাজ বন্ধনের কাজটা প্রায় পুরোপুরিই সম্পাদিত হয়। এর আগে সমাজে সমাজে বর্ণাশ্রম প্রথা স্বীকৃতি লাভ করলেও এত কড়াকড়ি ছিল না সে ব্যাপারে। বর্ণাশ্রম প্রথা অনুযায়ী প্রতিটি বর্ণের বৃত্তি বংশানুক্রমিক। এক বর্ণের লোকেরা সাধারণতঃ অন্য বর্ণের বৃত্তি গ্রহণ করতে পারে না। প্রথম দিকে পাল-চন্দ্র বংশের আমলে এ ব্যাপারে তেমন কড়াকড়ি ছিল না। পরের আমলের তুলনায় বিয়ের ব্যাপারটাও অনেক ঢিলে-ঢালা ছিল এ সময়। উচ্চবর্ণের মেয়ের বিয়ে তখনো পুরো-পুরি অসিদ্ধ হয়ে যায় নি। সমাজে তখনো তারা পুরো অধিকার নিয়েই গৃহীত হতো।

সেন-বর্মন বংশীয়দের আমলে এই ব্যাপারে ব্যাপক পরিবর্তন ঘটে। দীর্ঘ দিনের টানাপোড়েন, ঘাত-প্রতিঘাতের ভিতর দিয়ে যে সামাজিক আদর্শ গড়ে উঠেছিলো, সেন-বর্মন বংশীয় রাজাদের আমলে সেই আদর্শের ভাঙন সম্পূর্ণ হলো। দেড়শো বছরের ভিতরে পুরানো বাঙলাকে ঢেলে সাজানো হলো যেন। ঘাড়ের উপর চেপে বসলো স্মৃতির অনুশাসন। এই অনুশাসন কত অনড় সে ব্যাপারে আগেই উল্লেখ করেছি। খাওয়া-শোওয়া থেকে শুরু করে হাঁচি-টিকটিকি পর্যন্ত সবকিছুই নিয়ম করে বেঁধে দেয়া হলো। কোথাও এতটুকু ফাঁক নেই, এতটুকু ঢিলে-ঢালা ভাব নেই। সব কিছুতেই অনড় অটল ভাব।

বর্ণভেদ প্রথায় সমাজের চূড়োয় রইলেন ব্রাহ্মণেরা। তারপরই করণ-কায়স্থ ও অম্বষ্ঠ বৈদ্যেরা। বাদ বাকী খেটে খাওয়া দলের অবস্থান তারপর।

বাঙলার সমাজে এককালে ব্যবসায়ী শিল্পীরা রীতিমতো মর্যাদাবান ছিলেন, তা আমরা আগে দেখেছি। বিষয় বা বিথিসমূহের অধিকরণে এদের প্রতিনিধিরা স্থান পেতেন। রাজপুরুষ ও জ্যেষ্ঠ কায়স্থের সাথে এরা সমান তালে শাসনকার্যে অংশ গ্রহণ করতেন। সে যুগে এসব কাজে বরঞ্চ ব্রাহ্মণদের তেমন কোন ভূমিকা ছিল না। এ হলো সপ্তম-অষ্টম শত-কের আগের কথা। ব্রাহ্মণ্য ধর্ম প্রসারলাভ করতে শুরু করলেও তখন পর্যন্ত বাংলায় বৌদ্ধ ধর্ম দৃঢ় প্রতিষ্ঠিত। তখন ব্যবসায়েও বাঙলার নাম-ডাক চার দিকে। অবস্থার পরিবর্তন ঘটে তারপর। সমাজে শ্রেণী-বিন্যাসের কিছুটা তারতম্য দেখা দেয় এ সময়। ব্রাহ্মণরা শুধু যে জমি

www.pathagar.com

পাচ্ছেন, তাঁদের বসতি বাড়ছে, তারা ভূস্বামী হয়ে বসছেন তাই নয়, রাষ্ট্রযন্ত্রের সাথেও তাঁদের সম্পর্ক স্থাপিত হচ্ছে। মহাসেনাপতি, মহাসান্ধিবিগ্রহিক প্রভৃতি পদ অলংকৃত করছেন এঁরা। অপরদিকে সমাজে ব্যবসায়ী, শিল্পীদের স্থান নির্দিষ্ট হচ্ছে নীচের দিকে। অন্যান্য যাঁরা গায়ে খেটে খান তাঁদের তো কথাই নেই। সমাজের এই অবস্থাকে পাকাপোক্ত করার জন্যে ব্রাহ্মণ পণ্ডিতেরা এ-সময় একের পর এক গ্রন্থ রচনা করেছেন। আদর্শগত ক্ষেত্রে এ-যুগের এই নেতাদের অনেকেই ছিলেন ব্যক্তিগতভাবে রাষ্ট্রযন্ত্রের সাথে গভীর সম্পর্কে সম্পর্কিত। দৃষ্টান্ত হিসাবে ভবদেব ভট্টের নাম উল্লেখ করা যেতে পারে। পরবর্তীকালে মধ্যযুগে স্মার্ত রঘুনন্দন সমাজের এই আঁটসাঁট বন্ধনকে পুরোপুরি অনড়-অটল করে প্রতিষ্ঠিত করলেন। তার জের আজও বাঙলার হিন্দু সমাজ টেনে চলেছে।

বর্ণ ও শ্রেণী

অর্থশাস্ত্রে শ্রেণী বলতে যা বোঝায় তা, আর বর্ণভেদ প্রথা যে সমার্থক নয় তা বর্ণভেদ প্রথা সম্পর্কে আলোচনা থেকেই বোঝা যায়। তবে আমরা জানি বিভিন্ন উপবর্ণ গোড়ায় ছিল বিভিন্ন বৃত্তির সাথে সম্পর্কিত। কাজেই বাঙলার সামাজিক ইতিহাস আলোচনায় বর্ণ ও শ্রেণীর পারস্পরিক সম্পর্ক আলোচনার প্রয়োজনীয়তা অনস্বীকার্য।

এ ব্যাপারে আলোচনা করতে গেলে প্রথমেই একটা জিনিস চোখে পড়ে। ধনোৎপাদক শিল্পী, ব্যবসায়ী ও শ্রমিক সম্প্রদায়ের লোকেরা কোন সময়ই সৎশূদ্র বা উত্তম শংকর বলে গণ্য হয়নি। দৃষ্টান্ত হিসাবে সুবর্ণ বণিক, সূত্রধর, শৌণ্ডিক, তক্ষণ, ধীবর, জালিক, কৈবর্ত অট্টালিকা-কার, যুঙ্গি, চর্মকার, শুঁড়ি, রজক প্রভৃতির কথা উল্লেখ করা যেতে পারে। এরা সকলেই মধ্যম-শংকর বা অসৎশূদ্র পর্যায়ের। সমাজে শ্রমিকদের স্থান তো অন্ত্যজ বা ম্লেচ্ছদের পংক্তিতে। চণ্ডাল, বরুড়, ঘট্টজীবী, মালবাহি, মল্ল, হড্ডি, ডোম প্রভৃতিদের কথা এ প্রসঙ্গে উল্লেখ্য। এরা প্রত্যেকেই সমাজের অত্যন্ত প্রয়োজনীয় বৃত্তিতে নিযুক্ত। কিন্তু এদের প্রত্যেকের স্থান ছিল সমাজের বাইরে।

www.pathagar.com

অপরদিকে সমাজে যাঁদের অবস্থান উচ্চকোটিতে তাঁদের—ব্রাহ্মণ করণ-কায়স্থ অম্বষ্ঠ বৈদ্যদের অনেকেই ছিলেন পরশ্রমভোজী। এঁরা যে ক্রমে ভূম্যধিকারী হয়ে বসছিলেন, তার প্রমাণ আমরা পেয়েছি। এই চিত্র অবশ্য সামন্ত যুগের।

সপ্তম-অষ্টম শতক বাংলার ইতিহাসে এক ক্রান্তিকাল। যতদূর মনে হয় সমাজে তখন মৌলিক পরিবর্তনসমূহ সাধিত হয়েছে। দৃশ্যতঃ দেখা যায় সমাজ ক্রমে কৃষি নির্ভর হয়ে উঠছে। আগেও অবশ্য কৃষিই ছিল বৃহত্তম জনতার প্রধান উপজীবিকা। কিন্তু তখন ব্যবসা-বাণিজ্যে বাঙলার নাম ডাক ছিল। সমাজে ব্যবসায়ী বণিকদের মর্যাদা ছিল, আধিপত্য ছিল। পরবর্তীকালে দেখা যায় এই বণিকদেরই বিভিন্ন অংশ সমাজে ক্রমেই মর্যাদা হারাচ্ছেন। অপরদিকে এমনকি কৃষিজীবী দাস সম্প্রদায়ও অনেক ক্ষেত্রে অধিষ্ঠিত হচ্ছেন বণিকদের চেয়ে উচ্চতর বর্ণস্তরে। মধ্য ও উত্তর-ভারতে খ্রীস্টীয় তৃতীয়-চতুর্থ শতক থেকেই বণিকদের সম্পর্কে অবজ্ঞার মনোভাব বিস্তার লাভ করছিলো। হিন্দু সমাজে ব্যবসায়ীদের সম্পর্কে একটা অবজ্ঞার মনোভাব এই সেদিন পর্যন্তও বিদ্যমান ছিল। সামাজিক মর্যাদায় ব্যবসায়ী-বণিকদের এই অধোগতি সামন্ত ব্যবস্থার সম্প্রসারণের ইঙ্গিতবহ। আর যে সময় থেকে এই প্রথা ক্রমে দৃঢ়মূল হতে শুরু করেছে তখন থেকে ক্রমে বর্ণভেদ অনড় হয়ে বর্তমান রূপ পরিগ্রহ করেছে। বাঙলায় প্রচলিত বর্তমান বর্ণভেদ প্রথার সাথে এক বিশেষ সামাজিক সম্পর্কের এই ইঙ্গিত নিঃসন্দেহে তাৎপর্যপূর্ণ। বাঙলায় সেন আমলে বর্ণভেদ প্রথা একটি অনড় ব্যবস্থা হিসেবে আবির্ভূত হয়। আর এ সময়েই সামন্তবাদের অচলায়তন দৃঢ়ভাবে চেপে বসে বাঙলার বুকে। বর্ণভেদ প্রথার সাথে সামন্ত-সমাজের এই সংযোগ লক্ষণীয়।

বর্ণভেদ প্রথার সাথে সমাজের বিভিন্ন শ্রেণী যে সমার্থক ছিল না সে কথা গোড়াতেই বলা হয়েছে। উৎপাদন যন্ত্রের সাথে নির্দিষ্ট সম্পর্কের ভিত্তিতেই শ্রেণী গঠিত হয়ে থাকে। বর্ণ বা উপবর্ণগুলির সাথে উৎপাদন যন্ত্রের এরকম কোন নির্দিষ্ট সম্পর্ক থাকাটা অপরিহার্য নয়। তবে একটা জিনিস লক্ষ্য করা যায়, তা হলো বর্ণভেদ প্রথায় যাঁদের স্থান উপরের দিকে অর্থাৎ যাঁরা সমাজের উচ্চবিত্তেরা প্রধানতঃ তাঁদেরই পংক্তিভুক্ত। আর উচ্চবিত্তেরাই যে মালিক শ্রেণী সে কথা না বললেও চলে।

www.pathagar.com

বর্ণাশ্রম প্রথার আলোচনা শেষ করার আগে কয়েকটি কথার পুনরুল্লেখ করে নেয়া প্রয়োজন। মানুষে মানুষে এরকম অনড় ভেদরেখা আর কোথাও দেখা যায় কিনা সন্দেহ। আহার-বিহার-বৈবাহিক সম্পর্ক প্রভৃতি ক্ষেত্রে বিভিন্ন বর্ণ-উপবর্ণের ভিতর ছিল বিধি-নিষেধের বেড়াজাল। বর্ণশ্রেষ্ঠ ব্রাহ্মণদের সাথে অন্যান্যদের দূরত্ব ছিল সবচেয়ে বেশী। বাঙালী স্মৃতি-কার ভবদেব ভট্ট, জীমূতবাহন প্রভৃতিরা অবশ্য বার বার ক্ষত্রিয়-বৈশ্য বর্ণের উল্লেখ করেছেন। কিন্তু তা একান্তই ঐতিহ্য সংস্কারগত মনে হয়। বাঙলার বর্ণভেদ প্রথায় শূদ্রবর্ণের অন্তর্গত বিভিন্ন উপবর্ণের সংখ্যাধিক্যও লক্ষণীয়। এই প্রসঙ্গে বিভিন্ন ঐতিহাসিকের একটি অনুমান এক্ষেত্রে উল্লেখ করা প্রয়োজন। তাঁদের মতে উচ্চবর্ণের যেসব ব্যক্তি ব্রাহ্মণ্যবাদ বিরোধী কোন মতবাদ গ্রহণ করতেন তাঁদেরও পতিত করে শূদ্র হিসেবে গণ্য করা হতো।

বর্ণাশ্রম প্রথা ও ব্রাহ্মণ্যবাদের পার্থক্যের বিরুদ্ধে এ-সময় বাঙলায় যে প্রতিবাদও ছিল না তা নয়। এই প্রতিবাদের রাজনৈতিক-সামাজিক তাৎপর্য সঠিকভাবে নির্ধারণ করা এখনো সম্ভব হয়নি। কিন্তু প্রতিবাদের ধারাটি যে খুব দুর্বল ছিল তা বোঝা যায়। মানুষে মানুষে কোন পার্থক্য নেই, এটাই ছিল ভাগবতধর্মী ও সহজযানী সাধকদের বক্তব্য। ভাগবত এমনকি বর্ণভেদ প্রথা অনুসারে অন্ত্যজ, কিরাত, হূণ, অন্ধ্র, পুলিন্দ, আভীর প্রভৃতিদেরও সমানাধিকার স্বীকার করেছে। সহজযানী সাধকদের বক্তব্যও আমাদের কাছে অপরিচিত নয়। তাঁরাও মানুষে মানুষে কোন ভেদাভেদ স্বীকার করতেন না। এঁদের চিন্তার এই দিকটির সাথে ভবিষ্যতে সুফী-সাধকদের এবং পরবর্তীকালে মরমীয়া সাধকদের মতবাদের সাদৃশ্য লক্ষ্য করার মতো। ভবিষ্য পুরাণের রচনা বোধ হয় বাঙলাদেশে। সেখানে বলা হয়েছে চার বর্ণই একই পিতার সন্তান। কাজেই তাদের মাঝে কোন ভেদ থাকতে পারে না।

কিন্তু এই প্রতিবাদ সমাজে স্বীকৃতি পায়নি। বর্ণভেদ প্রথা ও ব্রাহ্মণ্যবাদের জোয়ারের সামনে তা তলিয়ে গিয়েছিল। স্মৃতিকারদের রচনাবলীই বেঁধে দিয়েছিল জীবনযাত্রা নির্বাহের প্রধান রূপরেখা।

www.pathagar.com

প্রাচীন বাঙলার শ্রেণীবিন্যাস

সমাজের উৎপাদিত ধনের উপর ব্যক্তিগত মালিকানা যখন থেকে স্বীকৃত হলো তখন থেকেই সমাজে দেখা দিল শ্রেণী বিভেদ।

এক সময়ে সমাজ-বিকাশের আদি স্তরে, যখন সমগ্র বাঙলায় কৌম-সমাজ ভেঙ্গে যায়নি, তখন উৎপাদিত ধনের উপরে ব্যক্তিগত মালিকানা স্বীকৃত হতো না। স্বাভাবিকভাবেই তখনো সমাজে শ্রেণীবিভাগ দেখা দেয়নি। ক্রমে সমাজ বিকাশের সাথে সাথে, উৎপাদনের উপকরণসমূহের ক্রমোন্নতির ফলে উৎপাদিত সম্পদের উপর ব্যক্তিগত মালিকানা দেখা দেয়। উদ্ভব হয় শ্রেণী-সমাজের।

একেবারে গোড়ার দিকে, যখন বাঙলায় ছিল কৌম-সমাজের আধিপত্য-সে সময়কার কোন প্রত্যক্ষ ঐতিহাসিক প্রমাণ আজ আর নেই ঠিকই, কিন্তু সে যুগের কিছু কিছু বিশ্বাস আজও বিভিন্ন আচার-অনুষ্ঠানে অতীতের স্মারক হিসেবে টিকে আছে। সেগুলি থেকে আমরা যেমন সে যুগের বিশ্বাস বা মূল্যবোধসমূহের সাথে কিছুটা পরিচিত হতে পারি, তেমনি পরিচিত হ'তে পারি সে সময়ের রীতি-নীতি সম্পর্কে। অতীতের যেসব বিশ্বাস আজও আমাদের আচার-অনুষ্ঠানে টিকে আছে এ-ছাড়া অবশ্য সেই প্রাচীনকালের কোন স্মারক আমাদের হাতে নেই।

যখন থেকে উৎপাদিত সম্পদ ও উৎপাদনের উপকরণসমূহের উপর ব্যক্তিগত মালিকানা স্বীকৃত হলো তখন থেকে সমাজে দেখা দিল ধন-বৈষম্য। ঐতিহাসিককালের প্রাচীনতম সমাজেরও প্রতিষ্ঠার ভিত্তি ব্যক্তিগত ধনাধিকার। যাঁরা ধন উৎপাদন করতেন তাঁরা সম্পদ ভোগ করতেন না। কারা তা ভোগ করবেন তা নির্ভর করতো প্রচলিত মালিকানা ব্যবস্থার উপর। উৎপাদনের প্রধান উপায়সমূহের মালিকরাই ছিলেন সে সমাজে প্রধান।

প্রাচীন বাঙলায় ধনাগমের প্রধান উপায় ছিল তিনটি—কৃষি, শিল্প ও ব্যবসা-বাণিজ্য। আমরা যে সময় থেকে বাঙলার প্রাচীন ইতিহাসের কথা জানতে পারি তখন থেকে দেখতে পাই যে, ভূমিতে ব্যক্তিগত মালিকানা স্বীকৃত। এক সময় ভূমি যে ব্যক্তিগত মালিকানাধীন ছিল না তার কিছু স্মারক অবশ্য এই সেদিন পর্যন্তও টিকে ছিল। কিন্তু সেগুলি ছিল নিতান্তই এক সময়ে প্রচলিত প্রথার স্মারক। আর ভূমির ব্যক্তিগত মালি-

www.pathagar.com

কানার উপরে ভিত্তি করে স্বাভাবিকভাবেই গড়ে উঠেছিল ভূম্যধিকারী শ্রেণী। অবশ্য ভূমিতে যেমন ব্যক্তিগত মালিকানা স্বীকৃত ছিল, ঠিক তেমনিভাবে স্বীকৃত ছিল সমস্ত ভূমির উপর রাষ্ট্রের চূড়ান্ত অধিকার। তবে এই অধিকারের জন্যে ভূমির ব্যক্তিগত মালিকানার হের-ফের হতো না। এইভাবে ব্যক্তিগত মালিকানার উপর ভিত্তি করে একদিকে যেমন গড়ে উঠেছিল ভূম্যধিকারী শ্রেণী, তেমনি অন্যদিকে ছিল ক্ষেত্রকর ও কর্ষকেরা। উৎপাদিত সম্পদের উপর তাদের অধিকার ছিল না। সে অধিকার বর্তিয়েছিলো ভূম্যধিকারী ও রাষ্ট্রের উপর।

শিল্পের মালিকানা ছিল শিল্পীদের হাতে। ব্যবসা-বাণিজ্য ছিল বণিকদের করায়ত্ত। এই ক্ষেত্রে মালিকানার উপর ভিত্তি করে স্বাভাবিকভাবেই দু'টি শ্রেণী গড়ে উঠেছিল। আর উৎপাদিত ও বণ্টিত ধনের তারতম্য অনুযায়ী প্রত্যেক শ্রেণীতে গড়ে উঠেছিল বিভিন্ন স্তর।

প্রাচীন বাঙলার শ্রেণীবিন্যাস সম্পর্কে যেটুকু তথ্য আমাদের হাতে এসেছে তারও প্রধান উপাদান এ-পর্যন্ত আবিষ্কৃত তাম্র-পট্টোলীগুলি। এছাড়া সমসাময়িক সাহিত্যও এক্ষেত্রে আমাদের সাহায্য করে।

মহাস্থান লিপি থেকে আমরা জানতে পারি, বাঙলার কিয়দংশ হলেও মৌর্য সম্রাটের করতলগত ছিল। মৌর্য সাম্রাজ্যে যে ধরনের শাসনব্যবস্থা ছিল বাঙলার মৌর্যাধিকৃত এলাকায় তদ্রূপ ব্যবস্থা প্রচলিত থাকবে, এটা ধরে নেয়া যেতে পারে। আর মৌর্য শাসনপদ্ধতি সম্পর্কে আমরা বিস্তৃতভাবে জানতে পারি কৌটিল্যের অর্থশাস্ত্র ও মেগাস্থিনিসের রচনা থেকে। কিন্তু এ থেকে আমরা যেটুকু পাই তা হলো সমাজের উচ্চবিত্ত, বিশেষতঃ রাজপুরুষদের চিত্র। কিন্তু তারা ছাড়া যে ব্যাপক মেহনতী জনতা তখন সমাজে সম্পদ উৎপাদনের কাজে নিয়োজিত ছিল তাদের অবস্থা সম্পর্কে-এসব থেকে কিছুই জানা যায় না। প্রাচীন সংস্কৃত সাহিত্যে অবশ্য এদের পরিচয় কিছু কিছু পাওয়া যায়। সাঁচীর শিলালিপিগুলি থেকে কিছুটা জানা যায় বণিক ব্যবসায়ী শ্রেণীদের কথা। একমাত্র জাতকের গল্পগুলি থেকে আমরা কিছুটা বিশদভাবে জানতে পারি মেহনতি শ্রেণীগুলির অবস্থা। আর এগুলি থেকে বাঙলার তৎকালীন অবস্থাও কিছুটা অনুমান করা চলে। তবে তা নিতান্তই অনুমান। আর ইতিহাস আলোচনায় এ জাতীয় অনুমানের স্থান খুবই কম। পঞ্চম শতক পর্যন্ত

www.pathagar.com

এটাই বাঙলার অবস্থা। শ্রেণী-সমাজের অভ্যুদয় হয়েছে কিন্তু তার কোন সুস্পষ্ট রূপরেখা আমাদের সামনে নেই।

পঞ্চম থেকে সপ্তম শতক পর্যন্ত পট্টোলীর সবগুলিই হচ্ছে ভূমিদান-বিক্রয়ের দলিল। এই পট্টোলীগুলিতে ভূমিদান বা বিক্রী করতে গিয়ে যাঁদের এ ব্যাপারে অবহিত করার প্রয়োজন দেখা দিত তাঁদের নামের তালিকা থেকে সে সময়ের শ্রেণী-বিভাগ সম্পর্কে কিছুটা অনুমান করা চলে হয়তো। কিন্তু তার উপর ভিত্তি করে কোন দৃঢ় সিদ্ধান্তে আসা যায় না। এই তালিকা থেকে জানা যায় যে, প্রতিবারই ব্রাহ্মণ, মহত্তর অথবা সম্পন্ন গৃহস্থ, কুটুম্ব বা সাধারণ গৃহস্থ প্রভৃতিকে খবর দেয়া হতো। এছাড়া এই তালিকাগুলিতে বিশেষভাবে উল্লিখিত হয়েছে বণিক-ব্যবসায়ীরা।

অষ্টম থেকে ত্রয়োদশ শতক পর্যন্ত যেসব দলিল পাওয়া গেছে সেগুলিও ভূমিদানের দলিল। কিন্তু ইতিপূর্বে প্রাপ্ত দলিলগুলি থেকে এগুলি কিছুটা আলাদা। পঞ্চম থেকে সপ্তম শতক পর্যন্ত যেসব দলিল সেগুলিতে ভূমি কি বিক্রী হচ্ছে, এবং বিক্রীর পরে কি ভাবে তা দান করা হচ্ছে, তা সুস্পষ্টভাবে উল্লিখিত হয়েছে। কিন্তু এর পরের দলিলগুলিতে ভূমি বিক্রীর কোন কথা দেখতে পাওয়া যায় না। প্রতি ক্ষেত্রেই দেখা যায় রাজা ভূমি দান করছেন। এই দানের ব্যাপারে যাদের জানাতে হচ্ছে সে তালিকায় সমসাময়িক প্রায় সমস্ত শ্রেণীর কথাই উল্লিখিত হয়েছে। তবে এই তালিকায় বণিক-ব্যবসায়ী বা মহত্তর, কুটুম্বের নাম দেখতে পাওয়া যায় না। আগের দলিলগুলি থেকে এ যুগের দলিলগুলির এই পার্থক্য চোখে পড়ার মতো।

যে উপাদানগুলি পাওয়া গেছে সেগুলি বিশ্লেষণ করলে দেখা যায় সমাজের চূড়োয় ছিলেন রাজা ও রাজপুরুষেরা।

চাষের জমির উপর যদিও চূড়ান্ত মালিকানা ছিল রাষ্ট্রের, কিন্তু রাজার খাস জমিও ছিল। এই খাস জমি একদিকে যেমন প্রজাদের মাঝে বিলি করা হতো তেমনি মজুর নিয়োগ করা হতো চাষের জন্যে। এছাড়া রাষ্ট্রের প্রায় সব কিছুর উপর তাঁর ছিল একচ্ছত্র অধিকার। বনজ দ্রব্য থেকে শুরু করে ব্যবসা-বাণিজ্য কৃষি শিল্প, রাস্তাঘাটে মাল চলাচল নৌকার ভাড়া, খনি, জলাশয় খাল ইত্যাদির ব্যবস্থার প্রভৃতি বিভিন্ন ধরনের

www.pathagar.com

বিষয়ের উপর কর ধার্য করা হতো। তার উপরেও ছিল বাড়তি কর। রাজার এই একচ্ছত্র অধিকার সেকালে শাস্ত্রকার থেকে শুরু করে সবাই স্বীকার করে নিয়েছিল। ভীস্মের একটি উক্তি থেকে এটা বোঝা যায়। মহাভারতে ভীস্ম সরাসরিভাবেই বলেছেন, রাজার অবস্থার যদি অবনতি ঘটে তাহলে নিজের অবস্থার উন্নতির জন্য সাধু সন্ন্যাসী ও ব্রাহ্মণদের বাদ দিয়ে আর সবার সম্পত্তি গ্রাস করতে পারবেন।

প্রায় দস্যুবৃত্তির এই শাস্ত্রীয় অনুমোদন থেকে সেকালের অবস্থাটা বোঝা যায়।

যে কর আদায় হতো তা কিভাবে কোন খাতে ব্যয় হবে সে সম্পর্কে অর্থশাস্ত্রে একটি তালিকা দেওয়া হয়েছে। তাতে দেখা যায়, (১) রাজার পিতৃপুরুষ ও দেবতাদের পূজা-অর্চনা ও দান-ধ্যান, (২) পুণ্য কামনায় ধর্মানুষ্ঠানের পর পুরোহিতদের দান, (৩) রাজার অন্দর মহল, (৪) রাজকীয় রসুইঘর, (৫) দূত নিয়োগ, (৬) বনজ দ্রব্যের গুদাম, (৭) রাজকীর ওয়ার্কশপ, (৮-৯-১০-১১) পদাতিক বাহিনী, অশ্বারোহী বাহিনী, রক্ষী বাহিনী, গজারূঢ় বাহিনীর রক্ষণাবেক্ষণ, (১২) রাষ্ট্রীয় পশুপাল. (১৩) বন্য ও গৃহপালিত পশু-পাখীর রক্ষণাবেক্ষণের স্থান, (১৪) কাঠ ও খড় রাখার গুদাম প্রভৃতি খাতে ব্যয় হতো আদায়ীকৃত রাজস্ব। তালিকাটি অসম্পূর্ণ কিন্তু এই তালিকা থেকে দেখা যাবে যে, রাজার ব্যক্তিগত প্রয়োজন বা বিলাসের জন্যে ব্যয়িত হতো প্রচুর পরিমাণ অর্থ। আর রাজা যেখানে মৃগয়া করতে যাবেন সেই জঙ্গলের রক্ষণাবেক্ষণও রাষ্ট্রীয় ব্যয়ের মধ্যে ধরা হতো।

অর্থশাস্ত্রের বিধিবিধান বাঙলায় পুরোপুরিভাবে চালু ছিল কিনা সে ব্যাপারে জানার প্রয়োজন আছে ঠিকই, কিন্তু তবু এ থেকে সমাজে রাজার অবস্থান কিছুটা অনুমান করা চলে।

মহারাজাধিরাজের অধীনে ছিলেন রাজা, রাজক, রাজনক-রাজন্যক, সামন্ত-মহাসামন্ত, মাণ্ডলিক—মহামাণ্ডলিক। রাজপাদোজীবীদের মধ্যে এঁরা ছিলেন সবার উপরে। পাল আমল থেকে এই রাজপাদোপজীবীদের বিস্তারিত উল্লেখ পাওয়া যায় বিভিন্ন লিপিতে। এঁরা ছিলেন তৎকালীন সরকারী চাকুরে। পাল আমল থেকে বাঙলার স্বতন্ত্র রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠিত হলো। এর আগে অবশ্য শশাঙ্কর সময়ও স্বতন্ত্র রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল।

www.pathagar.com

কিন্তু তা স্থায়ী হতে পারে নি। স্বতন্ত্র রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা হবার পর স্বাভাবিক-ভাবেই এঁরা নতুন গৌরবে গৌরবান্বিত হলেন। লিপিগুলিতে রাজ-পাদোপজীবীদের এই সবিস্তার উল্লেখ তারই অভিব্যক্তি।

এই রাজপাদোজীবীদের প্রত্যেকেই যে একই অর্থনৈতিক স্তরভুক্ত ছিলেন না একথা বুঝতে অসুবিধে হয় না। এদের ভিতরে সর্বোচ্চ স্তরে ছিলেন রণক, রাজনক, মহাসামন্ত, সামন্ত, মাণ্ডলিক, মহামাণ্ডলিক। এঁরা ছিলেন সামন্ত প্রভু। নিজেদের এলাকায় এঁরা কার্যতঃ ছিলেন মহারাজাধিরাজ। নিজ এলাকায় এঁদের ক্ষমতা মহারাজাধিরাজের চেয়ে কম ছিল না। মহাসামন্ত মহামাণ্ডলিকেরা ছিলেন সর্বপ্রধান ভূস্বামী। তাঁদের নীচে সামন্ত-মাণ্ডলিকেরা। লিপিগুলিতে যাদের নাম উল্লেখ করা হয়েছে তাদের মাঝে মহামহত্তর, মহত্তর, কুটুম্ব প্রভৃতিকে দেখা যায়। মহা-মহত্তরেরা ছিলেন বৃহৎ ভূস্বামী। মহত্তর ছিলেন নীচে। ক্ষুদ্র ভূস্বামী। কুটুম্বরা ছিলেন সাধারণ ভূমিবান প্রজা।

সরকারী চাকুরে কখনো আলাদা একটা শ্রেণী হতে পারে না। যাঁরা এই বৃত্তিতে নিযুক্ত ছিলেন তাঁদের সাথে বিভিন্ন শ্রেণী থেকে আগত ব্যক্তিরা যে থাকবেন তা বুঝতে অসুবিধে হয় না। কিন্তু এখানে একটা জিনিস উল্লেখ করা দরকার। বর্ণভেদ প্রথার কল্যাণে বৃত্তি ছিল পুরুষানুক্রমে নির্দিষ্ট। এর ব্যতিক্রম যে না হতো তা নয়, কিন্তু তা অনুসরণ করাটাই ছিল স্বাভাবিক। কাজেই রাজপাদোজীবীরা প্রায়ই যে উচ্চ বর্ণের হতেন তা অনুমান করা চলে। আর এদের মাঝে যারা উপর তলার তাদের সাথে রাষ্ট্রের সম্পর্ক ছিল নিবিড়। রাষ্ট্রের উত্থান-পতনের সাথে তাঁদের ভাগ্য ছিল জড়িত। বলা যেতে পারে, এঁরা ছিলেন সে যুগের কায়েমী স্বার্থের সাথে সংযুক্ত, তাদেরই অংশ।

এর নীচের রাজকর্মচারীরা ছিলেন সে যুগের মধ্যবিত্ত। দৃষ্টান্ত হিসাবে অগ্রহারিক, অবস্থিক, চৌরোদ্ধরণিক, বলাধ্যক্ষ, নাবাধ্যক্ষ, প্রভৃ-তির কথা উল্লেখ করা যেতে পারে।

মহামহত্তর, মহত্তর, কুটুম্ব প্রতিবাসী, জনপদবাসী প্রভৃতিরা ছিলেন ভূম্যধিকারী, তাই বলে এঁরা কর্ষক ছিলেন না। লিপিগুলিতে কর্ষক অর্থাৎ যাঁরা নিজেরা চাষাবাদ করতেন তাঁদের কথা আলাদাভাবে উল্লেখ

www.pathagar.com

করা হয়েছে। ইতিপূর্বে ভূমি বিন্যাস অধ্যায় বিশ্বরূপ সেনের লিপির কথা উল্লেখ করা হয়েছে। তাতে দেখা যায় হলায়ুধ নামে এক ব্রাহ্মণ রাজার কাছ থেকে ৩৩৩ উম্মান জমি দান হিসেবে পেয়েছিলেন। এত জমি নিশ্চয়ই হলায়ুধের পক্ষে বা তাঁর পরিবারের লোকদের পক্ষে একা চাষ করা সম্ভব ছিল না। সহজেই বোঝা যায় তাঁদের প্রজা পত্তন করতে হয়েছিল। দেবযঙ্গের আশ্রফপুর লিপিতেও দেখা যায়, ভূমি একজন ভোগ করছেন কিন্তু চাষ করছেন অন্য জন। এইভাবে নিজের জমিতে প্রজা পত্তন করার প্রথা এদেশে বহুকাল যাবতই চালু ছিল।

রাজা ও রাজপ্রসাদোপজীবীদের কথা আলোচনা করতে গিয়ে এঁদের মাঝে বিভিন্ন স্তর বিভাগ এবং ভূমির সাথে এঁদের সম্পর্কের কথা স্বাভাবিকভাবেই এসে পড়েছে। ত্রয়োদশ শতক পর্যন্ত এদের এই অবস্থান কিন্তু ঠিক এক রকম ছিল তা নয়। এর মাঝে পরিবর্তন হয়েছে। পঞ্চম-ষষ্ঠ শতক পর্যন্ত যে অবস্থা বাঙলায় বিদ্যমান ছিল কৌটিল্যের অর্থশাস্ত্রের সাক্ষ্য থেকে আমরা তার কিছু পরিমাণ জানতে পারি। কৃষির ক্ষেত্রে কৃষকদের মধ্যে অধিকাংশই ছিলেন দরিদ্র-কৃষক। এঁরা ছিলেন স্বল্প জমির অধিকারী। এ ছাড়া ভাগ-চাষী ও ভূমিহীনের সংখ্যাও নিতান্ত কম ছিল না। রাষ্ট্রীয় কৃষি খামারে ব্যাপকভাবে বাধ্যতামূলক শ্রম প্রচলিত ছিল এবং এমনকি দাসদেরও খাটানো হতো। পুস্তপালের দপ্তরে বাধ্যতামূলক শ্রমের হিসেব রাখা হতো। দাস শ্রমের ব্যবহারের উল্লেখ বাৎসায়নেও আছে।

রাষ্ট্রীয় খামারে দাসদের সাহায্যে চাষের কথা আমরা অর্থশাস্ত্রে ও সমসাময়িক অন্যান্য গ্রন্থে জানতে পারি। বাঙলার উত্তরাঞ্চল একসময় মৌর্য সাম্রাজ্যের অন্তর্গত ছিল। এ থেকে আমরা ধরে নিতে পারি যে, বাঙলায়ও এ ব্যবস্থা প্রচলিত ছিল সে সময়। দাসরা যে বাজারে বিকিকিনি হতো তার প্রমাণ তো আমরা মধ্যযুগেই পাই। কাজেই মৌর্যাধিকারের যুগে রাষ্ট্রীয় খামারে দাসদের সাহায্যে চাষাবাদের অনুমান মোটেই অস্বাভাবিক বা অযৌক্তিক নয়।

খ্রীস্টীয় পঞ্চম-ষষ্ঠ শতক থেকে অবস্থার পরিবর্তন সূচিত হয় ধীরে ধীরে, আর-এক্ষেত্রে কর্ষক বা ক্ষেত্রকরদের সম্পর্কে আলোচনা করা দরকার।

www.pathagar.com

অষ্টম শতক থেকে যতগুলি লিপি আবিষ্কৃত হয়েছে তার প্রায় প্রত্যেক-টিতেই ক্ষেত্রকর বা কর্ষকদের উল্লেখ দেখা যায়। ক্ষেত্রকর বা কর্ষকরা বর্তমানে চাষী। অষ্টম শতকের আগে ক্ষেত্রকর বা কর্ষকরা ছিল না এটা মনে করার কোন কারণ থাকতে পারে না। তাহলে স্বাভাবিকভাবেই প্রশ্ন আসে অষ্টম শতকের আগে যেসব লিপির সন্ধান আমরা পেয়েছি তার সব-গুলিই ভূমি ক্রয়-বিক্রয় ও দানের পট্টোলী। তাহলে সেখানে ক্ষেত্রকর বা কর্ষকদের উল্লেখ নেই কেন? আর অষ্টম শতক বা তার পরবর্তীকালে বিভিন্ন লিপিতে দেখা যায় যে, জমি বিক্রির সময় যাদের সে সম্পর্কে খবর দেয়া হচ্ছে তাদের মাঝে কর্ষকদের নাম বিদ্যমান। এই কর্ষক নিঃসন্দেহে সম্পন্ন কর্ষক। তবু পূর্ববর্তী যুগের সাথে এখানেই পার্থক্য। প্রশ্ন আসে কেন এই পার্থক্য?

এ প্রশ্নের জবাবের সাথে বাঙলার ভূমি-বিন্যাসের প্রশ্নটি জড়িত। এ-সম্পর্কে ইতিপূর্বে কিছু আলোচনা করা হয়েছে। অষ্টম শতক বা তার পরবর্তীকালের যে লিপিগুলি আবিষ্কৃত হয়েছে তা দেখে মনে হয় যে-কোন কারণেই হোক এ সময় থেকে সমাজে ভূমির চাহিদা ক্রমে বাড়ছে। ভূমি যেন ক্রমেই কেন্দ্রীভূত হচ্ছে ব্যক্তিবিশেষের হাতে। তাছাড়া লিপিগুলিতে যেভাবে ভূমির উৎপন্ন দ্রব্য কি, কেন্ ভূমির দাম কত, বার্ষিক আয় কি পরিণাম প্রভৃতি বিষয়গুলি যেভাবে উল্লেখ হয়েছে তা থেকে মনে হয় সমা-জের ধনোৎপাদনের ভরকেন্দ্রটি যেন ক্রমেই জমির উপর ঝুঁকে পড়ছে। সমাজ যে ক্রমে কৃষিনির্ভর হয়ে উঠেছে তার প্রমাণ সে সময় আরও পাওয়া যায়। জঙ্গল কেটে আবাদ করা হচ্ছে, পত্তন করা হচ্ছে গ্রাম। লোক-নাথের ত্রিপুরা পট্টোলী থেকে আমরা সে কথা জানতে পারি।

অষ্টম শতক থেকে লিপিগুলিতে কর্ষকদের উল্লেখ থেকে এ কথা মনে করার কারণ নেই যে, কর্ষকরা ক্রমে ক্রমে সমৃদ্ধি অর্জন করছিলো। কর্ষকরা ছিল দেশের ধনোৎপাদক শ্রেণীর অন্যতম। এদের মধ্যে অধিকাংশই ছিল ভাগচাষী বা ভূমিহীন চাষী।

এ ছাড়াও এ সময় আর একটি শ্রেণীর সাক্ষাৎ পাওয়া যায়। এরা হলো প্রধানতঃ ভূমি বঞ্চিত গ্রাম্য শ্রমিক। বর্ণের দিক থেকে এদের স্থান সর্বনিম্নে। প্রধানতঃ অন্ত্যজ ও আদিবাসী কৌমের লোকদের নিয়ে এই শ্রেণী গঠিত। তৎকালীন সাহিত্যেও এদের সম্পর্কে জানা যায়। বৌদ্ধ দোঁহা ও লিপিতে

www.pathagar.com

ডোম-ডোমনী, সবর-সবরীর সাক্ষাৎ পাই। এরাও এই শ্রেণীর অন্তর্গত। এরা গ্রামের বাইরে বাস করতো। বাঁশের চাংগাড়ী প্রভৃতি তৈরী করে জীবিকা নির্বাহ করতো। গ্রামের এই শ্রমিকদের মধ্যে আরও অন্যান্যের সাক্ষাৎ পাওয়া যায়। যথা, মেদ, অন্ধ্র, চণ্ডাল প্রভৃতি।

তাহলে দেখা গেল ভূমির সাথে সম্পর্কিত শ্রেণীগুলির চেহারা ছিল নিম্নরূপ :—

(ক) বড় ভূম্যাধিকারী বা সামন্ত শ্রেণী—রাজপাদোপজীবীদের আলোচনা প্রসংগে এদের সম্পর্কে আলোচনা করা হয়েছে।

(খ) সামন্তদের চেয়ে ছোট ভূম্যাধিকারীদের স্তর—এরাও সামন্ত শ্রেণীর অন্তর্গত—এই স্তরে মহামহত্তর, মহত্তর প্রভৃতিদের কথা দৃষ্টান্ত হিসাবে উল্লেখ করা যায়।

(গ) কুটুম্ব প্রভৃতি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ভূস্বামীর স্তর।

(ঘ) ক্ষেত্রকর-কর্ষক শ্রেণী—এদের মধ্যে বেশীর ভাগ ছিলেন ভাগচাষী ও ভূমিহীন কৃষক।

(ঙ) ভূমিহীন শ্রমিক—অন্ত্যজরা বা বর্ণাশ্রম বহির্ভুক্ত অন্যান্য স্তরের লোকেরা এদের পংক্তিভুক্ত ছিলেন।

এছাড়াও শ্রেণীবিন্যাস সম্পর্কে আলোচনা করতে গিয়ে রাজা, রাজপাদোপজীবীদের সম্পর্কে আলোচনা করা হয়েছে। সম্রাট যে সবচেয়ে বড় ভূম্যাধিকারী ছিলেন সে কথাও বলা হয়েছে। তাছাড়া অন্যান্য উচ্চপদস্থ রাজপাদোপজীবীদের কথা বলতে গিয়ে বলা হয়েছে এদের একটা শ্রেণী হিসেবে চিহ্নিত করা ঠিক নয়। এঁরা সে যুগে কায়েমী স্বার্থের সাথে সম্পর্কিত ছিলেন। আর এঁদের আগে বেশীর ভাগই ছিল ভূম্যাধিকারী শ্রেণীর অন্তর্গত। রাজপাদোপজীবীদের মাঝে যাঁরা অপেক্ষাকৃত ছোট তাঁরা ছিলেন সে যুগের মধ্যবিত্ত—যদিও তাঁরাও ছিলেন সামন্ত প্রথার সাথে সংযুক্ত।

এদেশে বর্ণভেদ প্রথা আর শ্রেণী সম্পর্কে আলোচনা খুব আলাদা করা সম্ভব নয়। বর্ণগুলি বৃত্তিবাচক ছিল বলেই এই সমস্যা দেখা দেয়। বর্ণভেদ প্রথা আলোচনা করতে গিয়ে দেখেছি যে, ব্রাহ্মণরা শুধু বর্ণ শ্রেষ্ঠই ছিলেন না তাঁরা ছিলেন কায়েমী স্বার্থের সাথে ঘনিষ্ঠভাবে

www.pathagar.com

সম্পর্কিত। এঁরা ধর্ম ও জ্ঞানের চর্চা করবেন। বৌদ্ধ ও জৈন বিহারের ধর্মসংঘগুলিরও ছিল একই দায়িত্ব। কিন্তু শুধু এটুকু বললেই যথেষ্ট বলা হয় না। এঁরা সাধারণভাবে বিদ্যমান রাষ্ট্রব্যবস্থা ও কায়েমী স্বার্থের স্বার্থ সংরক্ষণ করতেন। ফলে, রাষ্ট্রানুকূল্যে এঁদের মধ্যে অনেকেই কালক্রমে বিত্তবান হয়ে উঠেছিলেন। এঁদের অনেককেই মন্ত্রী, সেনাপতি, সামন্ত, ধর্মাধ্যক্ষ প্রভৃতি হিসেবে দেখতে পাওয়া যায়। আর এ কারণেই অনেকে শ্রেণীবিন্যাস সম্পর্কে আলোচনা করতে গিয়ে এঁদের আলাদা শ্রেণী হিসেবে চিহ্নিত করে বলেছেন, এঁরা ছিলেন বিদ্যা-বুদ্ধি-জ্ঞান ধর্মজীবী শ্রেণী। 'শ্রেণী' শব্দটি একটি বিশেষ অর্থে ব্যবহার করা হয়ে থাকে। এখানেও সেই অর্থে বিদ্যা-বুদ্ধি-জ্ঞান ধর্মজীবী শ্রেণী বলে কোন শ্রেণী হতে পারে না। তবে একটা কথা মনে রাখা দরকার, সে যুগের ইতিহাসে বর্ণশ্রেষ্ঠ এই ব্রাহ্মণেরা যথেষ্ট প্রভাবশালী ছিলেন এবং সমাজের গতিধারাকে সাময়িকভাবে হলেও প্রভাবিত করতে পারতেন।

শিল্পী-বণিক-ব্যবসায়ীদের সম্পর্কে আলোচনা ছাড়া বাঙলার তৎকালীন শ্রেণীবিন্যাস সম্পর্কে আলোচনা সম্পূর্ণ হতে পারে না। এক সময়ে ব্যবসা-বাণিজ্যে বাঙলার সমৃদ্ধি ছিল উল্লেখযোগ্য। সুদূর রোমের সাথেও ছিল এদেশের যোগাযোগ। তাম্রলিপ্তি বন্দর তখন জমজমাট। বাঙলার দুকুল, প্রত্রোর্ণ বা অন্যান্য ধরনের কাপড় রপ্তানী হতো দেশ-বিদেশে। ব্যবসা-বাণিজ্যের এই সমৃদ্ধির যুগে বণিক-ব্যবসায়ীরাও যে যথেষ্ট শক্তিশালী ছিলেন এ কথা অনুমান করতে অসুবিধে হয় না। বস্তুতঃপক্ষে আমরাও তা দেখতে পাই। সপ্তম শতক পর্যন্ত এঁরাই ছিলেন স্থানীয় অধিকরণের প্রধান সহায়ক। এ সময় পর্যন্ত ভূমিদান বিক্রয়ের যতগুলি দলিল আমরা দেখতে পাই সেখানে দেখা যায় যে ভূমিদান বিক্রির ব্যাপারে যাদের বিজ্ঞপিত করা হচ্ছে তাদের মধ্যে শুধু যে নগরশ্রেষ্ঠী প্রথম সার্থবাহ বা প্রথম কুলিকের নাম করা হচ্ছে তা নয়, কোন কোন লিপিতে প্রধান ব্যাপারিণ বা প্রধান ব্যবসায়ীকেও বিজ্ঞপিত করা হচ্ছে।

অথচ অষ্টম শতক থেকে অবস্থার যেন মোড় ফিরে গেল। এ সম্পর্কে আগেও উল্লেখ করা হয়েছে। বণিক ব্যবসায়ীদের বিজ্ঞপিত করার কোন দৃষ্টান্ত এ সময় পাওয়া যায় না। এ সময়ের যে লিপিগুলি হস্তগত হয়েছে তার কোনটিতেই এদের উল্লেখ দেখা যায় না। অপরদিকে বর্ণভেদ প্রথায়

www.pathagar.com

এ সময় ব্যবসায়ী বণিকেরা মধ্যম সংকর বা তারও নীচে অসৎশূদ্রের পংক্তি-ভুক্ত। উপবর্ণগুলির তালিকায় এ সময় শিল্পী-বণিক-ব্যবসায়ীদের উল্লেখ অবশ্য দেখা যায় তাদের বেশীর ভাগই দেশান্তর্গত ব্যবসা-বাণিজ্যে জড়িত ছিলেন তা বুঝতে অসুবিধে হয় না। বণিক-ব্যবসায়ীদের এই সামাজিক অবমূল্যায়ন বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ।

শ্রেণী সংগ্রাম

শ্রেণী সংগ্রামই ইতিহাসের চালিকা শক্তি। সমাজ বিকাশের পথে ক্রমে সমাজ পরিবর্তনের যে বাস্তব উপাদান ও প্রয়োজনীয়তাসমূহ সৃষ্টি হয়, শ্রেণী সংগ্রাম সেগুলিকে সার্থকতার পথে নিয়ে যায়। একথা এই বইয়ে আগেও বলা হয়েছে।

শ্রেণী সংগ্রামের দৃষ্টিকোণ থেকে বাঙলার ইতিহাসের বিশ্লেষণ খুবই কঠিন। আজ পর্যন্ত এ ব্যাপারে কোন উদ্যোগ নেয়া হয়েছে বলে জানা নেই। কিন্তু এই ভিত্তিতে যদি বিশ্লেষণের উদ্যোগ নেয়া না যায় তাহলে সমগ্র ইতিহাস আলোচনা শুধু অসম্পূর্ণই নয়, ত্রুটিপূর্ণ হতে বাধ্য। আজ পর্যন্ত যে তথ্য আবিষ্কৃত হয়েছে, প্রাচীন গ্রন্থাদিতে যে সাক্ষ্যটুকু পাওয়া যায় তা অগোচর নয়। কিন্তু এই তথ্যাদি থেকে শ্রেণী সংগ্রামের মূল সূত্রটুকু বের করে আনা আজ পর্যন্ত সম্ভব হয়নি।

শ্রেণী দৃষ্টিভঙ্গী থেকে ইতিহাস-বিচারের শুরুতেই ইতিহাসের পর্ব-বিভাগের প্রশ্নটি এসে পড়ে।

একসময় বাঙলায় যে শ্রেণীহীন কৌম সমাজের অস্তিত্ব ছিল সে ব্যাপারে সন্দেহের অবকাশ নেই। সে যুগের বহু স্মারক আজও আমাদের রীতি-নীতি আচার-আচরণের মাঝে টিকে আছে। তাছাড়া পশ্চিম বাঙলার মেদেনীপুর অঞ্চলে আবিষ্কৃত প্রত্ন-প্রস্তর যুগের কুড়ালগুলো প্রমাণ করে, সে যুগে বাঙলায় মানুষের বসবাস ছিল এবং তাদের উৎপাদন যন্ত্র কতটুকু উন্নত তা দেখে বলা যেতে পারে যে, সেই মানুষেরা বাস করতো আদিম সাম্য-বাদী সমাজ ব্যবস্থার স্তরে। এছাড়াও প্রত্যক্ষ প্রমাণ আমাদের মাঝে বিদ্যমান। বাঙলার বিভিন্ন উপজাতির কথা বলছি। বাঙলায় বসবাস-কারী সমস্ত মানুষের বিকাশ একই সাথে একভাবে ঘটেনি। বিকাশ ছিল

www.pathagar.com

অসম। আর সেজন্যেই আমরা দেখতে পাই বিশ শতকের এই আশির দশকেও কোন কোন জনগোষ্ঠী অনেকটা কৌম সমাজের স্তরেই আটকে আছে। এসব থেকে বলা চলে এক সময় গোটা বাঙলায় এই অবস্থা বিরাজ করতো। এটা ছিল আদিম সাম্যবাদী সমাজের স্তর। এই স্তরের রূপ-রেখা বিশ্বের সর্বত্রই একই রকম। কাজেই বাঙলায় সে যুগের সমাজ ব্যবস্থার ধরন কি ছিল আমরা তা থেকে অনুমান করতে পারি।

আদিম সাম্যবাদী সমাজ ব্যবস্থা ভেঙ্গে এক সময় এদেশে শ্রেণী বিভক্ত সমাজের অভ্যুদয় হলো। রাষ্ট্রব্যবস্থারও পত্তন হলো। মহাস্থান শিলাখণ্ড থেকে জানা যায় খ্রীস্ট-পূর্ব তৃতীয় শতকে বাঙলা সুসংবদ্ধ মৌর্য সাম্রাজ্যের অন্তর্গত ছিল। তার কত আগে বাঙলায় রাষ্ট্রব্যবস্থার পত্তন হয়েছিল তা জানার উপায় নেই। তবে মহাভারতের বিবরণ থেকে মনে হয় বাঙলার বিভিন্ন অঞ্চলে ক্রমে রাষ্ট্রব্যবস্থা বিকশিত হচ্ছিলো ধীরে ধীরে। যে অধ্যায়ে রাষ্ট্র সম্পর্কে আলোচনা করা হয়েছে সেখানে এ বিষয়ে অপেক্ষাকৃত বিস্তৃত আলোচনা করা হয়েছে।

পেরিপ্লাস গ্রন্থ, টলেমির বিবরণ প্রভৃতি থেকে সে যুগে বাঙলার বাণিজ্যিক সমৃদ্ধির কথা জানা যায়। কথা সরিত সাগরের গল্পও একই ইঙ্গিত দেয়। বাণিজ্যিক সমৃদ্ধির সাথে সাথে সে যুগে গড়ে উঠেছিল অনেকগুলি সমৃদ্ধ নগর। এই নগরের বেশীর ভাগের ভিত্তি ছিল ব্যবসা-বাণিজ্য। শাসনযন্ত্রের কেন্দ্রকে ভিত্তি করেও সে যুগে শহর গড়ে উঠতো ঠিকই। কিন্তু সমাজের ব্যবসা-বাণিজ্যের প্রাধান্য থেকে ব্যবসা-বাণিজ্য-ভিত্তিক নগরসভ্যতা ছিল এযুগের একটি বৈশিষ্ট্য। ব্যবসা-বাণিজ্যের পাশাপাশি শিল্পও এযুগে বিকশিত হয়েছিল। এসময় শিল্পোৎপাদন কিভাবে হতো তা ঠিকভাবে জানার উপায় নেই। তবে বাৎসায়নের সাক্ষ্য থেকে জানা যায় ক্রীতদাসরা ছিল সে যুগের অন্যতম উৎপাদক শ্রেণী। আরও যেটুকু জানা যায় বুদ্ধদেবের পাঁচজন গুরু অজিত কেশ কম্বলী, মক্ষলি গোশাল প্রমুখদের মাঝে কয়েকজন ছিলেন দাস-বিদ্রোহের নেতা। এ-থেকেও সে সময়ে ক্রীতদাসদের অস্তিত্বের কথা বোঝা যায়। ক্রীতদাস ছাড়াও বাধ্যতামূলক শ্রমের অস্তিত্ব সে যুগে ছিল। কৌটিল্যের সাক্ষ্য থেকেই তা জানা যায়।

www.pathagar.com

পঞ্চম শতক থেকে বাঙলার সামাজিক অবস্থা আমরা অনেকটা বিশদ-ভাবে জানতে পারি। এ সময়েও বাঙলা প্রধানতঃ শিল্প ও ব্যবসা-বাণিজ্য নির্ভর। কিন্তু ষষ্ঠ শতক থেকেই পরিবর্তনটা চোখে ধরা পড়ে। এসময় থেকে ভূমির চাহিদা বাড়তে শুরু করে। মনে হয় এ সময় থেকে সমাজে ভূমি সম্পদই প্রধান সম্পদ হিসেবে ক্রমশঃ স্বীকৃতি লাভ করে। সপ্তম শতকের শেষার্ধ ও অষ্টম শতকের প্রথমার্ধ থেকে পরিবর্তন সুস্পষ্ট হয়ে উঠে। বাঙলার ইতিহাসে এটি একটি ক্রান্তিকাল। এদিক বিচার করলে মাৎস্যন্যায়ের যুগ কোন নতুন তাৎপর্য নিয়ে আমাদের সামনে উপস্থিত হয় কি-না তা ভেবে দেখার প্রয়োজন আছে। 'প্রকৃতি-পুঞ্জ' অর্থাৎ প্রজা-বৃন্দ মিলে গোপালকে সম্রাট হিসেবে নির্বাচিত করেছিলেন এটা জানা যায়। এই প্রকৃতি-পুঞ্জ যে দেশের আপামর জনতা নয় এবং গোপালের নির্বাচনকে উপলক্ষ্য করে গোটা দেশে কোন গণভোট যে গৃহীত হয়নি সে কথা স্বতঃ-সিদ্ধ। প্রকৃত প্রস্তাবে এই প্রকৃতি-পুঞ্জ ছিলেন সে সময়কার সামন্ত প্রভুরা। তাঁরাই নির্বাচিত করেছিলেন গোপালকে। এই ঘটনা বিশেষ কোন তাৎপর্য বহন করে কি-না তা আজও সচেতন ঐতিহাসিকের গবেষণার অপেক্ষা রাখে।

অষ্টম থেকে ত্রয়োদশ শতক পর্যন্ত অর্থাৎ এই গ্রন্থের আলোচ্য সময়-সীমা পর্যন্ত বাঙালী সমাজ প্রধানতঃ কৃষিনির্ভর। এ সময় সামন্ত প্রথা সুপ্রতিষ্ঠিত। এ সমাজের একদিকে দোর্দণ্ড প্রতাপ সামন্ত প্রভু, বিপরীত মেরুতে অসংখ্য ভূমিহীন প্রজা ও ভাগচাষী। মাঝে নানা স্তরের ছোট-বড়-মাঝারি ভূম্যাধিকারী দল। সামন্ত রাষ্ট্রে একজনের আধিপত্য এ সময়। এই সামন্ত রাষ্ট্র যখন ক্রমে অবক্ষয়ের পথ ধরে নতুন এক ক্রান্তিলগ্নের দিকে অগ্রসর হচ্ছে সে সময় বাঙলায় তুর্কী অধিকার প্রতিষ্ঠিত হলো। সামন্ত সমাজ আবার জেঁকে বসলো বাঙলার বুকে।

সমাজ ব্যবস্থার দৃষ্টিকোণ থেকে বাঙলার সমাজের উপরোক্ত স্তর ভেদ সম্পর্কে আলোচনা শ্রেণী দৃষ্টিকোণ থেকে বাঙলার ইতিহাস আলো-চনার প্রথম কথা। এই আলোচনায় দেখা গেল আদিম সাম্যবাদী সমাজ ব্যবস্থা, খ্রীস্টীয় সপ্তম-অষ্টম শতক পর্যন্ত বিদ্যমান সমাজ ব্যবস্থা ও সামন্তবাদী সমাজ ব্যবস্থা—এই তিন ধরনের সমাজ ব্যবস্থার পথ বেয়ে বাঙলা এসে দাঁড়িয়েছিলো ত্রয়োদশ শতকে। আদিম সাম্যবাদী সমাজের

www.pathagar.com

পরে, আর সামন্তবাদী সমাজের মধ্যবর্তী স্তরের সঠিক নামকরণ কি হবে তা বলা কঠিন। দাসশ্রমের অস্তিত্বের কথা আমরা আলোচনা করেছি, কিন্তু তা সে সময় প্রধান ছিল কিনা তা বলা কঠিন। অন্যান্য দেশের দাস সমাজের মতো এ যুগে বাঙলার শিল্প-বাণিজ্যে সমৃদ্ধি লক্ষণীয়। তবে নামকরণ যাই হোক, এই স্তর যে একটি আলাদা স্বতন্ত্র স্তর সে ব্যাপারে সন্দেহ নেই।

সমাজের এই যে ক্রমবিবর্তন তার মূলে শ্রেণী-সংগ্রামের ভূমিকাটি যথাযথভাবে বের করে আনা এর পরের প্রশ্ন। আর অসুবিধেটাও এখানেই। গ্রীস বা রোমের ইতিহাসে শ্রেণী-সংগ্রামের যে সূত্রটি আমরা স্পষ্টভাবে ধরতে পারি এখানে তা এতো সহজে ধরা সম্ভব নয়। শ্রেণী সংগ্রামের এই ধারাটি আজও অস্পষ্ট। বিভিন্ন সময় যেটুকু ইঙ্গিত পাওয়া যায় তাছাড়া এ বিষয়ে আলোচনা করতে হলে আমাদের নির্ভর করতে হয় প্রধানতঃ তৎকালীন সাহিত্য ধর্ম প্রভৃতি বিষয়ের উপর।

ধর্ম নিয়েই প্রথম আলোচনা শুরু করা যাক। বৌদ্ধ ও ব্রাহ্মণ্য ধর্ম উভয়ই ছিল আর্য মতবাদ। আর্যরাই তা প্রচারের উদ্যোগ গ্রহণ করেছিলেন। বাঙলার বৌদ্ধ বা ব্রাহ্মণ্য বা জৈন মতবাদ প্রচারের আগে এদেশে ছিল বিভিন্ন কোমের বসবাস। এই বিভিন্ন কোমের আবার নিজস্ব বিশ্বাসও ছিল। এই বিশ্বাসকে ভিত্তি করে গড়ে উঠেছিল সেই সব কোমের নিজস্ব ধর্মানুষ্ঠান পদ্ধতি। ক্রমে আর্যরা যখন তাদের বিশ্বাস নিয়ে এদেশে প্রভাব বিস্তার করতে এগিয়ে এলো, যখন তারা নিজেদের শ্রেণীসমাজের রীতি-নীতি ধ্যান-ধারণা সমাজ ব্যবস্থা বিভিন্ন কোমগুলোর উপর চাপিয়ে দিতে উদ্যত হলো তখন স্বাভাবিকভাবেই তারা সেটা স্বেচ্ছায় মেনে নিতে চাইলো না। বিরোধ দেখা দিলো। আর এই বিরোধ শুধু যে অধিকার বিস্তারের ক্ষেত্রে সীমাবদ্ধ রইলো তা নয়। তা ধ্যান-ধারণা থেকে সর্বক্ষেত্রে পরিব্যাপ্ত হলো। ধর্মচেতনাও বিরোধের এইরূপ একটি ক্ষেত্র। মনসামংগল মধ্যযুগীয় কাব্য। কিন্তু তার আখ্যান ভাগটি যতদূর মনে হয় বহু প্রাচীন যুগের স্মৃতিবহ। ধর্মমতের বিরোধ যে কতদূর তীব্র হতে পারে তা এই কাহিনী থেকে বোঝা যায়। আর এই বিরোধ বাহ্যতঃ ধর্মমতের বিরোধ হলেও তার পিছনে যে একটি সামাজিক, রাজনৈতিক সংঘাত সক্রিয় ছিল একথা বলা চলে। কৌটিল্যের অর্থশাস্ত্রের

www.pathagar.com

সাক্ষ্য যদি বিশ্বাস করতে হয় তাহলে এদেশে অনেক ক্ষেত্রেই প্রাচীন কৌম সমাজের উপরে ভাঙ্গন জোর করে চাপিয়ে দেয়া হয়েছিল। ফলে অনেক বিশ্বাস পরবর্তীকালেও টিকে ছিল দীর্ঘকাল।

আমাদের ইতিহাসের এই দিকটি এখন পর্যন্ত অবহেলিত। প্রত্ন-তাত্ত্বিক প্রমাণ ছাড়াও সমাজ-জীবনে বাস্তবে আমাদের অতীত ইতিহাসের যেসব উপাদান ছড়িয়ে আছে সেদিকে আমাদের দৃষ্টি আজও কম। অথচ একটু নজর করলেই দেখা যাবে এই উপাদান নেহাত কম নয়। এখন পর্যন্ত ধর্ম-বিশ্বাস, আচার-আচরণ প্রভৃতি ক্ষেত্রে তার নিদর্শন টিকে আছে। আর এই টিকে থাকার পিছনে আছে সংগ্রাম ও সংগ্রামের ফল-শ্রুতিরূপে সময়ের ইতিহাস। আর্য বিশেষতঃ ব্রাহ্মণ্য ধর্মমতের নেতৃবৃন্দ আর্যের এইসব কৌম বিশ্বাসের প্রতি কিরূপ ছিলেন তার প্রমাণ আমরা জানি। মনু বা অন্যান্যরা এই জাতীয় আর্যের আদর্শের বিরুদ্ধে বার বার বিষোদ্গার করেছেন। কিন্তু তাঁদের বিরুদ্ধতা সত্ত্বেও আর্যের সেই সব বিশ্বাস আজও হিন্দু সমাজের ধর্ম বিশ্বাসের অংগ হিসাবে টিকে আছে। দৃষ্টান্ত হিসাবে হিন্দু সমাজে প্রচলিত বিভিন্ন ব্রতের কথা বলা যেতে পারে। এই সব ব্রতের কোন প্রয়োজন হয় না। আমাদের দেশের মেয়েরাই এতে ধর্মানুষ্ঠানের দায়িত্ব পালন করে থাকেন। আর এই-সব ব্রতের সবগুলিই কৃষি বা প্রজনন সংক্রান্ত যাদু বিশ্বাসের সাথে সম্পৃক্ত। একাদশ শতকের আগেও বাংলাদেশে ধ্বজা পূজা প্রচলিত ছিল। গোবর্ধন আচার্য বা জীমূতবাহনের গ্রন্থে তার পরিচয় পাওয়া যায়। কৌম সমাজের টোটেম বিশ্বাসের সাথে এই ধ্বজা পূজা সম্পৃক্ত ছিল। বিভিন্ন কোমের টোটেম লাঞ্ছিত ধ্বজার পূজাই ছিল এই অনুষ্ঠানের অংশ। এছাড়া গাছ পূজা এখন পর্যন্ত প্রচলিত। যে মনসা পূজার কথা আগে উল্লিখিত হলো সেই মনসা পূজাও প্রাচীন কৌম সমাজের ধর্ম বিশ্বাসের সাথে সম্পৃক্ত। মনসার মূর্তির সাথে সাপের সম্পর্ক মনসা মূর্তি দেখলেই বোঝা যায়। সাপ প্রজনন শক্তির প্রতীক। একাদশ শতক-পূর্ব বাঙলাদেশে যে সব মূর্তি পূজা হতো তার একটা নিদর্শন আমাদের হাতে এসেছে। এসব মূর্তির প্রত্যেকটিতে মনসার সাথে একাধিক সর্পের ক্রোড়াসীন একটি মানব শিশু, একটি ফল বা একটি পূর্ণঘটের প্রতিশ্রুতি বিদ্যমান। আর এ থেকে প্রজনন শক্তির সাথে মনসাপূজোর সম্পর্ক বোঝা যায়।

www.pathagar.com

ধর্ম-বিশ্বাস বা লোকাচারের ক্ষেত্রে আর্য-পূর্ব কৌম সমাজের আরও স্মারকের কথা উল্লেখ করা যেতে পারে।

ধর্ম-বিশ্বাস ও আচার-অনুষ্ঠানের ক্ষেত্রে যে বিরোধ ও সমন্বয়ের কথা উল্লেখ করা হলো তার পুরো রূপরেখাটি যদি বের করে আনা সম্ভব হতো তাহলে সে যুগের শ্রেণী-সংগ্রামের বিশিষ্ট রূপটি স্পষ্ট হয়ে উঠতো আমাদের চোখের সামনে। ছিটেফোঁটা যে দু'একটা কাহিনী আমরা জানতে পারি তা থেকে এদেশের প্রাচীন দেশজ বিশ্বাসের সাথে অর্থাৎ—ব্রাহ্মণ্য ধর্মের সংঘাতের তীব্রতা ও রূপটি বোঝা যায়। পুণ্ড্র-বাসুদেবের সাথে যাদব-কৃষ্ণের সংঘাতের সংবাদ পাওয়া যায় হরিবংশ গ্রন্থে। পুণ্ড্র-বাসুদেব যে পুণ্ড্র বর্ধনের অধিবাসী ছিলেন এ-কথা অনুমান করা বোধ হয় অসংগত নয়। আর যাদবকৃষ্ণ তো আমাদের অপরিচিত নন। মহাভারতেও ভীমের পূর্বাভিযানে পৌণ্ড্রক বাসুদেবের সাথে ভীমের সংঘর্ষের কাহিনী বিদ্যমান। পৌণ্ড্রক বাসুদেব আর পুণ্ড্র বাসুদেব বোধ হয় অভিন্ন সত্তা। তবে এঁর ধর্মমত ও বিশ্বাস কি ছিল তা জানার উপায় নেই। এই সংঘাতের কাহিনীর পিছনে আর্যোত্তর ও আর্যপূর্ব ধর্মমতের সংঘাতের কাহিনী লুকিয়ে থাকাটা খুবই স্বাভাবিক। মহাভারতেরই বিভিন্ন জায়গায় পূর্বাঞ্চলের অধিবাসীদের সম্পর্কে আর্যরা কি মনোভাব পোষণ করতেন তা বোঝা যায়। আর এ অঞ্চলে আর্যরা ক্রমে যে প্রভাব বিস্তার করতে চাইছেন সে কথাও বোঝা যায় ওই মহাভারত থেকেই। ভীম ও অর্জুনের দিগ্বিজয় থেকে বোঝা যায় এই অঞ্চলের দিকে ক্রমে তাঁদের দৃষ্টি আকৃষ্ট হচ্ছিল। ফলে সংঘাতও যে অনিবার্য হয়ে উঠছিলো তা বোঝা যায়। পুণ্ড্র বাসুদেব ছাড়াও প্রাচ্য অঞ্চলের আরও অধিপতিদের সাথে কৃষ্ণ-অর্জুন প্রমুখের সংঘাতের কাহিনী আমরা জানতে পারি। কিরাত-দের দেশে অর্জুনের অভিযাত্রা সম্পর্কে যে কাহিনী মহাভারতে আমরা দেখতে পাই তার পিছনে কোন সংঘাতের ইতিবৃত্ত লুকিয়ে আছে কি-না তা ভেবে দেখার মত।

বৌদ্ধ ও জৈন ধর্মও আর্যদেরই ধর্মমত। তবে এদের শ্রেণীভিত্তি কি ছিল এটা অবশ্য ভেবে দেখার মত। কারণ, বৌদ্ধ ধর্মের সাথে ব্রাহ্মণ্য ধর্মের সংঘাতের ইতিবৃত্ত ভারতীয় ইতিহাসের একটি উল্লেখযোগ্য ঘটনা। বাঙলায় বৌদ্ধ ও জৈন এই উভয় ধর্মই প্রসারলাভ করেছিল। জৈন ধর্ম

www.pathagar.com

প্রসারলাভ করেছিল রাঢ় অঞ্চলে। খ্রীস্ট-পূর্ব চতুর্থ-তৃতীয় শতকেই পুণ্ড্রবর্ধনেও জৈনধর্মের যথেষ্ট প্রসার ঘটেছিল এমন প্রমাণ পাওয়া যায়। জৈন কল্পসূত্রে তামলিত্তিয়, কোটিবর্ষীয়া, পোংডবর্ধনীয়া ও খব্বডিয়া নামে জৈন গোদাসগনীয় ভিক্ষুদের চারটি শাখার উল্লেখ আছে। এই শাখাগুলির নাম সবগুলিই স্থান নাম থেকে গৃহীত, যথা—তাম্রলিত্তিয় অর্থাৎ তাম্রলিপ্তি, কোটিবর্ষীয়া অর্থাৎ কোটিবর্ষ (দিনাজপুর), পোংডবর্ধনীয়া অর্থাৎ পুণ্ড্রবর্ধন (বগুড়া) প্রভৃতি। এসব থেকে বাঙলায় জৈনধর্মের ব্যাপক প্রসারের কথা বোঝা যায়।

জৈন মতবাদের পাশাপাশি আজীবিকদের মতবাদও বাঙলাদেশে কিছুটা প্রসারলাভ করেছিল। আজীবিক ধর্মের প্রতিষ্ঠাতা মখলিপুত্র গোসাল। যতদূর জানা যায় মখলিপুত্র গোসাল ছিলেন দাসবিদ্রোহের অন্যতম নেতা। দিব্যবদাসের একটি গল্পে জানা যায় অশোক একবার পুণ্ড্রবর্ধনের নির্গ্রন্থদের (জৈনদের) অপরাধে (ভুল করে!) পাটলীপুত্রের ১৮০০০ হাজার আজীবিকদের হত্যা করেছিলেন। ব্যাপারটা ভেবে দেখার মত। অশোকের মত একজন সম্রাট যিনি ধর্মযাজক নামে খ্যাত এবং বুদ্ধধর্মের একনিষ্ঠ সেবক তিনি ১৮০০০ হাজার মানুষ হত্যা করছেন এটা ভাবতেও কেমন লাগে। এই নৃশংসতার পিছনে কি শ্রেণী সংগ্রামের কোন রক্তাক্ত অধ্যায় মুখ লুকিয়ে আছে?

জৈনধর্মের সমসাময়িককালে বৌদ্ধ ধর্মও বাঙলায় প্রসারলাভ করে। উত্তর-বাঙলা তখন উত্তর-ভারতীয় সাম্রাজ্যের অন্তর্গত। শুধু উত্তর বাঙলা নয়, বঙ্গেও বৌদ্ধধর্মের প্রভাব পরিব্যাপ্ত হয়। বৌদ্ধধর্মের প্রভাব-প্রতিপত্তি বৃদ্ধির সাথে বাঙলার ব্যবসা-বাণিজ্যের প্রসার লক্ষণীয়। এই দুইয়ের সাথে কোন সম্পর্ক আছে কিনা সেটাও ভেবে দেখার মত। বাঙলার সমাজে এ সময় বণিক-ব্যবসায়ীদের যে প্রভাব ছিল সে ব্যাপারে আমরা ইতিপূর্বে ব্যবসা-বাণিজ্যের অধ্যায়ে দেখেছি। তাম্রলিপ্তি এসময় জমজমাট বন্দর। বাঙলার পণ্যদ্রব্য এ সময় সুদূর রোম পর্যন্ত ছড়িয়ে পড়ছে। রাষ্ট্র ক্ষমতার সাথেও এ সময় ব্যবসায়ী-বণিকদের সংযোগ খুবই ঘনিষ্ঠ। আর এই বণিকদের মাঝে বৌদ্ধধর্মের প্রভাবও লক্ষণীয়।

এই প্রসঙ্গে বাঙলায় বৌদ্ধ ধর্মের আরেকটি বৈশিষ্ট্যের কথা উল্লেখ করা দরকার। সম্রাট রাজপুরুষদের পৃষ্ঠপোষকতায় বিভিন্ন বিহার বা

www.pathagar.com

সংঘারামে যেমন বৌদ্ধধর্মের চর্চা হতো এবং তাতে যেমন বাঙলায় তার নিজস্ব ছাপ রাখতে সক্ষম হয়েছিল ঠিক তেমনিভাবে বৌদ্ধধর্ম বাঙলার ব্যাপক মানুষের মাঝেও ছড়িয়ে পড়েছিল। অভিজাত সম্প্রদায়ের সীমানা ডিঙিয়ে বৌদ্ধধর্ম যত সমাজের নীচুতলার মানুষগুলির সাথে ছড়িয়ে পড়তে লাগলো ততো তারা নিজেদের বিশ্বাসসমূহ নিয়ে বৌদ্ধধর্মে আশ্রয় নিতে শুরু করলো। সহজযানী মতবাদ বজ্রযানী মতবাদ এই জাতীয় সংমিশ্রণেরই ফল। মন্ত্র, যন্ত্র, ধারণী, বীজ, মণ্ডল প্রভৃতি ধারণা পরিব্যাপ্ত হলো বৌদ্ধধর্মে। আর এ সব ধারণাই কৌমসমাজের যাদু বিশ্বাস থেকে উদ্ভূত। প্রাচীন বাঙলার নিদর্শনরূপে যে বৌদ্ধ দোঁহা চর্যাপদগুলি আমাদের হাতে এসেছে সেগুলি এই জাতীয় মতবাদের সাধন ভজনের সাথে যুক্ত।

বৌদ্ধ ধর্মের এই দুই ধারা প্রধানতঃ অভিজাতদের মাঝে প্রচলিত বৌদ্ধধর্মের মতবাদ ও গণমানুষের সাথে প্রচলিত মতবাদের মাঝে সংঘাতের কোন খবর আমরা জানি না। তবে আগামী দিনে এদিকেও দৃষ্টিপাত করা প্রয়োজন।

বাঙলার ইতিহাসে ষষ্ঠ-সপ্তম-অষ্টম শতক বিশেষ উল্লেখযোগ্য। সমাজের এ-সময় পরিবর্তন হয়েছে। সমাজ ক্রমে কৃষি-নির্ভর হয়ে দাঁড়িয়েছে। এ-সময় ক্রমে ব্রাহ্মণ্য ধর্মও প্রসারলাভ করেছে।

শশাংকের অভ্যুদয় এ সময় একটি উল্লেখযোগ্য ঘটনা। শশাংকই প্রথম বাঙলার স্বতন্ত্র রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা করেন। তিনি ছিলেন ব্রাহ্মণ্য ধর্মের পরিপোষক। বৌদ্ধদের বিরুদ্ধে তাঁর মনোভাব নিয়ে বহু কাহিনী প্রচলিত। কথিত আছে, তিনি বৌদ্ধদের বিরুদ্ধে অভিযান পরিচালনা করেছিলেন।

এ-সময় আরেকটি উল্লেখযোগ্য ঘটনা মাৎস্যন্যায়। মাৎস্যন্যায়ের প্রকৃত সামাজিক তাৎপর্য কি তা আজও বিচারের অপেক্ষা রাখে। মাৎস্যন্যায়ের পরে যে সামাজিক পরিবর্তন সাধিত হয় তা আমরা জানি। কিন্তু মাৎস্যন্যায়ের সময়ের ইতিহাস আমাদের অজ্ঞাত। এ-সময় সহজযানী বা বজ্রযানী মতবাদের বিস্তারও লক্ষ্য করার মতো ঘটনা। সমগ্র বাঙলায় তখন যে অরাজক অবস্থা বিরাজ করছিলো, কেন্দ্রীয় শাসন ভেঙ্গে পড়ে যে ভাবে এ সময় নতুন সমাজের ভিত্তি পত্তন হচ্ছিল অবশ্যম্ভাবীরূপে যে সংঘাত

www.pathagar.com

তখন তীব্র হয়ে উঠছিলো তার সাথে সহজযানী প্রভৃতি মতবাদের প্রসারের কোন সংযোগ আছে কিনা সেটাও ভেবে দেখা প্রয়োজন।

আগেই বলেছি বাঙলায় শ্রেণী সংগ্রামের সঠিক রূপরেখাটি খুঁজে বের করে আনা এখন পর্যন্ত সম্ভব নয়। বাঙলার ইতিহাস সম্পর্কে যেটুকু জানা গেছে তা এখন পর্যন্ত অপর্যাপ্ত। তাছাড়া এই দৃষ্টিকোণ থেকে ইতিহাস বিচারের কোন প্রচেষ্টাই এখনো হয়নি। আমি এই অধ্যায়ে এই প্রসঙ্গে কতকগুলি প্রশ্নের অবতারণা করতে চেয়েছি। বাঙলার ইতিহাস পড়তে গিয়ে যে প্রশ্নগুলো এ প্রসংগে স্বাভাবিকভাবেই মনে এসেছে সেগুলিই সবার সামনে তুলে ধরতে চেয়েছি। এগুলিকে ইংগিত ছাড়া অন্য কিছু মনে করা ভুল হবে। অন্য কিছু মনে করলে সমস্ত বক্তব্যই হবে অপর্যাপ্ত তথ্যের অনুপস্থিতিতে সামান্যীকরণের দোষে দুষ্ট। একদিকে পুরানো সমাজ ভেঙ্গে পড়েছে—সমস্ত সমাজ সংক্ষুব্ধ। গোটা সমাজ জুড়ে এক অরাজক অবস্থা—আর এই অবস্থায় সবাই সহযানী প্রভৃতি মতবাদের প্রসার—এ দুয়ের মাঝে কোন কার্যকারণ সম্পর্ক আছে কিনা তা-খুঁজে বের করা দরকার। এই মতবাদগুলি যে সাধারণ মানুষের সম্পত্তি সে ব্যাপারে আমরা জানি। কাজেই এ ব্যাপারে বিশেষভাবে চিন্তা-ভাবনার প্রয়োজন আছে বৈকি।

পাল ও সেন আমল থেকে একদিকে যেমন সমাজ ক্রমে কৃষিনির্ভর হয়ে পড়েছে, ঠিক তেমনিভাবে এ সময় থেকে প্রসার-লাভ করেছে ব্রাহ্মণ্য ধর্ম। সামন্তবাদ এ সময় জেঁকে বসেছে। আর তার অনুসংগরূপে সমাজে ক্ষমতা বাড়ছে কুলশ্রেষ্ঠ ব্রাহ্মণদের। রাজা রাজপুরুষরা তাঁদের জমি দান করছেন। তাঁরা শুধু জমিরই যে অধিকারী হচ্ছেন তা নয় অনেকেই ভূম্যাধিকারী হয়ে বসেছেন এ সময়। এই ভূম্যাধিকারীরা নিজে চাষ করতেন এমন নয়। শ্রেণীবিন্যাসের অধ্যায়ে আমরা তা দেখেছি। আর এই নূতন ভূম্যাধিকারীদের সাথে রাষ্ট্রের সম্পর্কও কিরূপ ঘনিষ্ঠ সে ব্যাপারেও আলোচনা এর আগেই উত্থাপিত হয়েছে।

ব্রাহ্মণ্য ধর্ম যখন সমাজের উপরতলা থেকে চাপিয়ে দেবার চেষ্টা হচ্ছে সে সময় বাঙলার লোকায়ত পর্যায়ে বৌদ্ধ ধর্মের নানা শাখা প্রভাব বিস্তার করেছিলো। এদের মধ্যে নাথ ধর্ম অবধূতদের ধর্ম প্রভৃতির কথা উল্লেখ করা যায়। এছাড়াও ছিলেন বাঙলার বাউলরা। বাঙলার

www.pathagar.com

গ্রামে গ্রামে আজও তাঁরা বিদ্যমান। এরা সমাজের উচ্চ কোটির লোকদের ঐশ্বর্যকে যে খুব একটা সম্ভ্রমের চোখে দেখতেন না এটা অনুমান করা কঠিন নয়। সহজযানীদের দোঁহা এখানে উদ্ধৃত করছি। এতে যোগী সন্ন্যাসীদের সম্পর্কে অবজ্ঞা প্রকাশ করা হয়েছে। দোঁহাটি সরহপাদের—।

আহরি এঁচি উচ্ছঁলিত বহারে।
সীমসু বাহিঅ এ জড়ভারেঁ ॥
ঘরহী রইসী দীবা জ্বালী।
কোনহিঁ বইসী ঘণ্টা চালী ॥
অকখি নিবেসী আসল বন্দী।
করেহিঁ খুসখুসাট জল ধন্দী ॥

অর্থ, যোগীরা ছাট মনে দেহে, শিরে বহন করে জটাভার। ঘরে বসিয়া দীপ জ্বালে, কোণে বসিয়া ঘণ্টা চালে। চোখ বুঝিয়া আসন বাঁধে, আর কান খুস্‌খুস্‌ করিয়া জনসাধারণকে ধাঁধা লাগায়।

অপরদিকে ব্রাহ্মণ্য ধর্মের নায়কদেরও এঁদের সম্পর্কে ধারণা যে খুব ভাল ছিল তা নয়। লোকায়ত পর্যায়ে প্রচলিত এসব ধর্মমতের বিরুদ্ধে ব্রাহ্মণরাও ছিলেন খড়্গহস্ত। ভবদেব ভট্ট সম্পর্কে খ্যাতি আছে যে, তিনি পাষণ্ডদের তর্ক করে নির্মূল করেছিলেন। বৌদ্ধদের একটি শাখাকে সে সময় পাষণ্ড বলা হতো।

এই যখন পারস্পরিক সম্পর্ক তখন সংঘর্ষও যে হতো সে কথা সহজেই বোঝা যায়। এর প্রমাণও বিদ্যমান। চীনা ভ্রমণ পরিব্রাজকদের বিবরণীতে শীল ভদ্রের জীবন কাহিনীতে ভারতীয় ন্যায়শাস্ত্রের ইতিহাসে এই দ্বন্দ্ব-সংঘাতের ইতিহাস ছড়িয়ে আছে। আর এই দ্বন্দ্ব-সংঘাতের পিছনে শ্রেণী-সংগ্রামের কোন ধারা সক্রিয় ছিল কিনা তা ভেবে দেখার মতো। বৌদ্ধধর্মের যে সব রকম-ফেরের কথা উল্লেখ করা হলো তার অনুসারী ছিলেন প্রধানতঃ সমাজের নিম্নবিত্ত ও নিম্নবর্ণের লোকেরা। তাদের সাথে উচ্চবিত্তের সংঘাত তো স্বাভাবিক।

পাল আমলের শেষের দিকে কৈবর্ত নায়ক দিব্যোকের নেতৃত্বে কৈবর্ত বিদ্রোহ এ সময়ের একটি উল্লেখযোগ্য ঘটনা। দিব্যোক নিজে পাল সাম্রাজ্যের অন্যতম রাজপুরুষ ছিলেন। তাঁর নিজের অবস্থান ছিল সমা-

www.pathagar.com

জের উচ্চকোটিতে। কিন্তু কৈবর্তদের অবস্থান সমাজের খুব উঁচুতে ছিল না। প্রতিষ্ঠিত রাজত্বের বিরুদ্ধে সমাজের এই অপেক্ষাকৃত নীচুতলার মানুষগুলির বিদ্রোহ ও তাদের সাফল্য সেদিক থেকে উল্লেখযোগ্য। এটা ঠিকই কোন বিকল্প ব্যবস্থার অগ্রনায়ক হিসাবে দিব্যোক বিদ্রোহের নেতৃত্ব দেননি। পাল সম্রাটকে পরাভূত করে দিব্যোকও পরে ভীম গৌড়ের সিংহাসন অধিকার করেছিলেন। সমাজ ব্যবস্থার দিক থেকেও কোন পরিবর্তন তখন সাধিত হয়নি। তখন তা সম্ভবও ছিল না। পরবর্তীকালে মোঘল যুগে সামন্তবাদের কাঠামোর মাঝেও কিছুটা পরিবর্তনের যে লক্ষণ আমরা দেখতে পাই সেটাও তখন সম্ভব ছিল না। কিন্তু তবু সমাজের নীচুতলার মানুষগুলো সময় সময় অনাচার-অত্যাচারের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করতো। সমাজের উঁচুতলার লোকেরা এই জাতীয় বিদ্রোহকে যে মোটেই সুনজরে দেখতো না তা দিব্যোকের বিদ্রোহ প্রসংগে সন্ধ্যাকর নন্দীর উক্তি থেকে বোঝা যায়। সন্ধ্যাকর নন্দী দিব্যোককে দস্যু ও 'উপধিব্রতী' আখ্যায় আখ্যায়িত করেছেন। দিব্যোকের পরে ভীম কৈবর্তদের নায়কত্ব গ্রহণ করেন এবং গৌড়ের সিংহাসনে আসীন হন। পাল বংশের রাম পাল সমস্ত সামন্ত নৃপতিদের একত্র করে ভীমের বিরুদ্ধে অভিযান পরিচালনা করেন এবং ভীম সপরিবারে বন্দী ও নিহত হন। পুনরায় পাল সম্রাট হৃতরাজ্য পুনরুদ্ধার করেন।

তুর্কী অধিকারের আগে বাঙলার সামন্ত সমাজে অবক্ষয়ের চিহ্নসমূহ ক্রমেই পরিষ্কার হয়ে উঠতে থাকে। সমাজের শ্রেণীসংগ্রামের স্থান সেকালে সাহিত্যেও আমরা দেখতে পাই। তৎকালীন বাঙলার নিপীড়িত মানুষের উষ্ণ দীর্ঘশ্বাস আজও সে কালের সাহিত্যের দু'একটি নিদর্শন থেকে আমাদের গায়ে এসে লাগে। আমরা চমকিত হই। অবাক হয়ে ভাবতে হয় তাহলে সে কালেও এমনিধারা কবিতা লেখা হতো। নীচের উদ্ধৃতিটি তেমনি এক চমক লাগানো কবিতা।

"নিরানন্দে তার দেহ সমুন্নত ও শীর্ণ, পরিধানে জীর্ণ বস্ত্র, ক্ষুধায় চোখ ও পেট বসে গিয়েছে শিশুদের, তারা ব্যাকুল হয়ে খাবার চাটছে। দীন-দরিদ্র গৃহিণী চোখের জলে গাল ভাসিয়ে প্রার্থনা করছে যেন এক মণ তণ্ডুলে একশ দিন চলে যায়।"

[প্রাচীন বাঙলা ও বাঙালী—সুকুমার সেন হইতে উদ্ধৃত

www.pathagar.com

প্রকৃত শৈবালের আর একটি কবিতার দুটি পংক্তি এখানে উদ্ধৃত করছি। পংক্তি দুটি শিব গৃহিণী পার্বতীর গার্হস্থ্য জীবনের চিত্র। কিন্তু তার ভিতর দিয়ে বস্তুতঃপক্ষে তৎকালীন নিম্নবিত্ত সংসারের দুঃখ-বেদনাই ফুটে উঠেছে। পংক্তি দুটি নিম্নরূপ ঃ—

ছয়মুণ্ডধারী বালক পুত্র আমার ছয় মুখে খায়, আর আমি এক উপায়-হীনা নারী।

আমার ভিখারী স্বামী অহর্নিশ কেবল বিষ খায়, কি গতি হইবে আমার।

পাঁহাড়পুর আর ময়নামতীর মৃৎফলকগুলিতে তৎকালীন বাঙলার লোকায়ত জীবনের যে চিত্র আমরা দেখতে পাই তার ভিতরেও সে সময়কার সাধারণ মানুষের জীবন পরিস্ফুট হয়ে ওঠে। এই মৃৎফলকগুলি বাঙলার একান্ত নিজস্ব। শিল্পীরা ছিলেন গ্রাম বাঙলার অধিবাসী। বাঙলার লৌকিক জীবনই ছিল তাঁদের শিল্পচর্চার উপজীব্য। এই মৃৎফলকগুলিতে অস্থি-চর্মসার ভিক্ষুকের চিত্র আজকের দিনের ভিক্ষুকের কথা মনে করিয়ে দেয়। পাশাপাশি নাগরিক সমৃদ্ধির চিত্রও আমাদের সামনে ফুটে ওঠে পাহাড়পুরের মন্দিরগাত্রের নিদর্শন থেকে।

আর সামাজিক অবস্থানের বৈপরীত্য যেখানে এত বেশী সেখানে শ্রেণী-সংগ্রামের ধারা যে নিয়ত সক্রিয় ছিল সে কথা অনুমান করতে অসুবিধা হয় না। কিন্তু আবার বলি এই বিষয়টি আজও অজ্ঞাত। বাঙলার ইতি-হাস পুনর্গঠনের প্রশ্নটি অত্যন্ত জরুরী। এটি আজ সমাধানের দাবীদার। আর এই দাবী মেটাতে হলে শ্রেণীসংগ্রামের ধারাটি, তার রূপটি বের করে আনতেই হবে।

তুর্কী অধিকারের আগে বাঙলার সমাজ জীবনে অবক্ষয়ের চিহ্নসমূহ আরও পরিস্ফুট হয়ে উঠতে শুরু করে। কিন্তু শ্রেণীসংগ্রাম দানা বেঁধে উঠার আগেই বাইরের শক্তির অভিঘাত ভেঙে পড়ে তৎকালীন সামন্ত রাজ্যের কাঠামো। পুরানো রাজ্যের ভিতের উপর গড়ে উঠে নতুন সামন্ত রাজ্য। সামন্ত ব্যবস্থার পরিবর্তন হয় না। মধ্যযুগের এক পর্যায়ে তাতে পরিবর্তন কিছুটা সাধিত হয় ঠিকই, কিন্তু মূল অনড় কাঠামো অব্যাহতই থেকে যায়। বাঙলার ইতিহাস নতুন খাতে প্রবাহিত হয়। সে আরেক অধ্যায়।

www.pathagar.com

এগারো

গ্রাম-নগর ও জন-জীবন

আজও যেমন, প্রাচীনকালে তো বটেই—বাঙলাদেশ চিরকালই কৃষি-প্রধান। প্রাচীনকালে এই গ্রামকে কেন্দ্র করেই গড়ে উঠেছিল কৃষি-নির্ভর সমাজ ও সভ্যতা। সমাজ ছিল কৃষি-নির্ভর। গ্রামগুলিও ছিল ছোট ছোট। চারপাশে চাষের ক্ষেত, মাঝে গ্রাম ; কাছাকাছি লাগোয়া অনেক-গুলি বাড়ী। চাষ-বাসই যাদের প্রধান উপজীবিকা তাদের বস্তিতে বাড়ী-গুলি সাধারণতঃ এরকম গায়ে গায়ে লাগানোই হয়। পশুপালক সমাজে হয় উল্টা। পশুপালন ক্ষেত্র দূরে দূরে ছড়ানো থাকে বলে বস্তিও থাকে ছড়ানো পরস্পর-বিচ্ছিন্ন।

ছোট ছোট গ্রামে সাধারণতঃ পাড়া থাকতো একটিই। তাই বলে বড় গ্রামের যে অস্তিত্ব ছিল না, তা নয়। এইসব গ্রামে থাকতো একাধিক পাড়া বা পাটক। সাধারণতঃ একই বৃত্তিতে নিযুক্ত লোকদের নিয়ে গড়ে উঠতো এক একটি পাড়া। কয়েকটি পাড়া নিয়ে থাকতো একটি গ্রাম। পাড়া ও গ্রামের এই গড়ন চলে আসছে অতি প্রাচীনকাল থেকে—একেবারে কৌম সমাজের আমল থেকে।

গ্রামগুলি ছিল স্বয়ংসম্পূর্ণ। প্রয়োজনও ছিল কম। সরল কৃষিনির্ভর সমাজের যেটুকু প্রয়োজন তা গ্রামেই উৎপাদিত হতো। কোনো গ্রাম থেকে বাড়তি উৎপন্ন দ্রব্য যে শহরে বিক্রির জন্যে না যেত তা নয়। শিল্পজাত দ্রব্যও পণ্য হিসেবে বাজারে বেচা-কেনা হত, রপ্তানি হত। তবে মোট উৎপাদনের তুলনায় তার পরিমাণ খুব বেশী ছিল না। সাধারণতঃ গ্রামের যা প্রয়োজন তা গ্রামের শিল্পীরাই তৈরী করতো। হাল আর বলদ আখ মাড়াই যন্ত্র, চরকা আর তাঁত সাধারণত এই ছিল প্রধান উৎপাদন যন্ত্র। যে সময় থেকে বাঙলাদেশের ইতিবৃত্ত মোটামুটি জানা যায়—অর্থাৎ খ্রীস্টীয় চতুর্থ-পঞ্চম শতক থেকে—সে সময় থেকে একেবারে ইংরেজ শাসন দৃঢ়মূল হওয়া পর্যন্ত, এই দীর্ঘ সময়ের মধ্যে গ্রাম্য উৎপাদন যন্ত্র ও উৎপাদন পদ্ধ-তির কোন পরিবর্তনই হয়নি। হাজার বছর আগে যে যন্ত্রের সাহায্যে

www.pathagar.com

উৎপাদন হতো, হাজার বছর পরেও তা একই রয়ে গেছে। আর এ সব কারণেই খ্রীস্টীয় চতুর্থ-পঞ্চম শতক থেকে অষ্টাদশ-উনবিংশ শতাব্দীর গোড়ার দিক পর্যন্ত ভূমিনির্ভর কৃষক সমাজের সাথে শ্রেণীবিভাগও অপরিবর্তিত থেকে গিয়েছে। গ্রামের আকৃতি-প্রকৃতিরও তেমন পরিবর্তন হয়নি। একই ধাঁচের থেকেছে।

বাড়ীর পিছনে-পাশে বাঁশ ঝাড়, আম, জাম, সুপারী নারিকেল, মহুয়া প্রভৃতি ফলের গাছ, সামনে চলাচলের রাস্তা। গাঁয়ের মাঝেই বসত বাড়ীর পাশাপাশি পানের বরজ, পুকুর, নালা-নর্দমা, মাঝে দু'একটা পতিত বাস্তুক্ষেত্র। পাড়া ছাড়িয়ে চাষের ক্ষেত। আল দিয়ে টুকরো টুকরো করে আলাদা করা। কোন কোন জায়গায় মাঠের মাঝে, তা না হলে এক পাশে গোবাট বা গোচর-ভূমি। প্রায় জায়গায়ই মাঠের পাশে বা কাছাকাছি দেখা যেত ছোট-বড় খাল। চাষের জন্য প্রয়োজনীয় জল নেওয়া হত সেখান থেকে। জল নিকাশও হত সে পথে। জলাভূমি হলে এ ছাড়াও থাকতো জল নিরোধের ছোট ছোট বাঁধ—আবুল ফজলের ভাষায় আল। সাধারণতঃ গ্রামগুলি গড়ে উঠতো খাল বা নদীর পাশে পাশে। এ অবস্থায় পারাপারের জন্যে থাকতো খেয়াঘাট। তাছাড়া ছিল উপাসনালয়, মন্দির বা বৌদ্ধ বিহার। আরও পরে মসজিদ। সাধারণতঃ এই ছিল গ্রামের চেহারা। গ্রামে যারা বাস করতো, তাদের মাঝে ছিল ক্ষেত্রকর বা কর্ষকেরা, ভূমিহীন কৃষি-শ্রমিকের তা ছাড়াও ছিল মহত্তর, কুটুম্ব প্রভৃতি ছোট ছোট ভূস্বামীর দল। পূজাআর্চা প্রভৃতির জন্যে ছিল ব্রাহ্মণেরা। গ্রামের প্রয়োজন মেটানোর জন্যে কর্মকার, কাংস্যকার, তৈলকার, সূত্রধর প্রভৃতি শিল্পী ছিল। আরও ছিল অন্ত্যজ, কোন কোন গ্রামে আদিবাসী পর্যায়ের লোকজন। তাছাড়া ছিল ডোম, রজক, নাপিত, চন্ডাল, চর্মকার প্রভৃতি সমাজ সেবক এবং ধীবর, শৌণ্ডিক প্রভৃতি ছোট ছোট ব্যবসায়ীর দল। অন্ত্যজরা গ্রামের এক প্রান্তে বাস করতো। অন্য পাড়ায় বাস করার অধিকার ছিল না তাদের।

সাধারণতঃ গ্রামগুলি, এমন কি যেগুলি একাধিক পাড়া সমবায়ে গড়ে উঠতো, সেগুলিও খুব বড় হতো না। কোন কোন গ্রাম অবশ্য বড় হতো—তবে তাদের সংখ্যা ছিল কম। গুরুত্বপূর্ণ ব্যবসা-বাণিজ্যের রাস্তার উপর হলে অনেক সময় গড়ে উঠতো ছোট-বড় গঞ্জ—কোন কোন গ্রামে প্রতিষ্ঠিত

www.pathagar.com

হতো শাসনকেন্দ্র। এসব কারণে সেসব গ্রাম বেশ বড়সড় হয়ে উঠতো। তবে তা ছিল নিয়মের ব্যতিক্রম।

সেকালে ছোট-বড় সব শহরই ছিল প্রাকারবেষ্টিত। প্রাকারের পাশ দিয়ে ছিল পরিখা। উত্তর-দক্ষিণে ও পূর্বে-পশ্চিমে প্রসারিত টানা-চওড়া রাস্তায় সাধারণতঃ চারভাগে বিভক্ত হতো গোটা শহরটা। প্রায়ই শহরগুলি গড়ে উঠতো নদীর তীরে তীরে। শহর থেকে বেরিয়ে নদীর ঘাটে অথবা আশেপাশের গ্রামে যাওয়ার জন্যে নগর-প্রাকারের চারপাশে থাকতো একাধিক নগরদ্বার। পরিখার উপর থাকতো সেতু। গ্রাম থেকে অথবা দূর-দূরান্ত থেকে রাজপথ এসে মিশতো শহরের সাথে। পরিখা পেরিয়ে শহরে ঢুকতে হতো।

সাধরণতঃ পরিখার ওপারে, শহরের লাগোয়া বাইরে বসবাস করতো অন্ত্যজেরা, সমাজ-শ্রমিক ও সমাজ-সেবকের দল। কোন কোন সময় প্রাচীরের বাইরে গড়ে উঠতো মন্দির বা বৌদ্ধ-বিহার।

ভিতরে উঁচু জায়গায় থাকতো রাজপ্রাসাদ বা রাজপুরুষের বাসস্থান। তার পরেই বিভিন্ন দপ্তরের আপিস। রাজপথের দু' পাশে বড় বড় দালান, দোকান-পাট। এ ছাড়া বিভিন্ন জায়গায় জলাশয়, বাগান, মন্দির, বিহার, হাট-বাজার প্রভৃতি। মোটামুটি এই ছিল শহরের চেহারা।

রাজা ও রাজপুরুষরা ছাড়া শ্রেষ্ঠী, সার্থবাহ, কুলিক প্রভৃতি ব্যবসায়ী শিল্পীরাই ছিলেন শহরবাসী। ব্রাহ্মণ ও অন্যান্য জ্ঞানজীবী বা ধর্মজীবীরাও শহরে থাকতেন। আরও থাকতেন কর্মকার, কাংস্যকার, শঙ্খকার প্রভৃতি শিল্পীরা। সুবর্ণবণিক, গন্ধবণিক, অট্টালিকাকার প্রভৃতি শিল্পীরা ছিলেন একান্তভাবেই শহরবাসী। রজক, নাপিত, সেবকদের ও সমাজসেবীদের অনেকেই শহরে বাস করতেন। ডোম-চণ্ডালরা বেশীর ভাগ ক্ষেত্রে নগরের বাইরে বাস করতেন। মোটামুটি এই ছিল শহরের গড়ন। গ্রামের মতই প্রাচীনকাল থেকে আধুনিক যুগ পর্যন্ত শহরের গড়নেও তেমন কোন পরিবর্তন হয় নি। এখানেও সাধারণতঃ একই বৃত্তিধারীরা একই মহল্লায় বসবাস করতেন। মধ্যযুগে রচিত হলেও মুকুন্দরামের চণ্ডীমঙ্গল থেকে সেকালের শহরের গড়ন সম্পর্কে ধারণা করা যায়।

প্রাচীন বাঙলা কৃষিনির্ভর হলেও শাসনকেন্দ্র, বন্দর, ধর্মস্থান প্রভৃতির প্রেরণায় অনেকগুলি বড় বড় শহর গড়ে উঠেছিল। পুণ্ড্রবর্ধনের খ্যাতি

www.pathagar.com

ছিল গোটা ভারতবর্ষব্যাপী। তা ছাড়াও ছিল কোটিবর্ষ, তাম্রলিপ্ত, অপেক্ষাকৃত পরবর্তীকালে গৌড়, কর্ণসুবর্ণ, বিক্রমপুর, রামাবতী, রামপাল প্রভৃতি নগর। ত্রিবেণী ও সোমপুরের মত নগর গড়ে উঠেছিল ধর্ম ও সংস্কৃতির প্রেরণায়। একটা সময় খ্রীস্টীয় চতুর্থ-পঞ্চম-ষষ্ঠ শতকে ব্যবসায়-বাণিজ্যের প্রসার হওয়ায় শহরগুলিও বেশ জমজমাট হয়ে উঠেছিল। পরবর্তীকালে রাজ্য শাসনকেন্দ্র বা রাজধানী ছাড়া তেমন জমজমাট নগরীর বড় বেশী সাক্ষাৎ মেলে না।

জন-জীবন

বাঙলার অসংখ্য গ্রাম আর নগরে সেকালে যে জন-জীবন স্পন্দিত হ'ত এবার সে সম্পর্কে দু'চারটি কথা।

প্রাচীন বাঙলা তথা বাঙালী জীবনের অন্যান্য দিকের মতো এ ক্ষেত্রেও তথ্য নেহাতই অপ্রতুল। দৈনন্দিন জীবনাচার, খাওয়া-পরা, খেলাধুলা, সৌন্দর্য-চর্চা প্রভৃতি সংস্কৃতির বিশিষ্ট অংগ। সংস্কৃতির অন্যান্য বিভাগের মতোই তা জাতীয় বৈশিষ্ট্যের সাক্ষ্য বহন করে। একেবারে আদিকাল থেকে লোকায়ত জীবনের যে ধারা প্রবাহিত তার নিত্যনৈমিত্তিক জীবনাচারের রূপ, সে রূপের ক্রমপরিবর্তনের ইতিহাস আজও অনাবিষ্কৃত। বিভিন্ন সূত্রে যেটুকু জানা গেছে তা হ'লো টুকরো টুকরো তথ্য। আজ পর্যন্ত ঐতিহাসিকেরা এই তথ্যগুলিই একত্র করে পরিবেশন করে প্রাচীন বাঙলার দৈনন্দিন জীবন সম্পর্কে আভাস দিতে চেয়েছেন। এর বাইরে কোন কিছু বলা আজও অসম্ভব।

একেবারে আদি কালে বাঙলাদেশে অষ্ট্রিক-দ্রাবিড় ভাষাভাষী কৌমগুলি বাস করতো। পরে এলো মঙ্গোলরা। তারও পরে এল আর্য ভাষাভাষীর দল। প্রাচীন বাঙলার দৈনন্দিন জীবন এই কৌমগুলির জীবনাচারের বিভিন্ন উপাদান সমবায়ে গঠিত। ঠিক সবগুলির যোগফল নয়, তবে প্রাত্যহিক জীবনাচারের মধ্যে এই কৌমগুলির দৈনন্দিন জীবন চর্চার বহু উপাদান আজ পর্যন্ত বিদ্যমান। আমাদের ব্যবহারিক ও সাংস্কৃতিক মূল নিহিত অষ্ট্রিক ও দ্রাবিড় ভাষাভাষী কৌমগুলির কৌম-জীবনের মধ্যে।

জন-জীবনের একেবারে গোড়াতেই লোক-প্রকৃতির পরিচয়। এ বিষয়ে সাধারণভাবে সবার পক্ষে প্রযোজ্য কোন কথা বলা খুবই কঠিন। চীন

www.pathagar.com

পরিব্রাজক হিউ এনথ্-সাঙ তাঁর ভ্রমণ বৃত্তান্তে কিছু মন্তব্য করে গেছেন। বাঙলাদেশের বিভিন্ন অঞ্চলে ঘুরেছিলেন তিনি। নানা জায়গা দেখে-শুনে তিনি বলেছেন : সমতটের লোকেরা পরিশ্রমী। তাম্রলিপ্তির লোকেরা সাহসী ও পরিশ্রমী—দুইই। ব্যবহারের দিক থেকে কর্ণসুবর্ণের লোকেরা সৎ ও অনমনীয়, মানিয়ে চলতে পারে। তাম্রলিপ্তির লোকেরা চটপটে ও ব্যস্তবাগীশ। পুণ্ড্রবর্ধন, সমতট ও কর্ণসুবর্ণের লোকেরা ছিল বিদ্যোৎ-সাহী। তাদের মাঝে জ্ঞান চর্চার আগ্রহ ছিল এবং চর্চাও ছিল ব্যাপক। বাঙালীর জ্ঞান চর্চা সম্পর্কে আরও একজন চীনা পরিব্রাজক ইৎ-সিঙও বার বার উল্লেখ করে গেছেন। এজন্যে বাঙালী বিদ্যার্থীরা সুদূর কাশ্মীরে যেতেও দ্বিধাবোধ করতেন না। কিন্তু তাঁদের মেজাজটা মোটেই ভাল ছিল না। কাশ্মিরী কবি ক্ষেমেন্দ্র তাঁর দশোপদেশ গ্রন্থে সে কথাটাই বলে-ছেন। গৌড়ের বিদ্যার্থীদের সম্পর্কে বলতে গিয়ে তিনি বলেছেন : রোগা লিকলিকে চেহারা, হাড় ক'খানা গোনা যায়। তিরিক্ষি মেজাজ, চোয়াড়ে স্বভাব। একটু ধাক্কা লাগলে পাছে মট করে ভেঙ্গে যায়, সেই ভয়ে সবাই দূরে দূরে থাকে। প্রবাসে এসে কাশ্মীরের জল হাওয়ায় কিছু দিনের মধ্যেই তাদের চেহারা ফিরে যায়। হাড়ে মাংস লাগে, গায়ে জোর বাড়ে। 'ওঙ্কার' ও 'স্বস্তি' উচ্চারণ করতে গিয়ে যদিও তাদের দাঁত ভেঙ্গে যায়, তবু তাদের পাতঞ্জল ভাষ্য, তর্ক, মীমাংসা সবই পড়া চাই। গজেন্দ্র গমনে রাস্তায় হাঁটে, থেকে থেকে তাদের দর্পিত মাথাটা একবার এদিকে একবার ওদিক হেলতে-দুলতে থাকে। যখন তারা রাস্তা দিয়ে হেঁটে চলে, তাদের ময়ূরপঙ্খী জুতোর মচমচ আওয়াজ ওঠে। মাঝে মাঝে তারা চলতে চলতে নিজেদের সাজ পোশাকের ব্যবহারটা পরখ করে নেয়। তাদের সরু কোমরে ঝোলে লাল কটিবন্ধ। তাদের কাছ থেকে পয়সা বাগাবার জন্যে ভিক্ষুক আর অন্যান্য পরাশ্রয়ী লোকেরা নানাভাবে তাদের খোশামোদ করে আর ছড়া বাঁধে। কালো রং আর সাদা দাঁতের পাটিতে তাদের দেখায় যেন বানরটি। তাদের দু'কানে তিন তিনটি করে সোনার মাকড়ি, হাতে ছড়ি—দেখে মনে হয় সাক্ষাৎ কুবের। সামান্যমাত্র অজুহাতেই তারা রেগে আগুন হয়। মামুলি ঝগড়া-ঝাঁটিতে ক্ষেপে গিয়ে ছুরি দিয়ে সহ-আবাসি-কের পেট চিরে দিতেও তাদের বাধে না। কম দাম দিয়ে বেশী জিনিস দাবী করে দোকানদারদের উস্তম ফুস্তম করে। সেকালে বাঙলার বাইরে

www.pathagar.com

বাঙালীর প্রতি যে বিরাগ বিদ্যমান ছিল, কাশ্মিরী কবি ক্ষেমেন্দ্রের রচনায় হয়তো তার প্রভাব পড়েছে। তবে গৌড়ের অধিবাসীরা যে ঝগড়াটে ছিল এ কথাটা বিজ্ঞানেশ্বরও জোর দিয়েই বলে গেছেন।

ভেতো বাঙালী

হাঁড়িতে ভাত না থাকলে বাঙালী কাহিল। এর চেয়ে বড় দুঃখ বাঙালী জীবনে বোধ হয় আর নেই। ভাত না খেলে বাঙালীর পেটই যেন ভরতে চায় না। ভাত আপামর বাঙালীর প্রধান ভোজ্য বস্তু। এতে অবাক হবার কিছুই নেই। একেবারে আদিকাল থেকেই ধান এ দেশের প্রধান উৎপন্ন দ্রব্য। কৃষির সূচনা থেকে ধরলে প্রথমও বটে। অষ্ট্রিক ভাষাভাষী আদি অস্ট্রেলীয়রা এ দেশে প্রথম ধান উৎপাদন করে। বাঙালীর ভাত খাবার অভ্যাসও তাদেরই দান। প্রাকৃত পৈঙ্গল গ্রন্থে দেখা যায় ঘি সহযোগে গরম ধূমায়িত ভাত ছিল প্রাকৃত বাঙালীর আহার্য। বিয়ে বাড়ীতে বা অন্যান্য সামাজিক অনুষ্ঠানেও ভাত পরিবেশন করা হতো।

শাক-পাতা, তরি-তরকারি ও মাছ-মাংস—সাধারণতঃ এই ছিল প্রাচীন বাঙলীর খাদ্য। ডালের উল্লেখ খাদ্য তালিকায় দেখা যায় না। মনে হয় প্রাচীন কালে বাঙলাদেশে ডালের ব্যবহার অপ্রচলিত ছিল। প্রাচীন উৎপন্ন দ্রব্যের তালিকাতেও তা দেখা যায় না। দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়া ও প্রশান্ত মহাসাগরীয় দেশগুলিতে আজও ডালের ব্যবহার খুবই কম। মনে হয়, বাঙলাদেশেও পরবর্তীকালে তা প্রচলিত হয়েছে। আজও সমাজের নীচের দিকে ডালের ব্যবহার খুবই কম।

তরকারির ভিতর বেগুন, লাউ, কুমড়ো, ঝিঙে, কাঁকরোল, কচু প্রভৃতি আদি অস্ট্রেলীয় জনগোষ্ঠীর দান। খাদ্য তালিকা ও উৎপন্ন দ্রব্যের তালিকায় অন্যান্য তরকারি স্থান পেয়েছে আরও পরে—বিভিন্ন জনগোষ্ঠীর সংস্পর্শে। যেমন পর্তুগীজরা এদেশে প্রথম আলুর ব্যবহার চালু করে। এদেশে আরও বহু তরকারির প্রচলন করেছে এরা। নানা জাতের শাক খাওয়ার রীতিও বেশ প্রাচীন। প্রাকৃত পৈঙ্গলে নালিতা শাকের উল্লেখ পাওয়া যায়।

বাঙলাদেশে একটা সময় বৌদ্ধ ও জৈন্য ধর্ম, পরবর্তীকালে ব্রাহ্মণ্য ধর্মের প্রভাবে মাছ-মাংস খাওয়া সমর্থন করা চলে না, এ রকম একটা ভাব

www.pathagar.com

মাথা তুলতে চাইছিলো। উত্তর ভারতের অন্যান্য প্রদেশের হিন্দুদের মাঝে মাছ-মাংস খাওয়া তো এই কিছু দিন আগেও ছিল নিন্দনীয় ব্যাপার। এজন্যে বাঙালী হিন্দুদের খানিকটা ঘৃণার চোখে দেখত তারা। সে কালেও নিশ্চয়ই একই মনোভাব প্রবল হয়ে উঠেছিল। কিন্তু কোন কিছুই বাঙালীকে মাছ-মাংস খাওয়া ছাড়াতে পারে নি। সেজন্যে ভবদেব ভট্টের ন্যায় স্মৃতিকারদেরও নানা যুক্তি-তর্ক সাক্ষ্য প্রমাণ উপস্থিত করে এটা সমর্থন করতে হয়েছে।

একে তো অসংখ্য নদ-নদী, খাল-বিলে মাছ পাওয়া যায় প্রচুর। তার উপর আদি অস্ট্রেলীয়রা ছিল খুব সম্ভবতঃ (নেগ্রিটোদের কথা ভালভাবে জানা যায় না—তাই অস্পষ্টতা) বাঙলাদেশের আদি অধিবাসী এবং মাছ ছিল তাদের প্রিয় খাদ্য। চীন, জাপান, ব্রাহ্মদেশ, দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়া ও প্রশান্ত মহাসাগরীয় দ্বীপপুঞ্জের লোকেরাও মাছ খেতে ভালবাসে। মাছ তাদের প্রিয় খাদ্য। এই হিসাবে বাঙলাদেশ কোন সভ্যতা ও সংস্কৃতির অন্তর্ভুক্ত তা জানা যায়। আজকাল যে সব মাছ চালু প্রাচীন কালেও প্রায় সে-সবই খাওয়া হতো। রুই, শোল, পুঁটিমাছ ও অন্যান্য আঁশযুক্ত সাদা রঙের মাছ ছিল সমাজের উচ্চবর্ণের বিশেষতঃ ব্রাহ্মণদের ভক্ষ্য। তারা সাধারণতঃ এ ছাড়া আর অন্য কোন মাছ খেত না। নিম্নবর্ণের লোকেরা সবই খেত। বান মাছ, যেসব মাছ সাধারণতঃ কাদার মধ্যে গর্ত করে বাস করে, আঁশ ছাড়া, সাপের মত দেখতে—সেসব ছিল ব্রাহ্মণ প্রমুখ উচ্চবর্ণের অভক্ষ্য। সে সবই নিম্নবর্ণের লোকদের মাঝে চালু ছিল। ইলিশ মাছ ছিল সর্বজনপ্রিয়। ইলিশের তেল ব্যবহৃত হতো নানা প্রয়োজনে। শুঁটকী মাছ বা সিহুলি ছিল বঙ্গাল দেশবাসীর প্রিয়। পাহাড়পুর ও ময়নামতিতে প্রাপ্ত পোড়ামাটির ফলকগুলির কয়েকটিতেই মাছ কোটা ও চুপড়ীতে করে মাছ হাটে নিয়ে যাবার দৃশ্য উৎকীর্ণ। এ থেকেও সেকালে বাঙালীর মৎস্যপ্রীতির ব্যাপারটি বোঝা যায়।

মাছের মত এতটা না হলেও মাংসের প্রতিও বাঙালী ছিল অনুরক্ত। হরিণের মাংস সমাজের সর্বস্তরেই আদৃত হতো। চর্যাগীতিতে হরিণ শিকার সম্পর্কে উল্লেখ আছে একাধিক জায়গায়। পাহাড়পুরে প্রাপ্ত ফলকেও দেখা যায়, শিকারের পর শবর পুরুষ হরিণ কাঁধে ফেলে বাড়ী যাচ্ছে। বস্তুতঃপক্ষে শবর, পুলিন্দ, নিষাদ জাতীয় ব্যাধদের প্রধান বৃত্তিই

www.pathagar.com

ছিল হরিণ শিকার। ছাগমাংস সমাজের সর্বস্তরেই প্রচলিত ছিল। উচ্চ-বর্ণের মাঝে না হলেও শামুক, কাঁকড়া, মোরগ, সারস, বক, হাঁস, দাতুহ পাখী, উট, গরু, শুয়োর প্রভৃতির মাংস নিম্নবর্ণের লোকদের মাঝে প্রচলিত। বাঙলাদেশে আজকাল উট দেখা না গেলেও পাহাড়পুরের মৃৎফলকগুলির একটিতে একটি উটের প্রতিকৃতি পাওয়া গেছে। মাংস দিয়ে সেকালেই বাঙালী নানা ধরনের খাবার তৈরী করতো। শিক কাবাব জাতীয় খাবারও সেকালে প্রচলিত ছিল। সে সময় যে খাবারকে 'ভাড়িত' বলা হতো তা আধুনিক শিক কাবাব ছাড়া আর কিছুই নয়।

বাঙালীর খাদ্য তালিকায় কলা আদি-অস্ট্রেলীয় জনগোষ্ঠীর দান। কলার মতো কলাগাছের ব্যবহারও বাঙালী সমাজে নানা কারণেই ব্যাপক। বিভিন্ন সামাজিক বা আঞ্চলিক অনুষ্ঠানে তা ব্যবহৃত হয়। কলা ও কলা-গাছের সাথে আমাদের সুপ্রাচীন সম্পর্ক এ-প্রসংগে বিশেষভাবে উল্লেখ-যোগ্য। সামাজিক অনুষ্ঠানসমূহে এজন্যেই কলাগাছের এত ছড়াছড়ি। প্রাচীন বাঙলার চিত্রশিল্প ও ভাস্কর্যেও কলাগাছের চিত্র সুপ্রচুর। প্রাচীন কাল থেকে কলার মতো আখও ছিল বাঙালীর অতি আদরের জিনিস। উৎপন্ন হ'ত প্রচুর। নানাভাবে আখের রস জ্বাল দিয়ে গুড় ও চিনি তৈরী হতো এবং তা আজকের মতই সমাদৃত ছিল। আখের রস পানীয় হিসেবেও ব্যবহৃত হতো। এ ছাড়া ফলের মধ্যে তাল, আম, কাঁঠাল, নারিকেলের উল্লেখ পাওয়া যায় বার বার।

রবীন্দ্রনাথ এক জায়গায় বলেছেন : রসের সেরা বাসা রসনায়। বাঙালী যে অতি মাত্রায় রসনারসিক জাতি তা তার ভোজ্য বস্তুর তালিকা দেখলেই বোঝা যায়। রসনা পরিতৃপ্তির এমন পরিপাটি ও সূক্ষ্ম ব্যবস্থা উপমহা-দেশের আর কোথাও দেখা যায় না। বাঙালী চরিত্রের এই বৈশিষ্ট্যটিও কিন্তু নতুন নয়। প্রাচীন কাল থেকেই প্রচলিত। সামাজিক উৎসবাদিতে বিশেষতঃ উচ্চবিত্তদের ক্রিয়াকর্মে প্রচুর পরিমাণে ভাত-তরকারি রান্না হতো। ফলে ছড়িয়ে না খেলে যেন তৃপ্তি হতো না। চীনা পরিব্রাজক ইৎ-সিঙও সামাজিক ভোজে অপচয়ের কথা বলে গেছেন। এসব ক্রিয়া-কর্মে নানা ধরনের মশলা দিয়ে অনেক রকম খাদ্য তৈরী হতো। রান্নায় প্রচুর পরিমাণ মশলার ব্যবহার এ দেশের অন্যতম বৈশিষ্ট্য। মশলা দিয়ে নানা ধরনের তরিতরকারি ছাড়াও বিয়ে বা অন্যান্য সামাজিক ক্রিয়াকর্মে

www.pathagar.com

নানা ধরনের মাছ, হরিণ, ছাগ ও পাখীর মাংসের নানা তরকারি রান্না হতো। তারপরে দেওয়া হতো দই ও নানা ধরনের মিষ্টি পিঠা। পানীয় হিসেবে দেওয়া হতো কর্পূর মিশ্রিত সুগন্ধি জল। তারপর মশলাযুক্ত পান। পানের মশলা হিসেবে কর্পূর ব্যবহার হতো।

নানা ধরনের মিষ্টি ও পিঠা বাঙালীর আহার্য-তালিকার অন্যতম বৈশিষ্ট্য। আজকাল তো বাঙালী ময়রার দোকান ছাড়া ছানার মিষ্টি পাবার যো নেই। বিদ্যাপতির কথানুসারে গৌড়ের অন্যতম আকর্ষণ ছিল ঘি। ঘি, ক্ষীর, ছানা দিয়ে বাঙালী নানা ধরনের মিষ্টি তৈরী করতো। সেকালে সাধারণতঃ চল্‌তি মিষ্টির মধ্যে খাদ্য (খাজা), মোদক (মোয়া, নরম মিষ্টান্ন), লড্ডুক (নাড়ু, শক্ত মিষ্টান্ন), খণ্ড (পাটালী, নবাত জাতীয় গুড় বা চিনির শক্ত মিষ্টান্ন) পিষ্টক (পিঠা), ফাণিত (বাতাসা), কদম্ব (কদমা), দুগ্ধ শর্করা (চিনির পায়েস), খিরিস (ক্ষীরের মিষ্টান্ন), খণ্ড শালুক (তিলুয়া) প্রভৃতিই ছিল প্রধান। ঘি-দই-গুড়-আদা দিয়ে এক প্রকার খাদ্য তৈরী হতো। তাকে বলা হতো শিখরিণী। এ ছাড়াও তৈরী হতো নানা ধরনের চাটনি। এর সাধারণ নাম ছিল গুড়শিয়া।

দুধ, ডাবের জল, আখের রস, তালরস ছাড়া পানীয় হিসেবে প্রচলিত ছিল নানা রকম মদ। 'গৌড়ী-সুরা' তো এক কালে দেশের বাইরেও প্রসিদ্ধি লাভ করেছিল। তা সাধারণতঃ গুড় গাঁজিয়ে তৈরী করা হতো এ ছাড়াও মদ তৈরী হতো—ভাত, গম, মধু, আখ, তালরস থেকে। এক সময় মদ খাওয়া বেশ চালু ছিল বলে মনে হয়। অন্ততঃ আজকের মত নিন্দনীয় ছিল না। চর্যাগীতিতে বার বার 'শৌণ্ডিকালয়' সম্পর্কে উল্লেখ দেখা যায়। বর্ণ বিভাগের তালিকায় শুঁড়িদের আলাদা উল্লেখ থেকেও বোঝা যায় তাদের ব্যবসা বেশ প্রসারলাভ করেছিল। এক জাতীয় গাছের সরু বাকল বা শিকড় দিয়ে মদ ঢালাই করা হতো। বেলের খোসায় করে লোক মদ খেত। বহু গ্রামে মদের দোকান ছিল।

বসন-ভূষণ

কি মেয়ে কি পুরুষ—সবাই সাধারণতঃ এক খণ্ড কাপড় ব্যবহার করতো। এটাই ছিল প্রাচীন রীতি। সেলাই করা জামা ইত্যাদির আমদানী হয়েছে আরও পরে—মধ্য ও উত্তর-পশ্চিম ভারত থেকে। এ দেশে

www.pathagar.com

কার্পাসের চাষ এবং তা থেকে কাপড় তৈরী করার রীতির প্রচলন করেছিল অষ্ট্রিক ভাষাভাষীরা। সেলাই না করা এক খণ্ড কাপড় ব্যবহার করার রীতি আমরা উত্তরাধিকার সূত্রে তাদের কাছ থেকেই পেয়েছি। পরবর্তী-কালে সেলাই করা জামা বা অধোবাস প্রচলিত হলেও বাঙালীরা তাদের পূর্বপুরুষদের কাছ থেকে পাওয়া উত্তরাধিকারটিকে পরিত্যাগ করে নি। মেয়েদের শাড়ী এবং কোন কোন ক্ষেত্রে ধুতির ব্যবহারের মধ্যে তা আজও টিকে আছে।

পাহাড়পুর ও ময়নামতির মৃৎফলকগুলি থেকে দেখা যায়—সেকালের ধুতি আজকের মত বড় ছিল না। সাধারণতঃ হাঁটুর নীচে নামিয়ে কাপড় পরা হতো না। নাভির নীচে দুই-তিন প্যাঁচের কটিবন্ধ দিয়ে ধুতিটা আটকানো থাকতো। মেয়েদের শাড়ী পরার ঢংও আজকের মত ছিল না। কোমরে এক বা একাধিক প্যাঁচ দিয়ে অধোবাস রচনা করা হতো। কিন্তু ঊর্ধ্বাংগ থাকতো অনাবৃত। মেয়েদের ঊর্ধ্বাংগ অনাবৃত রাখার এই রীতি কিন্তু কেবল প্রাচীন বাঙলার মধ্যেই সীমাবদ্ধ ছিল না। প্রাচীন আদি অষ্ট্রেলীয়-পলিনেশীয়-মেলানেশীয় নরগোষ্ঠীর মাঝে এটাই ছিল সাধারণ নিয়ম। কিছুদিন আগেও আমাদের দেশে গারো হাজংদের মাঝেও এটাই ছিল রীতি। অবশ্য শহরে মেয়েদের মাঝে উত্তর-পশ্চিম ভারতের আদর্শে দেহের উপরার্ধ আবৃত করার জন্যে ওড়না ও চোলির ব্যবহার প্রচলিত ছিল। মাঝে মাঝে তারা আঁটো-সাঁটো, খাটো জামাও ব্যবহার করতেন। কি মেয়ে কি পুরুষ প্রায় সবাই কোন কোন ক্ষেত্রে নানা ধরনের নক্সা করা কাপড় ব্যবহার করত। এ ধরনের নক্সা করা কাপড়ের ব্যবহার চালু হয় খ্রীস্টীয় সপ্তম-অষ্টম শতক থেকে—সৌরাষ্ট্র, গুজরাট প্রভৃতি জায়গা থেকে।

বাঙালীরা কোন সময়ই কোন মস্তকাবরণ ব্যবহার করতো না। তবে তা পুষিয়ে নিত চুলের বাহার দিয়ে। পুরুষদের মাঝেও লম্বা চুল রাখার রীতি প্রচলিত ছিল। লম্বা বাবড়ি রাখতো তারা। থোকায় থোকায় তা কাঁধের উপর ঝুলতো। কারো মাথায় থাকতো প্যাঁচানো ঝুঁটি।

পাদুকার মাঝে ব্যাপকভাবে প্রচলিত ছিল কাঠের খড়ম। কাঠের খড়ম, বাঁশের লাঠি আর ছাতা সাধারণভাবে বাঙালীরা ব্যবহার করতো। পাহাড়-

www.pathagar.com

পুরের মৃৎফলকগুলিতে দেখা যায়, যোদ্ধা ও দারওয়ানদের মাঝে জুতো পরার চল ছিল। গোড়ালি পর্যন্ত ঢাকা জুতো পরত তারা। ফিতের বালাই ছিল না।

প্রসাধন

বক্ষে আর্দ্র চন্দন, গলায় সূতার হার, সীমন্ত পর্যন্ত আনত শিরোবসন, অনাবৃত বাহুমূল, অঙ্গে অগুরু-প্রসাধন, অঙ্গবর্ণ যেন দূর্বাগ্রকান্ত রুচির অর্থাৎ দূর্বাদলের মতো শ্যাম—ইহাই হইতেছে গৌড়াঙ্গনাদের বেশ।

কাব্য-মীমাংসা গ্রন্থে রাজাশেখর গৌড় রমণীর বেশ প্রসাধনের বর্ণনা দিতে গিয়ে উপরোক্ত উক্তি করেছেন। আজকের মতোই সে কালের শহরের বিত্তবান ঘরের মেয়েদের সাজসজ্জার পারিপাট্য কম ছিল না। নানা ধরনের অলঙ্কার ব্যবহার করতো মেয়েরা। নীচের হাতে পরতো শাঁখা, উপরের হাতে 'বাহখড়' গলায় সাত-সার বা 'দেবচ্ছন্দ' হার মাথায় 'হংসপাদিকা' আর কানে কচি তালপাতার অব-তংস 'তালীপত্র'। সে সময় রাজপরিবার বা রাজানুগৃহীত ব্যক্তি ছাড়া কেহই কানে সোনার কুন্তল পরতে পেত না। সেজন্যেই উচ্চবর্ণের বিত্তবান ঘরের মেয়েদের মাঝেও তালপাতার মাকড়ি পরার রেওয়াজ ছিল ব্যাপক। মেয়েরা এ ছাড়াও আরও নানা ধরনের অলংকার ব্যবহার করতো। দেহ-প্রসাধন করতো চন্দনের গুঁড়ো ও চন্দনপঙ্ক, মৃগনাভি, জাফরান প্রভৃত দিয়ে। ঠোঁট রাঙাতো লাক্ষারসে, পায়ে দিতো অলক্তক, কপালে কাজলের টিপ। বিবাহিতা মেয়েরা সিঁথেয় দিত সিঁদুর, বিধবাদের অবস্থাটি ছিল আজকালের মতো।

গ্রামে বা শহরে যারা পরিশ্রম করে জীবিকার সংস্থান করতো, তাদের সাথে কিন্তু প্রসাধনের এত ফলাও ব্যবস্থা ছিল না। মাঠে-ঘাটে কাজ করতে হতো তাদের, ঘর-গেরস্থালীর কাজ ছিল তার উপর। প্রাচীন কালে নানা ধরনের সূক্ষ্ম বস্ত্রের উল্লেখ পাওয়া যায়, যথা ঃ মেঘ-উদুম্বর, গঙ্গা-সাগর, লক্ষ্মীবিলাস শিলহটী পট্টবস্ত্র প্রভৃতি। তা ছাড়াও ছিল রেশমের কাপড়, শহর বা গ্রামের সাধারণ দরিদ্র ঘরের মেয়েদের কাছে এসব ছিল আকাশ কুসুম কল্পনার সামিল। কার্পাস-তুলোর তৈরী মোটা কাপড় ছাড়া আর কিছু তাদের ভাগ্যে জুটতো না। কবি বার ও আরও একজন অজ্ঞাত-নামা বাঙালী কবির লেখা থেকে জানা যায় দরিদ্রের পরিধেয় মোটা কাপড়ও

www.pathagar.com

তারা না সেলাই করে পরতে পেতো না। ছেঁড়া ও সেলাই করা—এই ছিল তাদের পরিধেয় বস্ত্রের বৈশিষ্ট্য।

সমাজে নারীর অবস্থান

খ্রীস্টীয় তৃতীয়-চতুর্থ শতক থেকে বাঙলাদেশে ব্যবসা বাণিজ্যের প্রসারের ফলে শহর ও নাগরিক জীবন বেশ জমকালো হয়ে ওঠে। বাঙলা-দেশের নাগরিক জীবনে মেয়েদের ব্যভিচার সম্পর্কে যে বিরূপ সমালোচনা সমসাময়িক কালের ভিন প্রদেশবাসীর মাঝে বিদ্যমান ছিল, পরবর্তীকালে অর্থাৎ অবক্ষয়ের যুগ যখন শুরু হয়ে গেছে তখন তার রূপ যাই হোক না কেন, আগে এর মাঝে অনেকখানি আরো প্রাচীন যুগের অবশেষ বা স্মৃতি হিসেবে টিকে ছিল বলে মনে হয়। অন্ততঃ বৌদ্ধ-তান্ত্রিক ধর্মের যে রূপ বাঙলাদেশে প্রচলিত ছিল সে সম্পর্কে এই প্রসংগে যে বিরূপ সমালোচনা তার অনেকখানিই অজ্ঞানতাপ্রসূত, এ সম্পর্কে সন্দেহ নেই।

অবশ্য এটা ঠিকই—পরবর্তীকালে সমাজের উচ্চস্তরে কামচর্চা রীতি-মতো বিকারে পরিণত হয়েছিল। এ সময়ই দাসী-প্রথা সমাজে ব্যাপকভাবে চালু হয়। দেবদাসী-প্রথা বাঙলাদেশে চালু হয় এ সময়। ভট্ট ভবদেব বিখ্যাত স্মৃতিশাস্ত্র প্রণেতা। তিনি বিষ্ণুমন্দির তৈরী করে সেখানে একশ দেবদাসী নিযুক্ত করেছিলেন। তাদের নারীদেহের বর্ণনা প্রসংগে তিনি যে ভাষা ব্যবহার করেছেন তা পড়তে গেলে আজও লজ্জায় মাথা নীচু করতে হয়। সেন আমলে এই বিকার মারাত্মকভাবে বৃদ্ধি পায়। সমাজের অবক্ষয় তখন পুরো মাত্রায় শুরু হয়ে গেছে।

তবে সমাজের উচ্চবিত্তদের বাইরেও বিরাট নারীসমাজ ছিল। তাদের মাঝে অবরোধ প্রথা খুব প্রবল ছিল বলে মনে হয় না। নিম্নবর্ণ তথা নিচু বর্ণের মেয়েরা তো রীতিমতো খেটে খেতো। অবরোধ প্রথা যা কিছু তা ছিল উপরের দিকে। সাধারণতঃ স্ত্রী-কন্যা-মা হিসেবে ছাড়া মেয়েদের আর কোন অধিকার সমাজে স্বীকৃত ছিল না। তবে জীমূতবাহন অবশ্য পুত্রের অভাবে স্বামীর সম্পত্তির উপর বিধবা পত্নীর অধিকার স্বীকার করে গেছেন। বিধবা স্ত্রী যদি নিষ্কলঙ্ক জীবনযাপন করেন, বৈধব্যের নিয়ম-কানুন রীতি-মতো পালন করেন, স্বামীর বাড়ীতে বসবাস করেন, তা হলে তিনি আমৃত্যু স্বামীর সম্পত্তি ভোগদখল করতে পারতেন বটে, কিন্তু দান-বিক্রি করতে বা

www.pathagar.com

বন্ধক দিতে পারতেন না—এই ছিল জীমূতবাহনের বিধান। নানা ধরনের শর্তে সীমাবদ্ধ হওয়া সত্ত্বেও তখনকার দিনে এই বিধান ছিল নিঃসন্দেহে উল্লেখযোগ্য। বাঙলার বাইরে এ জাতীয় বিধান চোখে পড়ে না।

একটি মাত্র স্ত্রী গ্রহণই ছিল সাধারণ রীতি। পরে রাজরাজড়ারা মহা-সামন্ত-সামন্তরা এবং ব্রাহ্মণেরা একাধিক পত্নীর পাণি গ্রহণ করতেন। রাজা শ্যামল বর্মনের হারেমে অগণিত নারী স্থান পেয়েছিল এ কথা তাঁর তাম্র শাসন থেকেই জানা যায়।

গ্রাম্য জীবনে মেয়েদের মাঝে লেখাপড়ার চর্চা ছিল কি-না তা জানা যায় না। তবে নাগরিক জীবনে মেয়েরা কিছুটা লেখাপড়া শিখতেন বলে মনে হয়। মেয়েদের চিঠি লেখার পবনদূত কাব্য কথার উল্লেখ আছে। লেখাপড়া ছাড়া মেয়েরা গান-বাজনা, নাচ-গান প্রভৃতি কলাবিদ্যারও চর্চা করতেন।

গ্রামের জীবন

গ্রামের অবস্থাটা কিন্তু শহরের মত ছিল না। পল্লীজীবন ছিল সহজ-সরল। তাদের জীবনাদর্শও ছিল অনাড়ম্বর-শান্ত-সহজ। দরিদ্রতাও ছিল গ্রামে প্রকট। প্রাচীন বাঙলায় সংস্কৃত সাহিত্যে এর একাধিক দৃষ্টান্ত বিদ্যমান। তাঁদের কামনা ছিল :

'বিষয়পতি লোভহীন, ধেনুদ্বারা গৃহ পবিত্র, নিজ নিজ ক্ষেত্রে উপ-যুক্ত চাষ'...

কৃষকদের চিরন্তন আকাঙ্ক্ষা—নিজের ক্ষেত, গোয়াল ভরা গরু আর রাজস্ব সংগ্রহকারীদের অত্যাচার-অবিচার থেকে মুক্তি। আজকের অবস্থার সাথে এই কামনার সাদৃশ্য ভাবতে গেলে অবাক লাগে।

দিনাজপুরের অন্তর্গত বানগড়, ঢাকার রামপাল, বগুড়ার মহাস্থান প্রভৃতি স্থানে ধ্বংসাবশেষ থেকে মনে হয়—সমৃদ্ধ শহরবাসীরা সাধারণতঃ ইঁট ও কাঠের তৈরী বাড়ী-ঘরে বাস করতেন। নিম্নবিত্তদের অবস্থা হয়তো অন্যরূপ ছিল। সে সম্পর্কে স্পষ্টভাবে কিছু জানা যায় না।

গ্রামে অবস্থাটা ছিল অন্য রকম। যতদূর জানা যায়, সম্পন্ন গ্রাম-বাসীরাও বাড়ী তৈরী করতেন মাটি-খড়-বাঁশ ইত্যাদি দিয়ে। গরীবদের তো

www.pathagar.com

কথাই নেই। সম্পন্ন মহত্তর কুটুম্ব প্রভৃতিরাও এভাবেই ঘরবাড়ী তৈরী করতেন। রাঢ় ও উত্তর বাঙলায় ছিল মাটির দেয়াল, পূর্ব বাঙলায় চাঁচারি বুনে তৈরী হতো বাঁশের বেড়া। বাঁশ বা কাঠের খুঁটির উপর ধনুকাকৃতি বা দুই তিন স্তরে পিরামিডাকৃতি চাল তৈরী হতো। উপমহাদেশের স্থাপত্য শিল্পে এই জাতীয় ধনুকাকৃতি বা পিরামিডাকৃতি ছাদ বাঙলার নিজস্ব অবদান বাঙলাদেশে বিভিন্ন মন্দিরের গড়ন বাঙালার বাইরে বিভিন্ন স্থানে (যথা-আগ্রা দুর্গের এক জায়গায়) এই জাতীয় স্থাপত্য রীতি দেখা যায়।

গরীব গৃহস্থ ও সমাজে খেটে খাওয়া মানুষেরা সাধারণতঃ জীর্ণ কুঁড়ে ঘরে বাস করতো। চাল হতো খড়ের, খুঁটি বাঁশের। এটুকুও সংস্কার করা ছিল তার পক্ষে সাধ্যাতীত। নীচে উদ্ধৃত কবিতাটি থেকে সে কথাটাই স্পষ্ট হয়ে উঠেছে। কবি বার বলেছেন—কাঠের খুঁটি নড়ছে, মাটির দেয়াল গলে পড়ছে, চালের খড় উড়ে যাচ্ছে, কেঁচোর খোঁজে ব্যাঙ্‌গুলো আমার ভাঙ্গাচোরা ঘয়ময় ঘরে বেড়াচ্ছে। সে কালের কবি যেন আজকের দিনের অবস্থা বর্ণনা করছেন। যে সময়ের সমৃদ্ধি সম্পর্কে আমাদের মনে নানারূপ কল্পনা, সে সময়েও গ্রামাঞ্চলে গরীবের অবস্থাটা আজকের চেয়ে কোন অংশে পৃথক ছিল না। আর এরাই ছিল সমাজে বেশীর ভাগ। উদয়াস্ত খেটেও ঘরের খুঁটি বদলে দিবার সামর্থ্য তাদের ছিল না। ফলে মেয়েরাও পুরুষদের পাশাপাশি রুজি-রোজগারে অংশগ্রহণ করতেন। শুধু ঘরের কোণে বসে নয়, এজন্যে তারা হাট-বাজারে যেতেও ইতস্ততঃ করতেন না। কবি শরণের একটি শ্লোকে এই জাতীয় প্রসারিণীদের কথা বলতে গিয়ে বলা হয়েছে ঃ এই চলেছে ধেয়ে মেয়েরা, তাদের চোখ সদ্য সূর্যের মতো অরুণ, গমনের পথে মাথার আঁচল বার বার খসে পড়েছে আর তা তুলে দেবার জন্য তাদের আগ্রহ, চাষী সকালে বেরিয়ে গেছে তার ফেরবার সময় হয়েছে ভেবে যারা লাফিয়ে লাফিয়ে পথ সংক্ষেপ করছে, বেচা-কেনার দাম যারা আঙ্গুলে গুণতে ব্যস্ত।

এসব খেটে খাওয়া মানুষের জীবনে বোধ হয় একমাত্র আনন্দ ছিল গ্রামের অবস্থাপন্ন লোকের বাড়ীর আনন্দ উৎসব, পুজো-পার্বণ, আর ছিল আদিকাল থেকে প্রচলিত সামাজিক উৎসব নাচ-গান পুজো ইত্যাদি।

www.pathagar.com

প্রাচীন কৌম সমাজের স্মৃতি হিসেবেই এগুলি টিকে ছিল এবং সমাজের নীচু তলার লোকগুলি ক্রমে যৌথভাবে সবাই মিলে অংশ গ্রহণ করতো।

অন্ত্যজদের বাসস্থান ছিল জনবসতির বাইরে এক প্রান্তে। চর্যা-গীতিতে শবর-শবরীদের জীবন চিত্রের পরিচয় মেলে কিছু কিছু। ডোম নিষাদরাও গ্রামের বাইরেই বাস করতো। এরা যাতায়াত করতো নৌকায়। অন্যান্য বহু জিনিসের মতো নৌকাও বাঙলাদেশের জীবনযাত্রায় আদি অস্ট্রেলীয়বাসীর দান। কোশা নৌকা তো গড়নেও সে যুগের স্মৃতি বহন করে। নৌকায় বাস করতো যাযাবরেরা। বাঁশের নানা ধরনের জিনিস তৈরী করে গাঁয়ে গাঁয়ে বিক্রি করে বেড়াতো।

ডোম, নিষাদ, শবর, যাযাবর প্রভৃতির অন্যতম বৃত্তি ছিল সাপ খেলানো। বাঙলাদেশে বরাবরই সাপের প্রাচুর্য। প্রতি বছরই সাপের কামড়ে বেশ কিছু লোক প্রাণ দিত। সেজন্যেই যারা সাপ-খেলিয়ে সাপে কামড়ানোর ওষুধ দিয়ে বেড়াতো, সমাজে তাদের বেশ আদর ছিল। রাজসভাতেও বিষবৈদ্য বা জাঙ্গলিকের স্থান মোটেই ন্যূন ছিল না। তিনি ছিলেন সম্মানিত রাজপুরুষ।

মোটামুটি এই ছিল সেদিনের—হাজার বছর আগের গ্রাম-বাঙলার জীবন-চরিত।

www.pathagar.com

বারো

মানস চরিত্র

এক সময় যেমন রাষ্ট্র ছিল না, রাজা, উজির, বিচারালয়, শান্তি রক্ষক প্রভৃতি রাষ্ট্রের আনুষঙ্গিক সংস্থাগুলির কোনটিরই অস্তিত্ব ছিল না, তেমনি ধর্ম বলতে আমরা যা বুঝি তাও এক সময় মানুষের কাছে ছিল অজানা। প্রাচীন মানুষ বিভিন্ন কৌমে ভাগ হয়ে বসবাস করতো। সেদিন প্রকৃতির তুলনায় তারা ছিল নেহাতই দুর্বল। প্রায় ক্ষেত্রেই প্রকৃতি তাদের নিয়ন্ত্রণ করতো। প্রকৃতির উপর প্রভাব বিস্তার করার ক্ষমতা সেদিন ছিল নেহাতই সীমাবদ্ধ। তবু মানুষ তাদের সীমাবদ্ধ ক্ষমতা নিয়েই বাঁচবার প্রচেষ্টা থেকে কিন্তু কোন দিনই বিরত থাকে নি। একেবারে আদি যুগে, কৌম-সমাজের আমলে, প্রকৃতির উপর প্রভাব বিস্তার করার জন্য অসহায় মানুষের সেই অদ্ভুত, আজকের দৃষ্টিতে হাস্যকর প্রচেষ্টাই ম্যাজিক নামে খ্যাত। এই ম্যাজিকের সাথে পরবর্তী যুগের ধর্মের কোন সম্পর্ক নেই। যদি কোন কিছুর সম্পর্ক থেকে থাকে, যদি কোন কিছুর অন্তর্নিহিত নীতির সাদৃশ্য থেকে থাকে, তবে তা হলো বিজ্ঞান। বিজ্ঞানে যেমন নির্দিষ্ট ফল লাভের জন্য নির্দিষ্ট কাজ করা, হয়, ম্যাজিকেও তাই। বিজ্ঞান বস্তুনিষ্ঠ বলে আকাঙ্ক্ষিত ফল লাভ হয়, ম্যাজিকে তা হয় না। তবু সাদৃশ্যটা লক্ষণীয়।

বাঙলাদেশে আমাদের কৌম অতীতটা মরে গিয়েও মরতে চায় না। সমাজ বিকাশের বিচিত্র গতির জন্য তা টিকে থাকে। যে জিনিসের স্থান হওয়া উচিত যাদুঘরে তারই স্থান হয় সমাজের রীতি-নীতি, কিম্বা ভাবনায়। প্রাচীন কালে যে সব ম্যাজিক খুবই প্রচলিত ছিল, ফসল বৃদ্ধির কামনায় যে সব অনুষ্ঠান করা হতো, নাম বদলে এবং পুরানো বিশ্বাস বাদ দিয়ে তার অনেকগুলিই আজো টিকে আছে। বাঙলাদেশের মেয়েদের ব্রত, আলপনাই তার সাক্ষ্য।

বাঙলাদেশে কৃষিপ্রধান কৌমগুলি ছিল মাতৃতান্ত্রিক। পরবর্তীকালের ধর্মচেতনায় মাতৃতান্ত্রিকতারও ছাপ পড়েছে প্রবলভাবে। শক্তি-

www.pathagar.com

সাধনা বাঙালী হিন্দু ধর্মবিশ্বাসের একটি প্রধান অংগ। চণ্ডী, দুর্গা, কালী ইত্যাদি নানা আকারে দেবীরা আজও পূজা পেয়ে থাকেন। এসব দেবীদেরও আবার নানা রূপ। একই দেবী নানারূপে পূজিতা হন। দুর্গার কথাই ধরা যাক। সাধারণতঃ দুর্গার যে মহিষ মর্দিনী আজকাল পূজা পান তাছাড়াও আরও নানা রকম দুর্গা মূর্তির সন্ধান পাওয়া যায় নানা জায়গায়। তাদের মাঝে বনদুর্গা, পর্ণশবরী প্রভৃতি কতকগুলি রূপ তো নানা কারণে আমাদের সবারই পরিচিত। এ শুধু দুর্গা নয়, চণ্ডী, কালী প্রভৃতি সব দেবীর বেলায়ই একই ব্যাপার দেখা যায়। অনুমান করা হয় আদিতে এরা ছিলেন বিভিন্ন কৌমের আরাধ্য দেবী। কাল-ক্রমে বিভিন্ন কৌমের মেলামেশার ভিতর দিয়ে এসব দেবীদেরও সমন্বয় হয়েছে। ক্রমে কৌমগুলি আর্যপ্রধান সমাজের অংগীভূত হয়েছে। যা ছিল এককালে প্রাচীন বিশ্বাস ক্রমে তা-ই ব্রাহ্মণ-প্রধান সমাজের ধর্ম বিশ্বাসের অংশ হিসেবে পরিগণিত হয়েছে। বিভিন্ন কৌমের আরাধ্যা দেবীরা ক্রমে দুর্গা, কালী, চণ্ডী প্রভৃতি রূপের মাঝে মিশে গেছেন।

শক্তি-সাধনার আর একটি বৈশিষ্ট্য হলো তার পূজা রীতি। এই সব দেবীদের অনেকেই অরণ্যচারী, নানাভাবে পার্বত্য অঞ্চলের সাথে সম্পৃক্ত। তাদের পূজা বিধিতেও জীব-বলি একটি অত্যাবশ্যক অংগ। তা ছাড়াও পূজার আরও যে-সব উপাচার তাও প্রাচীন কৌম যুগের উৎসব-সমূহের কথাই মনে করিয়ে দেয়।

তন্ত্র সাধনা প্রাচীন বাঙলার ধর্মবিশ্বাসের অন্যতম বৈশিষ্ট্য এবং শক্তি সাধনার সাথে অঙ্গাঙ্গীভাবে যুক্ত। পরবর্তীকালে যখন কৌম সমাজ ভেঙ্গে গেছে তখন বৌদ্ধ ধর্ম বিভিন্ন আঞ্চলিক বিশ্বাসের সংমিশ্রণে তন্ত্র সাধনা কেন যে রূপই পরিগ্রহ করুক না, আদিতে শক্তি সাধনার মতোই তন্ত্র-সাধনাও ছিল কৃষিপ্রধান মাতৃতান্ত্রিক সমাজের যাদু অনুষ্ঠানের অংগ। ভাল ফসল, জমির উর্বরা শক্তি বৃদ্ধি প্রভৃতি কামনায় সে কালে মানুষ যে অনুষ্ঠানসমূহ পালন করতো কালে আদি তাৎপর্য হারিয়ে পরবর্তীকালের ধর্মচেতনার প্রলেপে রঞ্জিত হয়ে তা-ই তান্ত্রিক সাধন ভজন পদ্ধতিতে রূপান্তরিত হয়েছে। বিচিত্রভাবে, বিচিত্র রূপে এই সাধন-ভজন পদ্ধতি পরিব্যাপ্ত হয়েছে বাঙলার লোকায়ত সমাজে। বাউল, সহজিয়া প্রভৃতি সাধনা, দেহতত্ত্বের গান বাঙলার ঘরের জিনিস, একেবারে দেশজ। আবার

www.pathagar.com

এসবই তন্ত্র সাধনার সাথে গভীরভাবে সম্পর্কিত, বলতে গেলে তারই নানা ধরনের রকম-ফের। তন্ত্রের প্রভাব বাঙলার সমাজে খুবই গভীর। এখন পর্যন্ত যতটুকু জানা গেছে তাতে দেখা যায়, হাজার বছর আগে রচিত চর্যাগীতিগুলিই বাঙলা ভাষায় বাঙালীর সাহিত্য সাধনার প্রাচীনতম নিদর্শন। বৌদ্ধতন্ত্র সাধনার সাথে এই নীতিগুলির সম্পর্ক সর্বজন-বিদিত।

বাঙলাদেশে ব্রাহ্মণ্য ধর্মের প্রভাব জোরালো হয়েছে গুপ্ত সাম্রাজ্যের আমল থেকে। পশ্চিম-ভারতীয়, বৈদিক ও পুরাতন দেব-দেবীদের অনেকে পুজো পেতে শুরু করেছেন। রাজ-সরকারের আনুকূল্যে এই প্রভাব গোড়ায় পড়েছে সমাজের উপরের স্তরে। ক্রমে পাল-সেন আমলে তা দৃঢ় হয়েছে, লোক-সমাজে পরিব্যাপ্ত হয়েছে। কিন্তু এই প্রভাব কোনকালেই দেশে প্রচলিত ধর্মমত বা রীতিসমূহকে অস্বীকার করতে পারেনি। আপোষ করতে হয়েছে তার সাথে। এ দেশের দেব-দেবীরাও ক্রমে অন্যান্য পৌরাণিক দেব-দেবীদের সমগোত্রীয় হয়ে উঠেছেন। শক্তি সাধনা, শ্মশান-চারী শিব পুজো, শিব-লিংগ পূজাকে জাতে তুলে স্বীকৃতি দিতে হয়েছে। এভাবে প্রাচীন কৌম যুগের আচার-অনুষ্ঠান, যাদু-বিশ্বাস পরবর্তী-কালের বৌদ্ধ, জৈন ও অন্যান্য ধর্মমতের সাথে আর্য ব্রাহ্মণ্য ধর্মবিশ্বাসের সংমিশ্রণে তৈরী হয়েছে প্রাচীন বাঙলার ধর্মীয় মানস।

বিভিন্ন ধর্মবিশ্বাসের সাথে কৌম সমাজের আদিমতম বিশ্বাস, ভয়, আচার অনুষ্ঠানের এই যে সংমিশ্রণ তার বিস্তৃত আলোচনা এখানে সম্ভব নয়। পুরোপুরি ব্যাপারটি আজও জানা যায় নি। যেটুকু জানা গেছে তাও আরও বিস্তৃতভাবে আলোচনার অপেক্ষা রাখে। সংক্ষিপ্ত পরিসরে টুকরো-টাকরা দু'একটি রেখা থেকে শুধু খানিকটা আভাস দেওয়া যেতে পারে, আর কিছু সম্ভব নয়।

বর্ণভেদ প্রথা আলোচনা করতে গিয়ে তার সাথে কৌম সমাজের সম্পর্কের ব্যাপারে কিছুটা আলোচনা করা হয়েছে। বলতে গেলে বর্ণ-ভেদ প্রথা এবং তার সাথে যুক্ত খাওয়া-দাওয়ার ছোঁওয়াছুঁয়ি, জাত-বিজাত বিচার প্রভৃতি প্রায় প্রত্যক্ষভাবে প্রাচীন কৌম সমাজের রীতি-নীতির সাথে যুক্ত। যোগাযোগটা মোটেই অপ্রত্যক্ষ নয়, বরঞ্চ রীতিমতো প্রত্যক্ষ।

www.pathagar.com

অষ্ট্রিকভাষী আদি অষ্ট্রেলীয়রা বিশ্বাস করতো একাধিক জীবনে। তারা মনে করতো, মৃত্যুর পর মানুষের আত্মা দেহ ছেড়ে কোন জীব-জন্তু গাছ-পালা বা পাহাড়-পর্বতকে আশ্রয় করে বেঁচে থাকে। পরে তা আবার মানুষের দেহ আশ্রয় করে মানবজন্ম লাভ করে। তাদের এই আদিম বিশ্বাসই কালক্রমে পরিণত হয় জন্মান্তরবাদ ও পরলোকবাদে। কর্মফল সংক্রান্ত যে দার্শনিক তত্ত্ব, তার উৎসও এখানে।

আদি অষ্ট্রেলীয়রা মৃত্যুর পর মৃতদেহ হয় গাছে ঝুলিয়ে দিত, না হয় কবর দিত। খাসিয়াদের মাঝে একই রীতি আজও দেখা যায়। মাঝে মাঝে এরা মৃত ব্যক্তির উদ্দেশ্যে পরলোকে তাদের আহারের জন্যে খাবার জিনিস রেখে দিত। এসব বিশ্বাস থেকেই পরবর্তীকালে মৃতের আত্মার সদ্গতির জন্যে শ্রাদ্ধ ইত্যাদি প্রথার উদ্ভব হয়ে হিন্দু সমাজে গৃহীত হয়েছে।

পরবর্তীকালে লিঙ্গ পূজা আর্য ব্রাহ্মণ্য সমাজে গৃহীত হয়ে শিব পূজার সাথে যুক্ত হয়ে গেছে। আদিতে শিব পূজা প্রচলিত ছিল অষ্ট্রিক-ভাষী আদি অষ্ট্রেলীয়দের মাঝে। লিঙ্গ শব্দটিও বাঙলা ভাষায় তাদেরই দান। শ্মশানচারী শিব শিবের অনেকগুলি রূপের মাঝে একটি। মধ্য-যুগে রচিত শিব-মঙ্গল কাব্যগুলি থেকে দেখা যায় চাষবাসে নিযুক্ত শিবের পাশাপাশি তার এই বাউণ্ডুলে ভবঘুরে নেশাখোর রূপটিকেও প্রায় সমান দরদ দিয়ে ফুটিয়ে তুলেছেন সেকালের বাঙালী কবিরা। আদিতে এই শ্মশানচারী শিব ছিলেন দ্রাবিড়ভাষীদের দেবতা শিবন্। শিবন্ শব্দটির অর্থ রক্ত বা লাল। আদিম যাদু বিশ্বাসের জগতে রক্ত বা লাল-রঙ দুটিই বিশেষ তাৎপর্য বহন করে। শ্মশানচারী শিবের সাথে আদিম কৌম সমাজে প্রচলিত বিশ্বাসের যোগাযোগটি এ থেকেই স্পষ্ট। দ্রাবিড় ভাষায় শেম্বু শব্দটির অর্থ হলো তামা। শিবের আর এক রূপ শম্ভুর উদ্ভব এ শেম্বু থেকে। এই শম্ভুই পরবর্তীকালে আর্য দেবতা রুদ্রের সাথে মিশে গিয়ে রুদ্রশিব এবং মহাদেবে রূপান্তরিত হয়েছে।

কোনো বিশেষ গাছ, পাথরের টুকরোর গায়ে সিঁদুর, বেলপাতা চড়িয়ে পূজো করার রেওয়াজ আজও অপ্রচলিত হয়ে যায়নি। যে সময়ের কথা আমরা আলোচনা করছি, সে যুগে তা রীতিমতো প্রচলিত ছিল।

www.pathagar.com

গাঁয়ের বাইরে কোনো গাছের ছায়ায় বা খোলা জায়গায় থাকতো গ্রাম-দেবতার 'থান' বা স্থান। বিভিন্ন জায়গায় এই গ্রাম-দেবতার বিভিন্ন নাম। কোথাও ভৈরবী, কোথাও বন-দুর্গা, আবার কোথাও বা স্থানীয় নাম। কোন কোন জায়গায় এই গ্রাম-দেবতার বিগ্রহ থাকতো। আবার অনেক জায়গায় থাকতো না। সেখানে থাকতো পাথরের নুড়ি। লোকে এই গ্রাম-দেবতার কাছে মানত করতো—পশু বলি দিতো তার কাছে। পরবর্তীকালে আর্য ব্রাহ্মণেরা এই গ্রাম-দেবতা, গাছ-পাথর পূজাকে নিন্দা করে বিধান দিতে চেয়েছেন। কিন্তু তা কার্যকরী হয়নি কোনদিন। প্রধানতঃ রাঢ় অর্থাৎ পশ্চিম বাঙলায় প্রচলিত ধর্ম ঠাকুরের যে বিগ্রহ পুজো করা হয় তা এক খণ্ড কূর্মাকৃতি পাথরের টুকরো ছাড়া আর কিছু নয়। বস্তুতঃপক্ষে চড়ক-ধর্মপুজোর অনুষ্ঠানের সাথে আদিম কৌম সমাজের যাদু-বিশ্বাসগত অনুষ্ঠানসমূহের যোগাযোগ অতি সহজেই চোখে পড়ে। তা খুবই প্রত্যক্ষ।

পাথর, গাছ-গাছড়া বা কোন বিশেষ জায়গার উপর দেবত্ব আরোপ করে তার পুজো করার রীতি প্রথম দেখা যায় অষ্ট্রিকভাষী আদি অষ্ট্রিলীয় কৌমগুলির মাঝে। আধুনিক অর্থে দেবত্ব আরোপের ব্যাপারটি অবশ্য আরও পরের ব্যাপার। আদিতে এই ব্যাপারটি কৌম সমাজের যাদু-বিশ্বাসের সাথে যুক্ত ছিল।

বাঙলাদেশে বিভিন্ন ধর্মানুষ্ঠান, লোকাচারের সাথে আজও ধানের গুচ্ছ, ধান-দুর্বা, কলা, হলুদ, সুপারী, পান, সিদুঁর, কলাগাছ প্রভৃতি একটা বিশেষ জায়গা জুড়ে আছে। বিয়ে থেকে শুরু করে অন্যান্য বহু অনুষ্ঠানের লোকাচারে এর অনেকগুলিই সম্প্রদায় নির্বিশেষে সবার মাঝেই ব্যবহৃত হয়। হিন্দু সমাজের ধর্মানুষ্ঠানে তো কথাই নেই। আসলে এ সবই সেই কৌম যুগের কৃষি সভ্যতা ও সংস্কৃতির পরিচয় বহন করছে আজও। সিদুঁরের ব্যবহার কৃষিভিত্তিক সমাজের যাদুবিশ্বাসের সাথে সরাসরিভাবে যুক্ত।

প্রাচীনকালে এক একটি কৌমের ছিল এক একটি টোটেম—সাধারণতঃ কোন নির্দিষ্ট পশু-পাখী। পরবর্তীকালে বিভিন্ন কৌম পরিচিত হতো তাদের নির্দিষ্ট টোটেম আঁকা ধ্বজ বা ধ্বজার সাহায্যে। টোটেম আঁকা

www.pathagar.com

এই ধ্বজগুলি আবার রীতিমতো পুজো পেত সেই কৌমের লোকজনের কাছ থেকে। পরবর্তীকালে বিভিন্ন পৌরাণিক দেব-দেবীর কল্পনার বাহন হিসেবে বিভিন্ন পশু-পাখীর উল্লেখ দেখা যায়। যেমন—সরস্বতীর বাহন হাঁস, লক্ষ্মীর বাহন প্যাঁচা, বিষ্ণুর বাহন গরুড় ইত্যাদি। দেব-দেবীদের বাহনের এই কল্পনা আগের যুগের টোটেম ও ধ্বজা-পুজোর স্মৃতি ছাড়া আর কিছুই নয়।

যে যুগের বাঙালীর কথা আলোচনা করছি আমরা সে যুগে প্রচলিত ধর্মবিশ্বাসের সাথে প্রাচীন কৌম-সমাজের যোগাযোগের প্রমাণ হিসেবে আরও বহু দৃষ্টান্ত উল্লেখ করা যেতে পারে। তার মাঝে অনেকগুলিই আজও বাঙালী হিন্দু-সমাজে জোরালোভাবেই প্রচলিত।

সাধারণতঃ ধর্মানুষ্ঠানে প্রধান ভূমিকা পুরুষের। পুরুষরাই পুরোহিত, গোটা অনুষ্ঠান জুড়ে তাদেরই মোড়লী। মেয়েলী ব্রত-অনুষ্ঠানগুলিই একমাত্র ব্যতিক্রম। কালক্রমে বহু ব্রত অনুষ্ঠানে পুরোহিতদের অনুপ্রবেশ ঘটেছে। অপাংক্তেয় করতে না পেরে শাস্ত্রকারেরা এই ব্রত অনুষ্ঠানগুলিকে জাতে তুলে নিয়ে পুরোহিত ও সংস্কৃত মন্ত্রের ব্যবস্থা দিয়েছেন। কিন্তু মেয়েদের ভূমিকা এই ক্ষেত্র থেকে আজও একেবারে নিঃশেষ হয়ে যায়নি। সত্যি সত্যি বহু প্রাচীন বিভিন্ন ব্রতে আজও মেয়েরাই প্রধান। তারাই ব্রত-অনুষ্ঠানের উদ্যোগ নেয়, আলপনা আঁকে, পাঁচালী পড়ে কামনা জানায়। এই ব্রতগুলি ব্রাহ্মণ্য ধর্মে স্বীকৃত নয়। তাই বলে এদের সংখ্যাও নেহাত কম নয়। ব্যাপকভাবে আজও হিন্দু সমাজে এই অনুষ্ঠানগুলি উদ্‌যাপিত হয়।

সাধারণতঃ সবগুলি প্রাচীন ব্রতই কোন না কোনভাবে কৃষির সাথে সম্পর্কিত যাদু অনুষ্ঠানের সাথে যুক্ত। ব্রত অনুষ্ঠানে মেয়েদের প্রাধান্যও মাতৃপ্রধান সমাজের কথাই মনে করিয়ে দেয়। এককালে কৃষি যে মেয়েরাই আবিষ্কার করেছিলো, প্রাচীন মেয়েলী ব্রতগুলি আজও তারই স্মৃতি বহন করছে।

মধ্যযুগে রচিত মঙ্গল-কাব্যগুলির মাঝে মনসা-মঙ্গল কাব্যগুলিই প্রধান। সেখানে বা আজকাল মনসা যে রূপে পূজিতা হন হাজার বছর আগে কিন্তু এমনটি ছিল না। তখন মনসার প্রতিমা পুজো হতো। সে

www.pathagar.com

সময়কার যেসব মূর্তি পাওয়া গেছে তার প্রত্যেকটিতেই দেখা যায় দেবীর সাথে একাধিক সাপের কোলে একটি মানব শিশু, একটি ফলের এবং কোথাও কোথাও একটি ভরা ঘটের ছবি। আজকালও ধান বোঝাই মাটির ঘটের উপর সাপ হাতে মনসার পট এঁকে পূজো করা হয়। সাপ এবং ফল আদিম বিশ্বাসের জগতে এ দুটিই ছিল উৎপাদিকা শক্তির সাথে সম্পর্কিত। ফসলের উৎপাদনের সাথে মানবিক উৎপাদনের যোগাযোগ তো আদিম বিশ্বাসের একটি প্রধান সূত্র। এসব কিছু থেকে মনে হয় আদিতে মনসাও ছিলেন কোন কৃষিনির্ভর কৌম বিশেষের আরাধ্যা। হয়তো সেই মানব-গোষ্ঠীর টোটেম ছিল নাগ এবং তা থেকে উদ্ভূত নাগ পূজার সঙ্গে এর কোন সম্পর্ক আছে কিনা তা ভেবে দেখার মতো।

এভাবে সে যুগে এবং আজও হিন্দু সমাজে প্রচলিত বিভিন্ন ধর্মানুষ্ঠান যথা—হোলী, অম্বুবাচী, চড়ক পূজো প্রভৃতি অনুষ্ঠান, কৃষির সাথে সম্পর্কিত বিভিন্ন উৎসব ; যথা—নবান্ন, বীজ ছড়াবার ও শালিধান বুনবার অনুষ্ঠান, নতুন ঋতুর প্রথম ফসলকে কেন্দ্র করে উৎসব, জাঙ্গুলী, পর্ণশবরী, ষষ্ঠী, শীতলা প্রভৃতি দেবীদের পূজো এবং শাবরোৎসবের মত উৎসব অথবা বিয়ে শ্রাদ্ধ প্রভৃতি উপলক্ষে প্রচলিত বিভিন্ন লোকাচারের বিভিন্ন রীতি-পদ্ধতি একটু খুঁটিয়ে দেখলেই তার সাথে প্রাচীন কৌম সমাজের প্রচলিত বিশ্বাস ও রীতি-পদ্ধতির সম্পর্ক অতি সহজেই চোখে পড়ে। বলতে গেলে প্রাচীন রীতি অনুষ্ঠানগুলিই কিছু পরিবর্তিত হয়ে তখনো অনুষ্ঠিত হচ্ছিলো ব্যাপকভাবে। আদিম কৌম সমাজের অবসানের ফলে আদি তাৎপর্যটুকু পুরোপুরি টিকে ছিল না ঠিকই, কিন্তু এ দেশের সমাজ বিকাশের বিচিত্র ধরনের জন্যে তা একেবারে হারিয়েও যায়নি। তারই উপর প্রলেপ পড়েছিল জৈন, বৌদ্ধ ও ব্রাহ্মণ্য ধর্মের এবং সবকিছু মিলেমিশে উদ্ভব হয়েছিল বার মাসে তের পার্বণের রীতি।

বাঙলাদেশ প্রথম যে আর্য-ধর্মের সংস্পর্শে আসে তা হলো জৈন, আজীবিক ও বৌদ্ধধর্ম। এই তিনটি ধর্মমতই বেদের অপৌরুষেয়ত্বে অবিশ্বাসী—এই অর্থে নাস্তিক।

জৈন-পুঁথি থেকে দেখা যায় খ্রীস্ট-পূর্ব ষষ্ঠ শতকে জৈন তীর্থঙ্কর মহাবীর যখন ধর্ম প্রচারের উদ্দেশ্যে রাঢ় দেশে এসেছিলেন তখন সেখানকার লোকেরা কুকুর লেলিয়ে দিয়েছিল তাঁর উপর। সেদিন রাঢ়ের লোকেরা

www.pathagar.com

আর্য ধর্মের এই প্রসার ভালো চোখে দেখেনি। মহাবীর ব্যর্থ হয়ে ফিরে গিয়েছিলেন। তা সত্ত্বেও জৈনধর্ম বাঙলায় প্রসার লাভ করেছিল। সম্রাট অশোকের সময় পুণ্ড্রবর্ধনে নির্গ্রন্থ জৈনদের বসবাসের খবর পাওয়া যায়। খ্রীস্টপূর্ব চতুর্থ-তৃতীয় শতকে উত্তর বাঙলা জুড়ে জৈন ধর্মের প্রসারের প্রমাণ মেলে নানা সূত্রে। চন্দ্রগুপ্ত মৌর্যের সমসাময়িক জৈন আচার্য ভদ্রবাহুর শিষ্য গোদাসের অনুসারীরা কালক্রমে যে চারটি শাখায় ভাগ হয়ে গিয়েছিল তাদের মাঝে তিনটির নাম—তাম্রলিপ্তি, কোটীবর্ষ ও পুণ্ড্রবর্ধন। বাঙলাদেশে জৈন ধর্মের প্রসারের ব্যাপকতা এ থেকেই অনুমান করা চলে।

গুপ্ত আমলে জৈন ধর্মের উল্লেখ তেমন না পাওয়া গেলেও পাহাড়পুরে অবস্থিত বিখ্যাত সোমপুর বৌদ্ধ-বিহারের পাশাপাশি আবিষ্কৃত হয়েছে বর্তমান গোয়াল ভিটার (প্রাচীন বটগোহালী) জৈন বিহারের ধ্বংসাবিশেষ। এ সময়ের দেড়শো বছর পরে চীনা পরিব্রাজক হিউ এন-থসাঙ পুণ্ড্রবর্ধন ও সমতটে বহুসংখ্যক দিগম্বর নির্গ্রন্থ জৈনের কথা উল্লেখ করেছেন। তারও পরে পাল আমলেও জৈন ধর্মের অস্তিত্বের প্রমাণ মেলে সুন্দরবন, বাঁকুড়া, দিনাজপুরে আবিষ্কৃত জৈন মূর্তিতে। ত্রয়োদশ শতকের গোড়ার দিকেও রাঢ়, গৌড় ও বঙ্গে নির্গ্রন্থ জৈন সংঘের অস্তিত্ব যে ছিল তার প্রমাণ মেলে চালুক্যরাজ বীরধবলের মন্ত্রী বস্তুপালের জৈন তীর্থ দর্শনের ইতিবৃত্ত থেকে। তবে এরপর জৈন সংঘ বা জৈন ধর্মাবলম্বীদের কোন উল্লেখ পাওয়া যায় না। পাল আমল থেকেই তাঁদের প্রভাব কমতে শুরু করেছিল। মনে হয় এ সময় তা পুরাপুরিই নিঃশেষ হয়ে গিয়েছিল।

আজীবিক ধর্মের প্রতিষ্ঠাতা মখলিপুত্র গোসাল ছিলেন মহাবীরের সমসাময়িক বুদ্ধের অন্যতম গুরু। একজন প্রসিদ্ধ লোকায়তিক বলেও খ্যাত ছিলেন তিনি। বাঙলাদেশে আজীবিকরা একসময় বেশ প্রভাব বিস্তার করেছিল। মহাবীর যখন নিজের মত প্রচারের জন্য রাঢ় দেশে আসেন তখন সেখানে তিনি বাঁশের বড় বড় লাঠিধারী আজীবিক ধর্ম প্রচারকের দেখা পেয়েছিলেন। আজীবিকরা পরে নির্গ্রন্থ জৈনদের সাথে মিশে গিয়েছিল।

www.pathagar.com

সম্রাট অশোকের আগেই উত্তর বাঙলায় বৌদ্ধধর্মের প্রসার হয়েছিল। অশোকের সময় তা আরও বিস্তৃত হয়। সাঁচীতে উৎকীর্ণ দুটি শিলালিপি থেকে খ্রীস্ট-পূর্ব দ্বিতীয় শতকে পুণ্ড্রবর্ধনের দু'জন অধিবাসীর দানের কথা জানা যায়। এ সময় বৌদ্ধ ধর্ম পুণ্ড্রবর্ধনে সুপ্রতিষ্ঠিত হয়ে গিয়েছিল। নাগার্জুনকোণ্ডার শিলালিপির সময় মোটামুটি খ্রীস্টীয় দ্বিতীয়-তৃতীয় শতক। সিংহলের থেরবাদী বৌদ্ধদের চেষ্টায় যেসব জনপদ বৌদ্ধধর্মে দীক্ষিত হয়েছিল তার যে তালিকা এই লিপিতে উৎকীর্ণ আছে তাতে বঙ্গের নাম পাওয়া যায়।

খ্রীস্ট জন্মের প্রায় দেড়শো বছর আগে থেকে খ্রীস্ট জন্মের পর প্রায় দেড়-দুশো বছর—এই সময়টা উপমহাদেশের ইতিহাসে এক বিরাট আলোড়নের যুগ। পৃথিবীর নানা অংশ থেকে নানা জাতি এসে ভেঙ্গে পড়ছিলো এ সময়। এসেছিল গ্রীকরা, মধ্যএশীয় শক-কুষাণরা। তারা সাথে করে নিয়ে এসেছিল নানা ধরনের চিন্তা-রীতি-নীতি। উপমহাদেশের স্বয়ংসম্পূর্ণ গ্রামভিত্তিক কৃষিপ্রধান সভ্যতার এইসব চিন্তা-রীতি-নীতির ধীর গতিতে হলেও সমন্বয় সাধন চলছিল। উপমহাদেশের পূর্বাঞ্চলে এর আগে জৈন ও বৌদ্ধ ধর্মের উদ্ভব, মৌর্য সাম্রাজ্যের বিস্তৃতি, সম্রাট অশোক প্রমুখের ধর্মমতের ব্যাপক প্রচার প্রভৃতি দেশের ভিতরেও আলোড়ন সৃষ্টি করেছিল। দূর-দূরান্তের সাথে উপমহাদেশের বাণিজ্যিক যোগাযোগও বৃদ্ধি পাচ্ছিলো এ সময়। সমাজে প্রতিষ্ঠালাভ করছিলো শ্রেষ্ঠ শিল্পীরা—সারা দেশ জুড়ে গড়ে উঠছিলো সমৃদ্ধ নগর-বন্দর, হাট-বাজার। এক কথায় খ্রীস্ট জন্মের প্রায় দেড়শো বছর আগে থেকে খ্রীস্ট জন্মের পর প্রায় দেড়শো বছর, মোট এই তিনশো বছর ধরে সমাজ, অর্থনীতি, তথা মানসজগৎ জুড়ে চলছিলো বিরাট আলোড়ন। ব্রাহ্মণ্য ধর্মের প্রসারের পাশাপাশি শ্রেষ্ঠ শিল্পী প্রভৃতির মধ্যে ব্যাপকভাবে প্রসার লাভ করছিলো বৌদ্ধ ধর্ম। সমন্বয়ের চেষ্টাও চলছিলো। গুপ্ত সাম্রাজ্যের রাষ্ট্র বন্ধনে ও অর্থনৈতিক ব্যবস্থায় প্রায় গোটা উপমহাদেশ জুড়েই ধর্ম ও সংস্কৃতিতেও যুগের আলোড়নের ছাপ পড়লো। বৌদ্ধ ধর্মে মহাযানবাদের উদ্ভব, বৌদ্ধ ও ব্রাহ্মণদের মাঝে বহু নতুন নতুন দেব-দেবীর কল্পনা এ সময়ই দেখা যায়।

www.pathagar.com

বাঙলাদেশে গুপ্ত আমল থেকে ব্রাহ্মণ্য ধর্মের প্রসার শুরু হলেও বৌদ্ধ ধর্মের নাম-ডাকই সবচেয়ে বেশী। খ্রীস্টীয় পঞ্চম শতকের গোড়ায় চীনা ভ্রমণকারী ফা-হিয়েন এসেছিলেন এ দেশে। তাম্রলিপ্তি বন্দর তখন জমজমাট। বৌদ্ধ ধর্মও সেখানে তখন দৃঢ়মূল। ফা-হিয়েন দু'বছর ধরে বৌদ্ধ সূত্র ও প্রতিমা চিত্র নকল করে পাঠিয়েছিলেন তাম্রলিপ্তিতে। সে সময় সেখানে ছিল বাইশটি বৌদ্ধ বিহার। এই বিহারগুলিতে বাস করতো অসংখ্য বৌদ্ধ ভিক্ষু। ষষ্ঠ শতকের শুরুতে বাঙলার পূর্বতম প্রান্ত ত্রিপুরায়ও বৌদ্ধ ধর্মের প্রসার হয়েছিল।

সপ্তম শতকে বাঙলায় বৌদ্ধদের কথা জানা যায় হিউ এন-থ্সাঙ-এর বিবরণ থেকে। রাজমহলের কাছাকাছি কজঙ্গলে তিনি দেখেছিলেন ছ-সাতটি বৌদ্ধ বিহার। তিনিই পুণ্ড্রবর্ধনে দেখেছিলেন বিশটি, সমতটে ত্রিশটি, কর্ণসুবর্ণে দশটি, তাম্রলিপ্তিতে দশটি। আগের তুলনায় তাম্রলিপ্তিতে বিহারের সংখ্যা কমলেও এই বিবরণ থেকেই অন্যান্য জায়গায় বৌদ্ধ ধর্মের জমজমাট অবস্থাটা বোঝা যায়।

সপ্তম শতাব্দীরই শেষ দিকে আসেন ই-ৎসিঙ। তাঁর আগেও আরও অনেকে এসেছিলেন। এঁরা সবাই ছিলেন বৌদ্ধ শ্রমণ। এঁদের লেখা থেকেও এ সময়ে বৌদ্ধ ধর্মের অবস্থা সম্পর্কে অনুমান করা চলে। ই-ৎসিঙ যখন আসেন তখন অবশ্য তাম্রলিপ্তি বন্দরের অবনতির যুগ শুরু হয়ে গেছে। বৌদ্ধ ধর্মেরও সেখানে তখন হীনাবস্থা। কিন্তু একই সময়ে পৃষ্ঠপোষক খড়্গ বংশীয় রাজাদের প্রচেষ্টায় বৌদ্ধ ধর্মের ব্যাপক প্রসার সাধিত হয়েছে সমতটে। ই-ৎসিঙ যখন আসেন তখন শ্রমণের সংখ্যা আগের তুলনায় দ্বিগুণ হয়ে চার হাজারে দাঁড়িয়েছে।

খ্রীস্ট-পূর্ব দেড়শো থেকে শুরু করে খ্রীস্ট জন্মের পর দেড়শো বছর—মোট এই তিনশো বছর যেমন উপমহাদেশের ইতিহাসে বিরাট আলোড়নের যুগ তেমনি সপ্তম শতকের মাঝামাঝি থেকে শুরু করে অষ্টম শতকের মাঝামাঝি—এই একশো বছরও বাঙলার ইতিহাস গভীর তাৎপর্যবহ। বাঙলার রাষ্ট্রক্ষেত্রে এ সময় গভীর জটিলতা দেখা দিয়েছে। গুপ্ত সাম্রাজ্যের অবসানের পর প্রধান হয়ে উঠেছে বিভিন্ন অঞ্চলে আঞ্চলিক ভূ-স্বামীরা। নিজেদের এলাকায় স্বাধীন রাজ্য প্রতিষ্ঠা করে একে অন্যের

www.pathagar.com

সাথে যুদ্ধ করছে। প্রায় একশো বছর জুড়ে চলেছে অরাজকতা। বাঙলার ইতিহাসে এই যুগটাই মাৎস্য ন্যায়ের অধ্যায় বলে খ্যাত। এ সময়ই তিব্বত, কাশ্মীর ও নেপালের সাথে নতুন করে বাঙলার যোগাযোগ স্থাপিত হয়। অষ্টম শতকের মাঝামাঝি যখন পালসাম্রাজ্যের পত্তন হয় তখন দেখা যায় অর্থনৈতিক ও সাংস্কৃতিক জগতেও পরিবর্তন সাধিত হয়েছে নতুন করে। এ সময় গুপ্ত সম্রাটদের কেন্দ্রীভূত রাষ্ট্রযন্ত্রের পরিবর্তে সামন্ত প্রভুরা আসর জাঁকিয়ে বসেছেন। ব্যবসা-বাণিজ্যেরও তখন মন্দাভাব। অপরপক্ষে এ সময়ই দেখা দিয়েছে স্থানীয় ভাষা ও লিখনভঙ্গি, স্থানীয় ধর্ম তথা সংস্কৃতির সুস্পষ্ট সূচনা।

বাঙলাদেশে যখন পাল সাম্রাজ্যের প্রতিষ্ঠা তখন উপমহাদেশের অন্যান্য অঞ্চলে বৌদ্ধ ধর্মের পতনের যুগ শুরু হয়ে গেছে। বাঙলাদেশে অবশ্য বৌদ্ধ ধর্ম আরও তিন-চারশো বছর টিকে ছিল। মহাযানী বৌদ্ধ ধর্মের অনুসারী পাল-চন্দ্র সম্রাটদের পৃষ্ঠপোষকতায় এ সময় গড়ে উঠেছিল অনেকগুলি বিহার-মহাবিহার। সম্রাট ধর্মপালদেব-প্রতিষ্ঠিত বহুখ্যাত বিক্রমশীল মহাবিহার, সোমপুর মহাবিহার, নালন্দা মহাবিহার প্রভৃতি বিহারগুলি সেকালে জ্ঞান-বিজ্ঞান চর্চার কেন্দ্র হিসেবে ব্যাপক প্রসিদ্ধি লাভ করেছিল।

এই সময়েই বাঙলাদেশে বৌদ্ধ ধর্মের নতুন রূপান্তর দেখা যায়। বাঙলার বহু প্রাচীন তান্ত্রিক ধ্যান-ধারণার ছোঁয়াচ লাগে বৌদ্ধ ধর্মে। তান্ত্রিক সাধন পদ্ধতির অনুরূপ মন্ত্রযান, বজ্রযান, সহজযান, কালচক্রযান প্রভৃতি নানা ধরনের মতবাদ-সাধন-ভজন পদ্ধতি গড়ে ওঠে। চর্যাপদের রচয়িতা হিসেবে আমাদের পরিচিত সরহপাদ, লুইপাদ, তিল্লোপাদ, শবরপাদ, কাহ্নুপাদ, ভুসুকু, কুক্কুরীপাদ বা এদেশীয় আলকেমির অন্যতম প্রবক্তা হিসাবে পরিচিত নাগার্জুন প্রভৃতি বৌদ্ধ সিদ্ধাচার্যেরা ছিলেন মহাযান মতের এই বিবর্তনের নায়ক। এঁদের মাঝে আবার অধিকাংশই ছিলেন বাঙলাদেশের অধিবাসী।

এ সময়ই ব্রাহ্মণ্য ধর্মের অঙ্গীভূত প্রাচীন শক্তি ধর্মেও তান্ত্রিক ধ্যান-ধারণা ও সাধন পদ্ধতি ক্রমেই প্রধান হয়ে উঠছিল। বলতে গেলে বৌদ্ধ ধর্মের এই নতুন রূপ ও তান্ত্রিক দেহবাদী শক্তি সাধনার বিশেষ কোন

www.pathagar.com

পার্থক্য ছিল না। ফলে, দুইয়ের মিলনও সহজ হয়ে উঠলো। পাল-সাম্রাজ্যের পর এ দুই ধারার মাঝে পার্থক্য প্রায় রইলো না। দু'ইয়ে মিলেমিশে কৌল ধর্ম, নাথ ধর্ম, অবধূত ধর্ম, সহজিয়া প্রভৃতি সাধন পদ্ধতি ছড়িয়ে পড়লো ব্যাপক লোকসমাজে। সুপ্রাচীন কৌম-যুগের ধারণা বিশ্বাস রীতি-পদ্ধতিসমূহের বৌদ্ধ ধর্মের সংমিশ্রণে গঠিত নতুন মতবাদ সহজেই শিকড় গাড়লো সমাজের গভীরে। এই সাধন-ভজন পদ্ধতি বাঙলার নিজস্ব বৈশিষ্ট্য। তাই বাঙলা সাহিত্যের সাথেও তার গভীর সংযোগ। বাঙলার বাউলরাই আজ পর্যন্তও সে যুগের বৌদ্ধ সিদ্ধাচার্য-দের ধারণা ও সাধন পন্থা অনেকাংশে বাঁচিয়ে রেখেছেন।

বাঙলাদেশে আর্য ব্রাহ্মণ্য ধর্মের প্রসার কিছুটা উল্লেখযোগ্যভাবে শুরু হয় গুপ্ত আমল থেকে। এ সময় থেকেই ব্রাহ্মণেরা ক্রমেই বেশী সংখ্যায় বসবাস শুরু করেছেন। রাজা-রাজপুরুষরা তাঁদের ভূমি দান করেছেন। পাল-চন্দ্র পর্বে এবং তারও পরে সেন-বর্মন আমলে ব্রাহ্মণদের উদ্দেশ্যে এই দান-ধ্যান অনেক বেড়ে যায়। সমাজে তাদের প্রভাব বেড়ে যায় সেই পরিমাণে।

গুপ্ত আমলে বাঙলাদেশ সাম্রাজ্যের অঙ্গীভূত হলো। এই সাম্রাজ্যের বিস্তৃতি ছিল উপমহাদেশের একটা বিরাট অংশ জুড়ে। এ সময় সর্ব-ভারতীয় ধর্ম ও সংস্কৃতির স্রোতও তাই বাঙলার বুকে আছড়ে পড়লো সবেগে। বিভিন্ন শাখার বৈদিক ব্রাহ্মণেরা বৈদিক দেব-দেবীদের পূজো-আর্চা, যাগ-যজ্ঞ সাথে নিয়ে বাঙলায় এলেন বসবাস করতে। বাঙলার পূর্বতম প্রান্তে এই ধর্মের ধাক্কা লাগলো। গ্রামে গ্রামে ব্রাহ্মণদের বস-বাসের সাথে প্রতিষ্ঠিত হলো টোল-চতুষ্পাঠী। ধর্ম চর্চার সাথে চললো বেদ-বেদান্ত-সংস্কৃত চর্চা।

কিন্তু লোকায়ত জীবনের দিক থেকে আর্য ব্রাহ্মণ্য ধর্মের মাঝে বৈদিক ধর্মের প্রসারের চেয়ে বেশী তাৎপর্যপূর্ণ ছিল পৌরাণিক ধর্ম ও সংস্কৃতির প্রসার। বস্তুতঃপক্ষে এই পৌরাণিক ধর্মই ক্রমে বাঙলার জন-সমাজে ব্যাপকভাবে প্রসার লাভ করেছিল।

বিষ্ণু পূজার প্রমাণ পাওয়া যায় খ্রীস্টীয় চতুর্থ শতকে বাঁকুড়ার শুশুনিয়া গিরি-গহ্বরে খোদিত বিষ্ণু-চক্র থেকে। পঞ্চম থেকে সপ্তম শতকের মাঝে প্রতিষ্ঠিত হতে দেখা যায় বেশ কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ বিষ্ণু

www.pathagar.com

মন্দির। তাদের মাঝে দুটি—গোবিন্দস্বামী ও কোকামুখ স্বামীর মন্দির প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল উত্তর-বাঙলার দুর্গম পার্বত্য অঞ্চলে। ষষ্ঠ শতকে প্রদ্যুম্নেশ্বরের মন্দির প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল ত্রিপুরায়। ক্রমে পৌরাণিক বিষ্ণু সপরিবারে তাঁর সব কটি রূপ নিয়ে বাঙলাদেশে আসর জাঁকিয়ে বসছিলেন। পাল-চন্দ্র পর্বে এবং সেন-বর্মন আমলে তো কথাই নেই। পাহাড়পুরের বৌদ্ধ মঠে যে মৃৎফলকগুলি পাওয়া গেছে সেখানে পৌরাণিক কৃষ্ণ-চরিতের বিভিন্ন ঘটনার চিত্র দেখে সেকালে পৌরাণিক বিষ্ণুর লোকপ্রিয়তা সম্পর্কে আঁচ করা যায়।

শৈব ধর্মের সাথে প্রাচীন কৌম সমাজের যোগাযোগ অনস্বীকার্য এবং প্রায় প্রত্যক্ষ হলেও বাঙলাদেশে মহারাজ বৈন্যগুপ্ত এবং পরে সপ্তম শতকে শশাঙ্কের পৃষ্ঠপোষকতায় বাঙলাদেশে যে শৈব ধর্ম প্রসার লাভ করে তা পুরোপুরি পৌরাণিক।

গুপ্ত আমলে যেমন গোটা ভারতে তেমনি বাঙলাদেশেও গণেশের, বিশেষ করে হস্তিমুখ গণেশের মূর্তির ছড়াছড়ি দেখা যায়। তবে শৈব বা শাক্ত সম্প্রদায়ের মতো আলাদা কোন গাণপত্য সম্প্রদায়ের অস্তিত্ব বাঙলাদেশে দেখা যায় না।

পাল-চন্দ্র রাজারা বৌদ্ধ ধর্মাবলম্বী ছিলেন এবং বৌদ্ধ ধর্মের পৃষ্ঠপোষকতাও করতেন। কিন্তু সে সময়ে সমাজে প্রতিষ্ঠিত আর্য ব্রাহ্মণ্য ধর্ম বা সংস্কারকে অস্বীকার করতে পারেননি। অনেক সময়ই তাঁদের মন্ত্রীরাও হতেন ব্রাহ্মণ। বিয়ের সূত্রে আত্মীয়তা হতো আর্য ব্রাহ্মণ্য ধর্মাবলম্বীদের সাথে।

এ সময়ে বাঙলাদেশে পৌরাণিক দেব-দেবীর পুজো-আর্চা আরও বিস্তৃত হলো। এ যুগে পৌরাণিক দেব-দেবীর মূর্তিও পাওয়া গেছে প্রচুর। ব্রাহ্মণদের মাধ্যমে রামায়ণ-মহাভারত-পুরাণেরও প্রসার ঘটেছে সমাজে। বিভিন্ন পৌরাণিক দেব-দেবীকে কেন্দ্র করে গড়ে উঠেছে বিভিন্ন সম্প্রদায়। বিষ্ণুকে কেন্দ্র করে বৈষ্ণব বা ভাগবতরা রীতিমতো শক্তিশালী হয়ে উঠেছে। শিবমূর্তির রূপ কল্পনায় দেখা দিয়েছে বৈচিত্র্য। বস্তুলিঙ্গ ও মুখলিঙ্গ রূপী শিব মূর্তির পাশাপাশি দেখা দিয়েছে নটরাজ-শিব, অর্ধ-নারীশ্বর-শিব, উমা-মহেশ্বর, শিব-বিবাহের মূর্তি।

www.pathagar.com

সেন-বর্মন আমলে পৌরাণিক ধর্মের এই প্রভাব আরও দৃঢ়মূল হলো। রাষ্ট্রশক্তি ও সামন্ত প্রভুদের প্রত্যক্ষ সহায়তা ও পৃষ্ঠপোষকতায় আর্য ব্রাহ্মণ্য সংস্কার, ছোঁয়াছুঁয়ি, জাত-বিচারের সমস্ত বিধান নিয়ে বর্ণভেদ প্রথা এঁটে বসলো সমাজের উপর। একদিকে ব্যবসা-বাণিজ্যে তখন চলছে মারাত্মক রকম মন্দার যুগ। সমাজে সামন্ত প্রভুদের অপ্রতিহত প্রতাপ। ভাব জগতে কঠোর স্মৃতি শাসন—পৌরাণিক ধর্মের অসংখ্য দেব-দেবীর পূজায় মানুষের মন আচ্ছন্ন—ভারগ্রস্ত।

বৌদ্ধ ও ব্রাহ্মণ্য ধর্মের সংঘাত দীর্ঘকাল ধরে চলার পর এ সময় তাও ক্রমেই তিরোহিত হয়ে আসছিল। বুদ্ধদেব তখন বিষ্ণুর অবতার হিসেবে গৃহীত হয়ে প্রতিষ্ঠিত হয়ে গেছেন। বৌদ্ধ-তান্ত্রিক সাধনা ব্রাহ্মণ্য-তান্ত্রিক সাধনার সাথে মিলে-মিশে একাকার হয়ে গেছে। সমাজ তার গতিবেগ হারিয়ে আর্য-ব্রাহ্মণ্য পৌরাণিক সংস্কারের নীচে চাপা পড়েছে।

www.pathagar.com

তেরো

মানস-চরিত : সাহিত্য-শিল্পকলা-ভাস্কর্য

সাহিত্য

ভাষা প্রসঙ্গে আলোচনায় আমরা দেখেছি আর্য ভাষার প্রসারের আগে এদেশে একেবারে আদিতে যে ভাষা চালু ছিল তা হলো মন্‌খ্‌মের ও কোল মুণ্ডা ভাষা-পরিবারের আত্মীয় অষ্ট্রিক ভাষা। পরবর্তীকালে তার সাথে যুক্ত হলো দ্রাবিড়-ভাষী কৌমদের ভাষা। উত্তর বাঙলায় যুক্ত হলো প্রাচীন কিরাতদের ভাষা—ভোট-ব্রহ্ম। বিভিন্ন কৌম বিভিন্ন ভাষায় কথা বলতো, নিজেদের মাঝে ভাবের বিনিময় করতো। সে যুগেও তাদের সঙ্গীত-গাথা ইত্যাদি রচিত হয়েছিল নিশ্চয়ই। সেগুলি হয়তো লোকমুখে বংশপরম্পরাক্রমে মানুষের মনে আশা-কামনার উদ্রেক করতো। সেকালে লেখার কোন উপায় ছিল না, স্থায়িভাবে তাদের সেই সৃষ্টিকে ধরে রাখার উপায় ছিল না। কোন লিপি ছিল না তাদের। তাই সে যুগের সৃষ্টি সম্পর্কে আজকে কোন কিছুই জানার উপায় নেই। তবে পৃথিবীর বিভিন্ন জায়গায়, উপমহাদেশের বিভিন্ন অংশে আজও কৌম সমাজের যে নিদর্শনসমূহ টিকে আছে তাদের দৃষ্টান্ত দেখে মনে হয় এদেশে আমাদের পূর্বপুরুষরাও সেকালে গান গাইতেন—লোকের মুখে মুখে রচিত হতো সঙ্গীত-গাথাসমূহ।

ক্রমে এ দেশে আর্যভাষা প্রসার লাভ করলো। ধাপে ধাপে বিভিন্ন স্তর অতিক্রম করে আগের ভাষাসমূহকে অপসারিত করার সময় তাদের শব্দসম্ভার ও গঠন-প্রকৃতির অনেক কিছু অংগীভূত করে নিয়ে আমরা পেঁছিলাম বাঙলা ভাষার আঙ্গিনায়। ভাষা বিবর্তনের এই ইতিহাস পূর্বে আলোচিত হয়েছে। এবার এই যুগের সাহিত্যিক সৃষ্টির রূপ-রেখার সাথে পরিচয়।

মৌর্য আমল বা তার কিছু আগে থেকেই বাঙলাদেশে আর্য ভাষার স্রোত সবেগে আছড়ে পড়ছিলো। উত্তরাপথের বিভিন্ন অঞ্চল থেকে আর্য ভাষা-ভাষী বণিক-সার্থবাহ-বৌদ্ধশ্রমণ-ব্রাহ্মণেরা বাঙলাদেশের বিভিন্ন

www.pathagar.com

অঞ্চলে ছড়িয়ে পড়ছিলেন। মৌর্যাধিকারের পর আর্য ভাষা রাজকীয় ভাষার সম্মান পেয়েছিলো। ক্রমে সমাজেও তা গৃহীত হচ্ছিলো। মহাস্থানে যেই যুগের যে লিপিটি পাওয়া গেছে তা এতদঞ্চলে প্রচলিত প্রাকৃতে রচিত। এ ছাড়া বাঙলাদেশে এ যুগের আর কোন লিপি বা সাহিত্যকর্মের কোন নিদর্শন আজ পর্যন্ত আবিষ্কৃত হয়নি। কোথাও কোন উল্লেখ থেকেও এ সম্পর্কে কিছু জানা যায় না। তবে আগের মতোই এ যুগের লোকও নিশ্চয়ই তাদের আশা-আকাঙ্ক্ষা, কামনা-বাসনা ব্যক্ত করতো নানাভাবে। তাদের মাঝেও নিশ্চয়ই প্রচলিত ছিল নানা কাহিনী, নানা সংগীত। অবশ্য এ সবই অনুমান। এই অনুমান ছাড়া এ যুগ সম্পর্কে কোন কিছু বলার উপায় নেই।

পঞ্চম-ষষ্ঠ শতকে, গুপ্ত-আমলে সংস্কৃত রীতিমতো রাজকীয় মর্যাদায় সমাসীন। পণ্ডিত-বিদগ্ধ ব্যক্তিরা লেখায় সংস্কৃত ব্যবহার করেন, রাজকীয় অনুজ্ঞা সংস্কৃতে প্রচারিত হয়। সংস্কৃতে নাটক, কাব্য ইত্যাদি রচিত। এক কথায় অভিজাত মহলে তখন সংস্কৃতের জয়-জয়কার। এ সময়েও বাঙলায় যে ক'টি লিপি পাওয়া গেছে—সেগুলি খাঁটি মধ্যভারতীয় সংস্কৃতে রচিত। পরবর্তীকালের বিখ্যাত গৌড়ী রীতি তখনো দানা বাঁধেনি। বাঙলাদেশ তখনো এই ক্ষেত্রে তার নিজস্ব বৈশিষ্ট্যটি খুঁজে পায়নি। লিপিগুলি দেখে তা বোঝা যায়। অবশ্য লিপিগুলি ছাড়া আর কোন সাহিত্যকর্মের নিদর্শন এ যুগেও মেলে না। ব্যাপক লোকায়ত সমাজে ব্যাপারটা ঠিক কি ধরনের ছিল তাও জানার উপায় নেই।

সপ্তম শতকে হিউএন-থ্‌সাঙ যখন এদেশে আসেন তখন তিনি বাঙলাদেশ ঘুরে এদেশবাসীর জ্ঞান-স্পৃহা ও জ্ঞানচর্চার কথা বার বার উল্লেখ করেছেন। এ যুগে বৌদ্ধ মঠগুলি ছিল জ্ঞানচর্চার কেন্দ্র। এখানে বৌদ্ধ শাস্ত্র অনুশীলন ও বৌদ্ধ ধর্ম চর্চা ছাড়াও ব্যাকরণ, শব্দবিদ্যা, চিকিৎসা বিদ্যা, দর্শন, সঙ্গীত, চিত্রকলা, জ্যোতির্বিদ্যা, বৌদ্ধ ধর্মীয় দার্শনিক মতবাদসমূহ নিয়ে আলোচনা হতো, চর্চা হতো ব্যাপকভাবে। নালন্দায় ছিল এ যুগের সবচেয়ে বিখ্যাত মহাবিহার। এখানে শ্রমণ সংখ্যা ছিল দশ হাজার। হিউএন-থ্‌সাঙও এই মহাবিহারে সমতটের বাঙালী রাজবংশের সন্তান মহাচার্য শীলভদ্রের কাছে শিক্ষা গ্রহণ করেছিলেন। বৌদ্ধ বিহার-মহাবিহারসমূহে এই একনিষ্ঠ সাধনার ফলও ফলতে শুরু করে এ

www.pathagar.com

সময়। এ যুগে বাঙালী পণ্ডিতদের সংস্কৃত রচনায় আগের সেই আড়ষ্টতা আর নেই। তার জায়গায় রীতিমতো অলঙ্কারবহুল কাব্যরীতি দানা বেঁধে উঠেছে—সৃষ্টি হয়েছে বিখ্যাত গৌড়ী রীতি। তৎকালীন ভারতে কাব্য রচনার যে ক'টি রীতি প্রচলিত ছিল তার মাঝে গৌড়ী রীতির স্থান কোন অংশে ন্যূন ছিল না। এই রীতির প্রধান লক্ষণ ছিলো তার অর্থ, অলঙ্কারপ্রিয়তা ও অনুপ্রাসের ছড়াছড়ি। সংস্কৃতে হলেও বাঙলার ইতিহাসে গৌড়ী রীতির সৃষ্টি বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ। সপ্তম শতকের কিছু আগ থেকেই গৌড়-বঙ্গ তার স্বাতন্ত্র্য সম্পর্কে ক্রমেই সচেতন হয়ে উঠছিল। সপ্তম শতকে গৌড় জনপদকে কেন্দ্র করে শশাঙ্কের নেতৃত্বে প্রতিষ্ঠিত হল স্বাধীন স্বতন্ত্র রাষ্ট্র। ভাষার ইতিহাসেও এই যুগটা বিশেষ উল্লেখযোগ্য। সাহিত্যের ক্ষেত্রেও এ সময় সর্বভারতীয় রীতির বাইরে স্বাতন্ত্র্য দেখা দেয়—গৌড়ী রীতি তারই সাক্ষ্য।

বাঙালীরা ব্যাকরণ চর্চায় চিরকালই বড়। এ ব্যাপারে তাদের নামডাক বেশ প্রাচীন। বরেন্দ্রীর অধিবাসী চন্দ্রগোমী এ সময়ই তাঁর ব্যাকরণ রচনা করেন। দর্শন চর্চায় বাঙলার যে বৈশিষ্ট্য তাও এ সময়ই পরিস্ফুট হয়ে উঠতে থাকে। গৌড় দেশের বাসিন্দা শঙ্করাচার্যের গুরুর গুরু গৌড়পাদ এই সময়ই তাঁর বিখ্যাত 'কারিকা' রচনা করেন। বাঙলাদেশ বরাবরই হাতীর জন্য বিখ্যাত। গ্রীক ঐতিহাসিকেরাও এ ব্যাপারটির উল্লেখ করেছেন। তারও আগে মহাভারতে এই বিষয়টি নানাভাবে উল্লিখিত হয়েছে। এই হাতীকে কেন্দ্র করেই সেকালে বাঙলাদেশে হাতীর চিকিৎসার জন্যে আয়ুর্বেদ শাস্ত্রের রীতিমতো আলাদা একটি শাখা গড়ে উঠেছিল। এই সংক্রান্ত সপ্তম শতকে রচিত যে গ্রন্থটির সাথে আমাদের পরিচয়, যতদূর মনে হয় সেটি আরও পুরানো কোন গ্রন্থ অবলম্বনে ব্রহ্মপুত্রের কাছাকাছি কোন জায়গায় রচিত।

বৌদ্ধ ধর্মাবলম্বী পাল-চন্দ্র রাজাদের আমলেই বাঙলাদেশের লোকসমাজে ব্রাহ্মণ পণ্ডিতরা দৃঢ়মূল হয়ে আসন গেড়েছেন। কিছুকাল আগ থেকে যে সংস্কৃত চর্চার শুরু তা এ সময় আরো ব্যাপক হয়ে উঠেছে। ব্রাহ্মণ পণ্ডিতরা গ্রামে গ্রামে টোল-চতুষ্পাঠী খুলে সংস্কৃত চর্চা ও শাস্ত্র আলোচনার আসর জমিয়েছেন। সংস্কৃতের প্রকাশভঙ্গী আরও সূক্ষ্ম আরও সুকুমার হয়ে উঠেছে। উচ্চ বর্ণের মাঝে সীমাবদ্ধ হলেও একটি

www.pathagar.com

সংস্কৃত-শিক্ষিত সমাজও তৈরী হয়েছে এ সময়। এখন পর্যন্ত ধর্ম-দর্শন-অলঙ্কার-চিকিৎসাবিদ্যা প্রভৃতিও লেখা হচ্ছে সংস্কৃতে। ফলে তাও অভিজাত উচ্চ বর্ণের মাঝেই সীমাবদ্ধ থাকছে। ব্যাপক লোকায়ত সমাজে ছড়িয়ে পড়ে তাদের বিশ্বাস ও মানস জগতকে প্রত্যক্ষভাবে প্রভাবিত করতে পারছে না। অবশ্য এই রচনাসমূহ ব্যাপক জনসমাজকে যে একেবারে প্রভাবিত না করতো তা নয়—ধর্মীয় প্রভাবের সাথে সমাজের উচ্চকোটির চিন্তা নীচের দিকে ছড়িয়ে পড়তো। কিন্তু সংস্কৃত ছিল ব্যাপক লোক-সমাজের কাছে অগম্য জগৎ। তাই উচ্চকোটির চিন্তার প্রভাবও ছিল অপ্রত্যক্ষ। সমাজের সবাই মোটামুটি একই ভাষায় কথা বললেও উচ্চ কোটির লিখিত ভাষা এবং সমাজের অন্যান্যের লিখিত ভাষা ছিল পৃথক। সমাজের উচ্চকোটি ও অন্যান্যের মাঝে যে স্বাভাবিক ব্যবধান তার উপর ছিল এই পার্থক্য এবং তা দুয়ের মাঝে ব্যবধানকে সে যুগেই আরও দুস্তর করে তুলেছিল।

এ যুগেও সংস্কৃতে জ্ঞান-বিজ্ঞান চর্চা করেছেন বৌদ্ধ আচার্যরাই। ব্যাকরণ রচনা করেছেন মৈত্রেয় রক্ষিত ও জিনেন্দ্রবুদ্ধি, চিকিৎসা শাস্ত্রে গোটা ভারতে খ্যাতি অর্জন করেছেন, আয়ুর্বেদ শাস্ত্র সম্পর্কে নানা বই লিখেছেন বাঙালী চক্রপাণি দত্ত, জ্যোতিষ শাস্ত্র সম্পর্কে বই লিখেছেন ব্যাঘ্রতটির কল্যাণ বর্মা। ক্রমান্বয়ে শান্তি রক্ষিত, সরোরুহ বজ্র, কমল-শীল, জেতারি, দীপঙ্কর, শ্রীজ্ঞান, জ্ঞানশ্রী মিত্র, অভয়াকর গুপ্ত, দানশীল, বিভূতিচন্দ্র প্রমুখ খ্যাতনামা বৌদ্ধ আচার্যেরা বৌদ্ধ শাস্ত্র-দর্শন ও জ্ঞান-বিজ্ঞানের বিভিন্ন শাখায় নানা গ্রন্থ রচনা করে বাঙালীর জ্ঞান সমৃদ্ধ করেছেন এ সময়। বেদান্ত দর্শন নিয়েও এ সময়ই সেকালের বিখ্যাত দার্শনিক শ্রীধর ভট্ট লিখেছেন 'ন্যায় কন্দলী'। তিনি মীমাংসা শাস্ত্রেও আরও ক'খানি পুঁথি লিখেছিলেন। সেগুলির উল্লেখ ছাড়া আজকাল আর কিছুই পাওয়া যায় না। বেদান্তের চেয়ে ন্যায় বৈশেষিক শাস্ত্রের চর্চা বাঙলাদেশে বেশী হয়েছে। গৌড়ের অভিনন্দ ছিলেন ন্যায়শাস্ত্রে সুপণ্ডিত। তিনিও এ সময়ই তাঁর গ্রন্থ রচনা করেছেন।

যদিও সংস্কৃতে তবু সাহিত্যের ক্ষেত্রেও বাঙালীরা এ সময় যথেষ্ট সাফল্য অর্জন করেছেন। বাঙালী কবি গৌড়-অভিনন্দ রচনা করেছেন

www.pathagar.com

কাদম্বরী কথাসার ও রামচরিত। তারও পরে রামপালের ও তাঁর উত্তরাধিকারীদের জীবন অবলম্বনে সন্ধ্যাকর নন্দী রচনা করেছেন বিখ্যাত দ্ব্যর্থবোধক কাব্য রামচরিত। বাঙালী নাট্যকারেরা এ সময় বেশ কয়েকটি নাটকও লিখেছেন। এদের মাঝে কৃষ্ণ মিশ্রের প্রবোধচন্দ্রোদয় ও নীতিবর্মার কীচক বধ সর্মাধিক প্রসিদ্ধ।

কবীন্দ্রবচনসমুচ্চয় একাদশ-দ্বাদশ শতকের আদি বাঙলা হরফে লেখা সংস্কৃত কবিতা সংগ্রহের একটি পুঁথি। এটিতে মোট একশো এগারো জন কবির কবিতা সংকলিত হয়েছে। এদের মাঝে অনেকেই ছিলেন বাঙালী যেমন : গৌড়-অভিনন্দ, বিম্বোক, ধর্মকর, বুদ্ধাকর গুপ্ত, মধুশীল, বিনয় দেব, বীট মিত্র, বৈদ্দোক, সংকর, শ্রীধর নন্দী প্রমুখ। মহাকাব্যের চেয়ে এ সময়ের শিক্ষিত বাঙালীরা ছোট ছোট শ্লোক, সংক্ষিপ্ত সংস্কৃত কবিতা, অপভ্রংশ বা প্রাকৃতে রচিত পদাবলী পড়তে ভালবাসতেন। সংস্কৃতে রচিত হলেও সেকালের বাঙালীর জীবনযাত্রা, তাদের চিন্তা-ভাবনা, বাঙলার প্রাকৃতিক রূপের চমৎকার ছবি ফুটে উঠেছে এই কবিতাগুলিতে।

সংস্কৃতে অভিজাতদের সাহিত্য চর্চার পাশাপাশি সাহিত্যের লোকায়ত ধারাটিও নিশ্চয়ই দীর্ঘকাল ধরে চলে আসছিলো। এ সময় তার সুস্পষ্ট প্রকাশ দেখা যায়। সংস্কৃত ছাড়াও এ সময় আরো দুটি ভাষায় পদগীত ইত্যাদি রচিত হত। ভাষা দুটি ছিল সবার বোধগম্য শৌরসেনী অপভ্রংশ ও মাগধী অপভ্রংশের গৌড়বঙ্গীয় রূপ। আদি বাঙলাও এ সময়ই ক্রমে রূপরেখায় ফুটে উঠছিলো। বৌদ্ধ সিদ্ধাচার্য্যরা আদি বাঙলা ও অপভ্রংশে পদ রচনা করতেন। বৌদ্ধ সিদ্ধাচার্য্যদের প্রচলিত মতবাদ লোকায়ত সমাজেই বেশী পরিব্যাপ্ত হয়েছিল। প্রধানতঃ সমাজের নীচু বর্ণের ও অন্ত্যজ শ্রেণীর লোকেরাই তাঁদের অনুসারী ছিলেন। কৌম জীবনের স্মৃতির অপেক্ষাকৃত প্রত্যক্ষ যোগই বোধ হয় এর কারণ। সাধারণ লোকের ভাষায় তাদের মাঝে পরিব্যাপ্ত মতবাদ আশ্রয়ে রচিত বলে তাঁদের লেখায় সে যুগের লোকায়ত জীবনযাত্রারও ছবি ফুটেছে—গুহ্য ধর্মীয় সংকেতময়তা সত্ত্বেও ব্যক্ত হয়েছে তাঁদের কামনা। এজন্যেই চর্যাপদগুলি বাঙলার লোকায়ত সাহিত্যের আদিলিখিত নিদর্শন। আবার এগুলিই বাঙলা সাহিত্যের প্রাচীনতম নিদর্শনও বটে। যোগাযোগটা উল্লেখযোগ্য ও গুরুত্বপূর্ণ সন্দেহ নেই।

www.pathagar.com

চর্যাপদগুলি মাত্রাবৃত্ত ছন্দে লেখা গান ; পংক্তির শেষে মিল। বাঙলা কাব্যের বিশিষ্ট ছন্দ পয়ার বা লাচাড়ীর উৎস এখানে। পরবর্তী যুগের বৈষ্ণব পদাবলীর পূর্বসূরী হলো এগুলি। এগুলি ছাড়াও লোকায়ত সমাজে আরও নানা ধরনের কাহিনী-রূপকথা প্রভৃতিও নিশ্চয়ই প্রচলিত ছিল। মধ্যযুগের মনসা-মঙ্গল, চণ্ডী-মঙ্গল কাব্যে মনসা বা চণ্ডী এবং সদাগরদের যে প্রতাপ ও সমৃদ্ধি তাতে এই কাহিনীগুলি এ সময়ের বা তারও কিছু আগেকার সমাজচিত্র বলে মনে হয়। পরবর্তীকালে এই পুরানো কাহিনীগুলি অবলম্বনে কাব্য রচিত হয়েছে।

পাল-চন্দ্র পর্বে বা তারও আগে বৌদ্ধ আচার্য বা ব্রাহ্মণ পণ্ডিতেরা সংস্কৃতে যে জ্ঞান-বিজ্ঞান চর্চা বা সাহিত্য সৃষ্টি করেছেন তা শিক্ষিত উচ্চবর্ণের মাঝে সীমাবদ্ধ থাকলেও এবং রাজানুগ্রহে বৌদ্ধ-বিহারসমূহের ব্যয় নির্বাহ হলেও এঁদের সবাই সরাসরি রাজপ্রসাদোজীবী ছিলেন না। ক্রমে অবশ্য সমাজে সামন্ত প্রভুদের ক্ষমতা বৃদ্ধির সাথে রাজদরবার এবং রাজপ্রশস্তি সাহিত্যের উপজীব্য হয়ে দাঁড়াচ্ছিলো। রামপালের সান্ধি-বিগ্রহিক প্রজাপতি নন্দীর পুত্র সন্ধ্যাকর নন্দীর রচনাই তার প্রমাণ। ফলে রচনার কৃত্রিমতা ও সীমাবদ্ধতা দেখা দিচ্ছিলো অবশ্যম্ভাবীরূপে। তবু এ সময় বহু সংস্কৃত কবিতায় সে যুগের সাধারণ মানুষের দুঃখ-বেদনার ছবিরও সন্ধান পাওয়া যায়। তাদের দীর্ঘশ্বাস শত শতাব্দী অতিক্রম করে কানে এসে বাজে। সেন-বর্মণ আমলে অবস্থাটা পুরোপুরিই বদলে গেল।

এ সময় রাষ্ট্রে বৃদ্ধি পেল সামন্ত প্রভুদের প্রতাপ। বর্ণভেদ প্রথা চেপে বসলো সমাজের বুকে। আর্য্য-ব্রাহ্মণ্য সংস্কার গেঁথে বসলো লোকের মনে। জ্ঞান-বিজ্ঞান, সাহিত্য চর্চাও এর প্রভাবমুক্ত রইলো না। সাহিত্য-চর্চার প্রধান কেন্দ্র হলো রাজসভা, জ্ঞান-বিজ্ঞান চর্চার ক্ষেত্রে প্রাধান্য পেল স্মৃতিশাস্ত্র, রাজপ্রসাদোপজীবীরা ক্রমে সরাসরি সমাজের চিন্তানায়-কের আসন দখল করে বসলেন।

এ যুগের ব্রাহ্মণ্য স্মৃতিশাস্ত্রের একজন বিখ্যাত রচয়িতা কুমারিল ভট্টের মীমাংসা শাস্ত্রের প্রসিদ্ধ টীকাকার ভবদেব ভট্ট ছিলেন হরি বর্মা

www.pathagar.com

এবং খুব সম্ভবতঃ তাঁর পুত্রের মহাসান্ধিবিগ্রহিক। ব্রাহ্মণ্য-ধর্মের বিভিন্ন শাখায় তাঁর জ্ঞান ছিল গভীর। সচেতনভাবে স্মৃতিশাস্ত্রের প্রচারে মনোনিবেশ করেছিলেন তিনি। একই বিষয়ে এই যুগের আর দু'জন বিখ্যাত শাস্ত্রকার ছিলেন বল্লাল সেন নিজে ও হলায়ুধ। হলায়ুধ প্রথম জীবনে ছিলেন রাজপণ্ডিত, পরে লক্ষণ সেনের মহামাত্য, ধর্মাধ্যক্ষ, মহাধর্মাধ্যক্ষ।

দর্শন চর্চা, আয়ুর্বেদ, অর্থশাস্ত্রের চর্চায় বাঙালীর নাম এর আগের যুগে গোটা ভারতময় ছড়িয়ে পড়েছিলো। এ যুগের যে সব পুঁথি পুস্তকের কথা জানা গেছে তাতে মনে হয় এসব শাস্ত্রের চর্চা এ সময় একেবারেই কমে গিয়েছিলো। জ্ঞান-বিজ্ঞানের যেটুকু চর্চা তা সবই ব্রাহ্মণ্য ধর্মের সাথে সংযোগ রেখে, তার প্রভাব বৃদ্ধির উদ্দেশ্যে—বড়জোর কিছু ব্যাকরণ আর জ্যোতিষশাস্ত্র এই পর্যন্ত। আগের যুগে জ্ঞান-বিজ্ঞান চর্চার কেন্দ্র ছিল বৌদ্ধবিহার মহাবিহারগুলি। এ যুগে সে সবের পাট উঠে গেল। তার জায়গায় রাজদরবারের সাথে সংশ্লিষ্ট উচ্চকোটির লোকেরা, স্থানবিশেষে রাজা নিজে আসর জাঁকিয়ে বসলেন। সবদিক দিয়ে সামন্ত প্রভুদের স্বার্থ রক্ষার আঁটোসাঁটো ব্যবস্থা করা হলো। ব্যবস্থা করা হলো জাতিকে মরমে মেরে রাখার।

সাহিত্যের ক্ষেত্রে এ যুগের প্রসিদ্ধ কবি, সেন-রাজসভার অলংকার কবি শরণ, ধোয়ী, গোবর্ধন, উমাপতিধর ও জয়দেব। এঁদের রচনায় রচনারীতির চাতুর্য, শব্দ-প্রয়োগের লালিত্য, ছন্দের মনোহারিত্ব ছিল, কিন্তু না ছিল গভীরতা, না ছিল কল্পনার বিস্তার। বিখ্যাত কাব্য গীতগোবিন্দই তার দৃষ্টান্ত। সমাজের সর্বক্ষেত্রে যে অবক্ষয়, সাহিত্যও তার ছোঁয়ার বাইরে ছিল না। সবকিছু ছাপিয়ে উঠছিলো দেহসর্বস্বতা। এঁরা ছাড়া আর যাঁদের কথা জানা যায় তাঁদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য নাম হলো নৈষধ চরিতের রচয়িতা শ্রীহর্ষের। অনেকে তাঁকে বাঙালী বলে অনুমান করেন। তাঁর রচনায় বাংলার সমাজ জীবনের চিত্র দেখে এই অনুমান সত্য বলেই মনে হয়। সদুক্তিকর্ণামৃত এ যুগের একটি কাব্য সংকলন। সংকলয়িতা লক্ষণ সেনের মহাসামন্ত বটুদাসের পুত্র দীর্বর দাস। এতে যে ৪৮৫ জন কবির কবিতা সংকলিত হয়েছে তাঁদের মাঝে অনেকেই বাঙালী। শরণ, জয়দেব

www.pathagar.com

প্রমুখ পাঁচজন কবি ছাড়া অন্যান্যের মাঝে লক্ষণ সেন ও কেশব সেনের কবিতাও সংকলিত হয়েছে।

সাহিত্যের অন্যান্য শাখার মাঝে এ যুগে রচিত বেশ কিছু নাটকের সন্ধান পাওয়া যায়। বিষয়বস্তু প্রায়ই রামায়ণ-মহাভারত-পুরাণ থেকে নেওয়া।

সিদ্ধাচার্যদের রচনায় আগের যুগে সাহিত্যের লোকায়ত ধারার যে বলিষ্ঠ সূচনা হয়েছিল এ যুগে তা সেভাবে অব্যাহত ছিল কি-না জানা যায় না। এ যুগের যেটুকু খোঁজ-খবর আমরা জানতে পারি তা সবই রাজ-সভাকেন্দ্রিক। লোকায়ত সমাজের গভীরে তাদের রচনা, গান ও কাব্য সম্পর্কে প্রায় কিছুই জানা যায় না। তবে সেন আমলের অল্প কিছুদিন পরই সহজিয়া কবি বড়ুচণ্ডীদাসের সাক্ষাৎ পাই আমরা। একই সময় একই ধারার আরো অনেকের কথা জানতে পারি। তা থেকে মনে হয়, সিদ্ধাচার্যরা যে ধারার সূত্রপাত করেছিলেন সমাজের গভীরে তা অব্যাহত ছিল এবং এই অব্যাহত প্রচেষ্টায়ই পরবর্তীকালে বাংলা ভাষায় কাব্য রচনায় সহজিয়া-সাধকদের রচনার মত অমৃত ফল ফলেছিল। এ যুগে পাদপ্রদীপের সামনে যাঁরা অবস্থান করছিলেন, যাঁদের কথা আমরা একটু আগে আলোচনা করলাম তাঁরা সবাই কাব্য রচনা করেছেন সংস্কৃতে। সে সংস্কৃত গোড়ী-রীতির বৈশিষ্ট্যে বিশিষ্ট, ছন্দ-পদ-সাধনারীতি প্রভৃতিতে বাংলার সাথে তার মিল অনেকখানি ঠিকই। কিন্তু তবু সংস্কৃত সংস্কৃতই। বিশেষতঃ এর আগে বাংলায় কাব্য চর্চার তখন সূত্রপাত হয়ে গেছে। বিবর্তনের পথে ভাষা যখন বাংলা ভাষার আঙ্গিনায় পেঁছে গেছে তখন সংস্কৃতে সাহিত্য চর্চা আজকের যুগে বাঙালীর ইংরেজীতে কাব্য চর্চার মতো। তা মুষ্টিমেয় শিক্ষিত অভিজাতদের উদ্দেশ্যেই রচিত। বস্তুতঃ-পক্ষে এ যুগের কীর্তিমান কবিদের মাঝে অনেকে নিজেরাই ছিলেন উচ্চ-কোটির লোক, অন্যেরা উচ্চকোটির মনোরঞ্জন করেছেন। বাংলা ভাষায় কাব্যের সোনালী ফসল তখনো সমাজের ব্যাপক মানুষের প্রচেষ্টায় পরবর্তী-কালে মুকুলিত হবার অপেক্ষা করছিলো। বর্ণভেদ প্রথা তথা সামন্ত-প্রভু-দের দখল পাকাপোক্ত হবার পাশাপাশি, বাংলায় সাহিত্য চর্চার এই লোকায়ত চরিত্রটি বিশেষভাবে লক্ষ্য করার মতো ব্যাপার।

www.pathagar.com

শিল্পকলা ভাস্কর্য-স্থাপত্য

নাচ-গান-শিল্পকলার উৎস সেই আদি কৌম সমাজে। আজকের মতো সেকালে ললিতকলার এই বিভাগগুলি শুধু মানুষের সুখ-দুঃখ-হাসি-কান্না-আবেগ প্রকাশের মাধ্যমই ছিল না—সেদিন তা ছিল তাদের দৈনন্দিন জীবনে বেঁচে থাকার জন্যে যাদু-বিশ্বাসের মতো একটি অত্যন্ত প্রয়োজনীয় ব্যাপারের সাথে সম্পৃক্ত।

বাংলাদেশের কৌম সমাজে সে কালে বিভিন্ন কৌমের মাঝে ঠিক কি ধরনের গান, কি ধরনের নাচ, কি ধরনের শিল্পরীতি প্রচলিত ছিল তা আজ আর জানার উপায় নেই। তবে আমাদের দেশে সমাজ বিকাশের গতি বিচিত্র ও অসম। পুরানো কৌম অতীত মরে গিয়েও ঠিক মরেনি। তার রেশ টিকে আছে। আর এসব কারণে সে যুগের সুর-নাচ-ছবি আঁকার রীতির কিছু কিছু প্রতিধ্বনি টিকে আছে আজও। সতর্ক দৃষ্টি মেলে তাকালে চোখে পড়ে।

বাংলার একেবারে নিজস্ব জিনিস বাউল, ভাটিয়ালী, ঝুমুরের সুর আজও আমাদের মুগ্ধ করে। গ্রামাঞ্চলে প্রচলিত বিভিন্ন সমবেত সংগীত আজও দোলা দেয় আমাদের মনে। এইসব গানের মাঝে আজও টিকে আছে একেবারে সেই প্রাচীন কালের ছোঁয়া। বাংলার ঝুমুর গানের সাথে সাঁওতালী ঝুমুরের মিল তো বিশেষভাবে লক্ষণীয়। বাংলাদেশে ভারতীয় মার্গ সংগীতের ধাক্কা এসে লাগে দশম-একাদশ শতকের আগে। চর্যাগীতি ও গীতগোবিন্দে মার্গ সংগীতের বিভিন্ন রাগ-রাগিনী ও তালের উল্লেখ থেকে দেখা যায়—সে যুগে এ সবের ব্যবহার বেশ ব্যাপকভাবেই চালু হয়েছিল। বৌদ্ধ সিদ্ধাচার্যরাও তা ব্যবহারে ইতস্ততঃ করেননি। তাঁরা এবং জয়দেব যে সব রাগ উল্লেখ করেছেন তাদের মধ্যে শবরী এবং বঙ্গাল রাগ বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। শবরী তো বোধ হয় শবরদের মাঝে প্রচলিত রাগেরই কোন অভিজাত সংস্করণ। বঙ্গাল রাগও এ রকম কোন লোকায়ত রাগ ছিল বলে অনুমান করা হয়।

আমাদের আশপাশে যে সব কৌম সমাজ আজও টিকে আছে তাদের মাঝে প্রচলিত নাচ কিছুদিন আগেও বাংলাদেশের গ্রামাঞ্চলে বিভিন্ন পার্বণ-উৎসব উপলক্ষে প্রচলিত ছিল। যেন চড়কপূজা উপলক্ষে এই

www.pathagar.com

অঞ্চলে প্রচলিত কাচ-নাচ, জারি গানের সাথে নাচ প্রভৃতি থেকে প্রাচীন কৌম সমাজে যে ধরনের নাচ প্রচলিত ছিল তার কিছুটা অনুমান করা চলে। এই লোক-নৃত্যের বিভিন্ন ধারাকে অবশ্য সংস্কার করে নতুনভাবে চালু করার চেষ্টা চলছে—কিন্তু আদিকালে লোক-নৃত্যের যে উৎস ছিল তা গেছে শুকিয়ে। যেটুকুও বা ছিল, গ্রাম সমাজের ইদানীংকার ভাঙ্গনের সাথে সাথে তাও লুপ্ত হতে চলেছে। নাচে লোকায়ত সমাজের সহজ-স্বাভাবিক জীবনের আনন্দময় এই প্রকাশের পাশাপাশি নাগরিক জীবনে অভিজাতদের মাঝে তাদের মনোরঞ্জনের জন্যে বাররামাদের নৃত্য, রাজসভা বা বিত্তবান শ্রেষ্ঠী সার্থবাহদের বাড়ীতে, পরবর্তীকালে ভূম্যধিকারীদের প্রাসাদে নর্তকী-দের নাচের প্রচলন বেশ প্রাচীন কাল থেকে। মন্দিরে দেবদাসীদের নাচের রীতি প্রচলিত হয়েছিল যতদূর মনে হয় কর্ণাটি প্রভাবে। সেন-বর্মণ আমলে তা যথেষ্ট পরিমাণে বৃদ্ধি পায়। স্মৃতিশাস্ত্রকার ভবদেবভট্ট নিজে মন্দির তৈরী করে তাতে একশো জন সুন্দরী দেবদাসী নিযুক্ত করেছিলেন। দশম-একাদশ-দ্বাদশ শতকে নাগরিক সমাজে কিছু সংখ্যক মেয়েরা গানের মতো নাচেরও চর্চা করতেন। জয়দেবের স্ত্রী পদ্মাবতী তো নৃত্যকলায় পারঙ্গমা ছিলেন বলে জানা যায়। প্রাচীন পুঁথিপত্রে বুদ্ধ নাটকের যে উল্লেখ পাওয়া যায় তাতেও নাচ-গান-বাজনার প্রচলন ছিল।

মেয়েলী ব্রতের আলপনায় প্রাচীন কৌম সমাজে প্রচলিত শিল্প রীতির আভাস টিকে আছে আজও। ফরিদপুর, যশোহর প্রভৃতি জায়গায় প্রচলিত পট, কুলা বা পিঁড়িতে ছবি আঁকার রীতি এবং অষ্টাদশ-উনবিংশ শতকের জড়ানো পটের ছবিতেও একই আভাস। আচার্য ক্ষিতিমোহন সেনের মতে বিয়ে প্রভৃতি উৎসবে পিঁড়িতে যে ধরনের ছবি আঁকা হয় তার সাথে পাঞ্জা-বের কাংড়া উপত্যকার বিখ্যাত রীতির সাদৃশ্য চোখে পড়ার মত। এই সাদৃশ্য কি কৌম অতীতের কোন যুগের স্মৃতি বহন করছে? ফাহিয়েনের বিবরণ থেকে জানা যায়, সেকালে তাম্রলিপ্তিতে ছবি আঁকার চল ছিল। তিনি তাম্রলিপ্তিতে ছবি আঁকা শিখেছিলেন। সেকালে বৌদ্ধবিহারগুলিতে অন্যান্য বিষয়ের সাথে চিত্রকলারও অনুশীলন হতো। প্রাচীন কালের চিত্র-শিল্পের যেসব নমুনা আজ পর্যন্ত আবিষ্কৃত হয়েছে তার কোনটিই একা-দশ শতকের আগে নয়। মোট পাওয়া গেছে বিশ-বাইশখানা। সবগুলিই

www.pathagar.com

প্রাচীন চিত্রের রীতিতে আঁকা পুঁথি-চিত্র। একটি ছাড়া সবই বৌদ্ধধর্ম সম্পর্কে।

উপমহাদেশে পাথর খুঁদে মূর্তি তৈরী প্রথম শুরু হয় মৌর্য আমলের কাছাকাছি সময়ে। বাংলার সমতল ভূমিতে চিরকালই পাথরের অভাব। ফলে বাংলাদেশে লোকায়ত স্তরে চিরকালই মাটির আদর। তাল তাল মাটি পুড়িয়ে গ্রামের অজ্ঞাত ও অখ্যাত শিল্পীরা পুতুল গড়তো ; গড়তো গ্রাম্য জীবন-যাত্রার সহজ-সরল চিত্ররূপ। মৃৎশিল্পের এই লোকায়ত ধারাটি আজ পর্যন্তও কম-বেশী পরিমাণে অব্যাহত আছে।

একেবারে প্রাচীনকালে মাটি দিয়ে সেকালের মানুষ কিভাবে তাদের জীবনযাত্রার উপকরণগুলি তৈরী করতো তার কোন নিদর্শন আজ পর্যন্ত পাওয়া যায়নি। যেটা পাওয়া গেছে তা অনেক পরের—পাহাড়পুরের বৌদ্ধ-মঠের ধ্বংসস্তূপ থেকে। বাংলাদেশে পাথর দুষ্প্রাপ্য। তাই রাজ-রাজড়ারা অভিজাতদের পয়সায় তৈরী মন্দির-বিহারের পথ ঢেকে দেবার জন্যেও পাথরের ফলক জোটানো সম্ভব হয়নি। প্রয়োজন হয়েছিল পোড়া মাটির ফলকের। সে জন্যেই প্রয়োজন হয়েছিল গ্রাম্য-শিল্পীদের। ডাক পড়েছিল তাঁদের তাই। তাই অভিজাতদের পয়সায় তৈরী মন্দির গাত্রে লোকায়ত জীবনের ছাপ এঁকে দেওয়া তাঁদের পক্ষে সম্ভব হয়েছিল সেদিন। এটা আমাদের পরম সৌভাগ্য। তাই সেদিনের শিল্প তথা জীবনযাত্রার বাস্তব আলেখ্য, সে যুগের ভিক্ষুক, জেলে, শবর-শবরী প্রভৃতির বাস্তব চিত্র হাতে পেয়েছি আমরা। ব্রাহ্মণ্য সমাজের প্রথাবদ্ধ প্রতিমাশিল্প বা তারও আগের যুগের নির্দিষ্ট শিল্পরীতির সাথে এই শিল্পের কোন সাদৃশ্য নেই। এ হলো লোকশিল্পীর সহজ স্বতস্ফূর্ত আত্মপ্রকাশ। প্রথাবদ্ধ শিল্পের পাশাপাশি এর বলিষ্ঠতা চোখে পড়ার মতো। বাংলার লোকায়ত সমাজ তথা সামগ্রিক-ভাবে বাঙালীর শিল্প সাধনায় পাহাড়পুরের পোড়ামাটির ফলকগুলি অত্যন্ত মূল্যবান সম্পদ। আজ পর্যন্ত সে যুগের ভাস্কর্যের যে নমুনা পাওয়া গেছে তার সবই বিধিবদ্ধ শিল্পরীতি অনুসারে তৈরী দেব-দেবীর মূর্তি। তার বাইরেও ব্যাপক লোকসমাজে জীবনানুগ যে শিল্পচর্চা প্রচ-লিত ছিল তার নিদর্শন মেলে একমাত্র পাহাড়পুরে, আর কিছুটা ময়নামতীতে।

www.pathagar.com

পঞ্চম-ষষ্ঠ শতকের আগেকার বাংলার খোদাই শিল্পের নমুনা বড় একটা আজ পর্যন্ত পাওয়া যায়নি। তার আগে শিল্পরীতির যে নিদর্শন বাঁকুড়া জেলার পোখ্‌রাণায়, তমলুকে, মহাস্থানে আবিষ্কৃত পোড়া মাটির ফলকগুলিতে পাওয়া গেছে তাতে শক-কুষাণ যুগের শিল্পরীতির ছাপ। গুপ্ত আমলে এই রীতির বদল হলো। সূক্ষ্ম, মার্জিত, চিক্কন, বুদ্ধ-বোধি-সত্ত্বের মূর্তি দেখা দিল। কিন্তু ভাস্কর্যে বাংলাদেশ স্বীয় বৈশিষ্ট্যটি খুঁজে পেল পাল আমলে। সেন আমলেও একই ধারার অনুবৃত্তি। তবে এ সময় মূর্তি গঠনে পাল আমলের বলিষ্ঠতা তিরোহিত। তার জায়গায় চিক্কন দেহের লীলায়িত ভঙ্গির প্রাধান্য।

আজকের মতো সেকালেও গ্রামে যারা বাস করতো তারা বাড়ী তৈরী করতো মাটি-বাঁশ-কাঠ-খড় দিয়ে। শহরে বিত্তবানরা ব্যবহার করতো ইট। রাজপ্রাসাদ থেকে শুরু করে মন্দির-বিহার সব কিছুতেই ইটের ব্যবহারই বেশী। পাথরের স্বল্পতাই এর কারণ। ফলে মাটি খুঁড়ে উপমহাদেশের অন্যান্য এলাকার তুলনায় বাংলাদেশে প্রাচীন মন্দির-বিহার-প্রাসাদের নিদর্শন খুব বেশী মেলেনি। যাও বা পাওয়া গেছে তার প্রায়ই ভাঙ্গা। তাই প্রাচীন বাংলার স্থাপত্য রীতি, তার বৈশিষ্ট্য ইত্যাদি সম্পর্কে খুব বেশী জানা যায়নি। বিভিন্নভাবে যাও বা জানা গেছে নিদর্শন তা থেকেও কম।

তবে এই সীমাবদ্ধতা সত্ত্বেও একটা কথা সুস্পষ্টভাবে জানা যায় যে, গৌড়-বঙ্গের বিশিষ্ট স্থাপত্য রীতি এক কালে গোটা উপমহাদেশে বিশেষ পরিচিত ও সম্মানিত ছিল। গ্রাম-বাংলার কুঁড়েঘর তৈরীর রীতিই বাংলার বিশিষ্ট স্থাপত্য রীতি। চৌকোণা ভিতের উপর বাঁশ বা কাঠের খুঁটি ঘিরে বাঁশের চাঁচারী বা মাটির দেয়াল, তার উপর খড় বা ছনে ছাওয়া ধনুকাকৃতি চাল। বাংলার কুঁড়েঘরের এই হলো আকৃতি। আর এটিই হলো বাংলার স্থাপত্য রীতিরও বৈশিষ্ট্য। সেকালে একই আকৃতির যেমন দোচালা, চৌচালা, আটচালা ঘর তৈরী হতো, তেমনি তৈরী হতো শহরে বিত্তবানের দোতলা-তিনতলা। মন্দিরও তৈরী হতো এই রীতিতে। গ্রামবাংলার জনজীবনের সাথে গভীরভাবে সম্পৃক্ত গৌড়-বঙ্গের এই বিশিষ্ট স্থাপত্য-রীতি সেকালে গোটা ভারতে পরিচিত ছিল। আগ্রার দুর্গে এই রীতিতে গড়া তিনটি দালান আজও এই পরিচিতির ব্যাপকতার সাক্ষ্য বহন করছে। আধুনিক বাংলো-বাড়ীও একই রীতির আধুনিক সংস্করণ। পাল-সেন আমলের রাজপ্রাসাদের

www.pathagar.com

ধ্বংসস্তূপ ছাড়া মাটি খুঁড়ে স্থাপত্য-রীতির আর যে নিদর্শন পাওয়া গেছে তা সবই হয় স্তূপ, নয় বিহার, নতুবা মন্দির। স্তূপের গড়নে বাংলার কোন বিশেষত্ব নেই। অন্যান্য জায়গায় আবিষ্কৃত বৌদ্ধ-স্তূপের মতোই। আকৃতিতে এই স্তূপগুলি অনেক সময়ই খুব বড়-সড়ো হতো। মহাস্থানের কাছে স্তূপের যে নিদর্শন মাটি খুঁড়ে পাওয়া গেছে তা থেকে সে যুগের বিশালাকৃতি স্তূপের বিশালতা অনুমান করা যায়। বিহার গঠনেও বাংলার তেমন কোন বিশেষত্ব নেই। সাধারণতঃ ভিতরের প্রশস্ত চত্বর ঘিরে থাকতো ছোট ছোট কুঠরি—বৌদ্ধভিক্ষুদের থাকবার জায়গা। একেক দিকে মাঝের কুঠরিটি অন্যান্য কুঠরির চেয়ে বড় হতো। চত্বরের এক পাশে থাকতো কুয়ো-স্নান-আচমনের জায়গা। সাধারণতঃ বিহারে প্রবেশপথ থাকতো একটি। ইট-মাটি-কাঠ দিয়ে গড়া বিহারের সাধারণতঃ এই ছিল আকৃতি। বড় বড় বিহারগুলি আয়তনে বড় হতো—দোতলা-তিনতলা, এমন কি নয়তলা বিহারের উল্লেখ পাওয়া যায়। রাজশাহীর পাহাড়পুরে অবস্থিত সোমপুর বিহারের ধ্বংসস্তূপ সেকালের বড় বিহার পরিকল্পনার পরিচায়ক।

স্থাপত্য শিল্পে বাংলার বৈশিষ্ট্য মন্দিরের গঠন-রীতিতে অনেক বেশী মূর্ত হয়ে উঠেছিল। সাধারণতঃ মন্দির হতো চার রকমের ঃ (ক) ভদ্র দেউল, (খ) রেখ দেউল, (গ) স্তূপযুক্ত ভদ্র দেউল, (ঘ) শিখরযুক্ত ভদ্র দেউল। সাধারণতঃ এই মন্দিরগুলি ছিল ছোট ছোট। বর্ধমান, বাঁকুড়া ও সুন্দর-বনে এই জাতীয় ছোট মন্দিরের ভাঙ্গা-চোরা নিদর্শন আবিষ্কৃত হয়েছে। এ ছাড়া সর্বতোভদ্র নামে এক শ্রেণীর বিশাল মন্দিরও তৈরী হতো সেকালে। বাস্তুশাস্ত্রের রীতি অনুসারে এই মন্দির হতো পাঁচতলা। মন্দিরটি হতো চারকোণা—চার দিকে চারটি গর্ভগৃহ। সেই গৃহে প্রবেশের জন্যে চারদিকে চারটি তোরণদ্বার। পাঁচতলা মন্দিরের প্রত্যেক তলায় থাকতো ষোলটি কোণ। প্রত্যেক তলায় থাকতো প্রদক্ষিণ-পথ ও প্রাচীর। তৈরীর বিবরণ থেকেই এই জাতীয় মন্দিরের বিশালতা অনুমান করা চলে। পাহাড়পুরের বিহার মধ্যস্থিত মন্দিরটি এই জাতীয় মন্দিরের নিদর্শন। বাঙলার মন্দিরের এই স্থাপত্য রীতির বিশালতা ও সৌন্দর্য্য সেকালে শুধু যে দেশেই জন-প্রিয় ছিল তাই নয়, দেশের বাইরে ব্রহ্মদেশ ও যবদ্বীপ প্রভৃতি অঞ্চলেও প্রভাব বিস্তার করেছিল। ব্রহ্মদেশে পাগানের চতুষ্কোণ মন্দিরগুলির সাথে পাহাড়পুরের স্থাপত্য-রীতির সাদৃশ্য লক্ষ্য করার মতো।

www.pathagar.com

উপসংহার

বাংলার ইতিহাস যেভাবে ভাগ করা হয় তার আদিপর্বে বাংলা তথা বাঙালীর চিন্তা-ভাবনা, সে যুগের জীবনযাত্রা, উৎপাদন পদ্ধতি প্রভৃতির রূপ-রেখার আলোচনা শেষ হলো। এবার মধ্যযুগের বিবরণ শুরু করার পালা। আধুনিক বাঙালীর ইতিহাসের বহু জটিলতার রহস্যভেদ নির্ভর করে এই মধ্যযুগের যথাযথ ও বিজ্ঞানসম্মত আলোচনার উপর। সেজন্যেই তা ভিন্ন এবং বিস্তৃত আলোচনার অপেক্ষা রাখে। তবে মধ্যযুগের ইতিহাসের মূল আবার আদিযুগে নিহিত। বর্তমানকে বুঝতে হলে তাই আলোচনার সূত্রপাত করতে হয় একেবারে আদ্যিকালে। তা ছাড়া মধ্যযুগ বলতে সাধারণতঃ আমরা যে সময়টুকু বুঝি, ইতিহাস-বিজ্ঞানের দৃষ্টিকোণ থেকে মধ্যযুগ শুধু সেটুকুর মধ্যেই সীমাবদ্ধ নয়। আজ পর্যন্ত রাষ্ট্রীয় উত্থান-পতন ও অধিকার দিয়েই বাংলার ইতিহাসের পর্ব বিভাগ করা হয়। সমাজ-ব্যবস্থার উত্থান-পতন অনুসারে ইতিহাসের পর্ব বিভাগের রীতি আজও অপ্রচলিত। এর কারণও অবশ্য আছে। বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিকোণ থেকে ইতিহাস বিচারের রেওয়াজই আমাদের দেশে ভালভাবে চালু হয়নি। যেটুকু হয়েছে, সমস্যার ব্যাপকতা ও জটিলতার তুলনায় সেটুকু নেহাতই নগণ্য, অনুল্লেখযোগ্য প্রচেষ্টা।

মধ্যযুগে বাংলার যে সমাজ-ব্যবস্থা তার সূত্রপাত ঠিক ১২০০ খ্রীস্টাব্দ থেকে হয়নি, হয়েছে তারও বহু আগে—মোটামুটিভাবে কৌম সমাজের ভাঙ্গনের পর পর। সে সময় থেকে মূলতঃ একই ব্যবস্থা অব্যাহত থেকেছে। সময় সময় কিছু কিছু পরিবর্তন দেখা দিয়েছে ঠিকই, কিন্তু তাতে সমাজের মৌলিক কাঠামোর কোন পরিবর্তন হয়নি। খ্রীস্টীয় দ্বিতীয়-তৃতীয় শতক থেকে ষষ্ঠ-সপ্তম শতক পর্যন্ত বহির্বাণিজ্যের বিস্তৃতি সত্ত্বেও কৃষির নির্ভর স্বয়ংসম্পূর্ণ গ্রামের কাঠামো অপরিবর্তিত থেকে গেছে। রাষ্ট্র-নৈতিক পরিবর্তনও তার উপর তেমন প্রভাব ফেলতে পারেনি। সপ্তম-অষ্টম শতকে বাংলাদেশে স্বতন্ত্র স্বাধীন রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা সত্ত্বেও গ্রামবাংলার জীবনে মৌলিক কোন ছাপ পড়েনি তার। মধ্যযুগের রাষ্ট্রীয় পরিবর্তনেও এ ব্যাপারে তেমন কোন রকম-ফের হয়নি। কাজেই বাঙলার ইতিহাসের যে অধ্যায়কে মধ্যযুগ বলি, বাস্তবে তা আরও অনেক বেশী বিস্তৃত। আদি-যুগের অনেকখানিই বস্তুতঃপক্ষে মধ্যযুগেরই আলোচনা। মধ্যযুগের

www.pathagar.com

সমাজ-ইতিহাস আলোচনায় সেজন্য আদিযুগের আলোচনা অপরিহার্য। মধ্যযুগের বিস্তৃততর আলোচনার আশায় এই অংশে এই অপরিহার্য কাজটুকুই কোনরকমে, কিছুটা দায়-সারাভাবে করার চেষ্টা করা হলো।

তবু এটুকু আলোচনা থেকে বাঙলার সমাজ-ইতিহাসের সবচেয়ে বড় বৈশিষ্ট্য—তার কৌম-জীবনের স্মৃতি তথা কৌম চেতনার ব্যাপারটি সহজেই চোখে পড়ে। সমাজ সংগঠন, মানস-জগৎ, আচার-অভ্যাস, স্বয়ংসম্পূর্ণ গ্রাম, ধন-দৌলতের উৎপাদন থেকে শুরু করে বণ্টন পর্যন্ত জীবনের প্রতিটি স্তরে এই বৈশিষ্ট্যটি পরিব্যাপ্ত। এমনকি হাজার হাজার বছরের ব্যবধানে দাঁড়িয়ে আজও আমরা তা অনুভব করতে পারি। আজও তা একেবারে নিঃশেষ হয়ে যায়নি।

গোটা বাংলাদেশ জুড়ে ছিল বিভিন্ন কৌমের বাস। তাদের প্রত্যেকেরই ছিল নিজস্ব গণ্ডীবদ্ধ জীবনযাত্রা। একের সাথে অন্যের যুদ্ধ-বিগ্রহ ছাড়া বড় একটা মুখ দেখাদেখি ছিল না। নানা বাধা-নিষেধের দেয়ালের আড়ালে তারা ছিল বিচ্ছিন্ন। ক্রমে নানা অর্থনৈতিক তথা রাষ্ট্রীয় পরিবর্তনের আঘাতে এই কৌমজীবনে ভাঙ্গন ধরলো। পুরানো কৌমগুলি ভেঙ্গে গিয়ে গড়ে উঠল বিভিন্ন জনপদ। কৌম জীবনের অবসান হলো। কিন্তু অবসান হবার পরও তা একেবারে নিঃশেষে মুছে গেল না। কৌম সমাজের ভাঙ্গন সম্পূর্ণ হলো না, অসম্পূর্ণ রইলো। তা ছাড়া যে টুকু বা ভাঙ্গন সূচিত হলো তাও গোটা বাংলাদেশ জুড়ে একসাথে সমান তালে সূচিত হলো না। সেজন্যে সমাজ অসমভাবে বিকশিত হলো। রাজতন্ত্রের পাশাপাশি টিকে রইলো অকৃত্রিম কৌমজীবন।

সমাজের এই অসম বিকাশ ও কৌমসমাজের এই অসম বিলোপের ফলে একদিকে যেমন দেখা দিল কৃষিভিত্তিক স্বয়ংসম্পূর্ণ গ্রাম, আর এক দিকে সমাজ সংগঠনে দেখা দিলো নানা ধরনের বাধা-নিষেধের পাঁচিল—অনড় বর্ণভেদ প্রথায় যার চরম বিকাশ। সমাজ বিকাশ এই দুই জগদ্দল পাথরের নীচে চাপা পড়লো। ফলে একই রাষ্ট্রবন্ধনে বাঁধা পড়ার পরও আঞ্চলিক চেতনার প্রাধান্য খর্ব হলো না, তিরোহিত হলো না। প্রাচীন কৌমসমাজের বিভিন্ন কৌমগুলির মাঝে বিরাজমান বিধি-নিষেধের দেয়াল। শশাংক আর পাল রাজারা রাঢ়, সুহ্ম, পুণ্ড্র, বঙ্গকে এক রাষ্ট্র-বন্ধনে

www.pathagar.com

বেঁধে দেবার চেষ্টা করলেন ঠিকই, কিন্তু সুযোগ জুটে গেলে জনপদগুলি আলাদা হয়ে যেতে দেরী করলো না। বর্ণভেদ প্রথার বিধি-নিষেধের পাঁচিল ছড়িয়ে রইলো সমাজের সর্বস্তরে, গ্রামে গ্রামে পাড়ায় পাড়ায়—সর্বত্র। অপরপক্ষে কৃষিভিত্তিক স্বয়ংসম্পূর্ণ গ্রামের অর্থনীতিও রইলো অটুট। আদিম কৌম-সমাজের ভাঙ্গনের পর যে সমাজ সৃষ্টি হলো, ভাঙ্গন ধরলো না তাতে। ব্যবসা-বাণিজ্যের প্রসার তেমন কোন পরিবর্তনই সূচিত করলো না। সমাজে বণিক ব্যবসায়ীদের অর্থনৈতিক ক্ষমতাবৃদ্ধিতে বর্ণ-ভেদ প্রথার শৃংখলের জন্যে সমাজ কাঠামোর বা সংস্কৃতির ইতিহাসে তেমন কোন পরিবর্তনের ছাপ ফেলতে পারলো না। নতুন শ্রেণীর শক্তিবৃদ্ধি সমাজের মূল অর্থনীতি তথা বর্ণ-বৃত্তির কৌম চেতনায় সঞ্চারিত করতে পারলো না কোন নতুন উদ্যম। ব্যবসায়ী বণিকদের ক্ষীণ অভিঘাত অনড় সমাজ কাঠামোর গায়ে ধাক্কা খেয়ে ফিরে গেল নিজের জায়গায়, বর্ণ-বৃত্তির সমাজ কাঠামোকে মেনে নিলো।

কৌম-সমাজের অসমাপ্ত বিলোপ যেমন স্বয়ংসম্পূর্ণ গ্রামভিত্তিক কৃষি-অর্থনীতির জন্ম দিয়েছিল, তেমনি বাংলাদেশের কৃষিতে জলসেচ তথা জলের সরবরাহ নিয়ন্ত্রণের প্রয়োজনীয়তা কেন্দ্রীভূত বৃহৎ সাম্রাজ্যের প্রতিষ্ঠাও অনিবার্য করে তুলেছিল। গঙ্গা রাজ্য থেকে শুরু করে পরবর্তীকালে সব সময়ই তাই বৃহৎ সাম্রাজ্য তথা রাজতন্ত্রের সাক্ষাৎ মেলে এখানে। রাজ্যে প্রধান উৎপাদন সম্পর্ক অবশ্য সব সময়ই সামন্ততান্ত্রিক। তবু অষ্টম শতকের আগে রাজ্যে সামন্ত-মহাসামন্তদের তেমন দাপট দেখা যায় না। এ সময় থেকে সামন্ত প্রভুরা প্রধান হয়ে উঠতে থাকে। কেন্দ্রীভূত রাষ্ট্রের আদর্শও অনেকটা শিথিল হয়ে আসে।

উপমহাদেশের পূর্ব প্রান্তে অবস্থিত হওয়ায় বাংলাদেশে আর্য প্রভা-বের ঢেউ লেগেছে বহু পরে। যাও বা লেগেছে তাও নির্ভেজালভাবে বেশীদূর ছড়াতে পারেনি। প্রাচীন কৌম সংস্কারের সাথে বোঝাপড়া করে এগুতে হয়েছে। প্রায়ই সীমাবদ্ধ থেকেছে সমাজের উচ্চবর্ণদের স্তরে। বৌদ্ধধর্ম অবশ্য বৃহত্তর সমাজে প্রভাব বিস্তার করেছে—তবে তাও সপ্তম-অষ্টম শতকের পরে। তারপরে যে আর্য-ব্রাহ্মণ্য সংস্কার ছড়িয়েছে তার রঙও ঠিক উত্তরাপথের মত গাঢ় নয়—কৌম সমাজের সাথে বোঝাপড়ায় তা

www.pathagar.com

ফিকে হয়ে এসেছে। আর্যব্রাহ্মণ্য সংস্কারের ঢেউ বেশী করে লেগেছে গঙ্গার পশ্চিম তীরে ও পশ্চিম বাঙলায়। রঙ ফিকে হবার পরও পূর্ব বাঙলায় তার অগ্রগতি শ্লথ, স্তিমিত।

ফলে উত্তরাপথের তুলনায় বাঙালীর মানসজগতে দেখা দিয়েছে বৈচিত্র্য। এখানে ধর্মের রূপ বার বার বদলেছে। বেদান্তের শুষ্ক জ্ঞান সাধনার পরিবর্তে তাই এখানে হৃদয়াবেগের প্রাবল্য। আচার-আচরণের ক্ষেত্রে আর্য-ব্রাহ্মণ্য সনাতনত্বের সাথে তাই তার বিরোধ। নিরাকার ব্রহ্ম-সাধনা বা ভূয়োদর্শনের স্থলে বৌদ্ধধর্মের প্রতি তার আসক্তি, প্রাচীন কৌম বিশ্বাসের সাথে সম্পৃক্ত তান্ত্রিক সাধনা তথা বাউল সহজিয়া সাধনার উদার মানবতা-বাদের প্রতি তার মমত্ববোধ।

অষ্টম শতকে স্বতন্ত্র রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার পর থেকে সর্বক্ষেত্রে বাঙালীর স্বাতন্ত্র্যের রূপরেখাও ক্রমেই স্পষ্ট হয়ে উঠতে থাকে। বাঙলা ভাষা তথা বাঙলা লিপির উদ্ভব সমসাময়িক কালে। এ সময়েই তার স্বতন্ত্র সাহিত্য-সাধনার পরিপুষ্টি। ধর্ম চেতনার বৈশিষ্ট্যও এ সময়েই স্পষ্টতর। এক কথায় স্বতন্ত্র জাতি হিসাবে গড়ে ওঠার উপকরণগুলি ক্রমে দানা বাঁধতে থাকে এ সময় থেকেই। আবার এ সময় থেকেই বাঙলার বহির্বাণিজ্যের স্বর্ণযুগের অবসান ঘটে। সামন্ত প্রভুদের প্রাধান্যও এ সময়েই বিস্তৃত হয়। এ সময়টা তাই বাঙলা তথা বাঙালীর ইতিহাসে বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ।

কিন্তু এ সময়েও বাংলার ইতিহাস পুরানো যুগের জের কাটাতে পারে না। বর্ণভেদ প্রথার অনড় বন্ধন ও স্বয়ংসম্পূর্ণ গ্রামের অর্থনীতি তথা তার থিতিয়ে থাকা জীবনের নিশ্চিন্ততা, স্নিগ্ধতা অতিক্রম করতে পারে না বাঙালী। সামন্ত প্রভুদের অত্যাচার আর জুলুমে সমাজে নীচু তলায় যে বিক্ষোভের বারুদ ধীরে ধীরে জমা হচ্ছিলো—বিদ্রোহের আকারে বিস্ফো-রণ ঘটে না তার। পাল-আমলের শেষের দিক ও সেন আমলের স্বেচ্ছাচার-দুর্নীতি সত্ত্বেও পঙ্গুজীবনযাত্রার ব্যত্যয় ঘটে না। আচার-আচরণের অরণ্যে দিগ্‌ভ্রান্ত, গণৎকারের গণনার উপর নির্ভরশীল রক্ষণশীল স্বেচ্ছাচারী বামুন-পুরুত আর দেহবাদী উচ্চবিত্তদের স্বেচ্ছাচার অব্যাহত থেকে যায়। জমি আর মাটির টানে বাঁধা, বর্ণভেদ প্রথার শেকল পরা লোকায়ত সমাজ সান্ত্বনা খোঁজে সে যুগের গুহ্য রহস্যময় ধর্মসম্প্রদায়ের মহত্তম আদর্শ—

www.pathagar.com

মানবতা আর সাম্য ভাবনার মাঝে। সমাজে বর্ণভেদ প্রথার ভেদ-বুদ্ধি আর গ্রামীণ জীবনের বাঁধন অব্যাহত থাকে। শ্রেণীসংগ্রাম তীব্রতর হবার আয়োজন ব্যর্থ হয়ে যায়। এভাবেই সমাজ পা রাখে ইতিহাসের পরবর্তী অধ্যায়ে। সে আর এক কাহিনী—আর এক আলোচনা।

www.pathagar.com

www.pathagar.com